প্রভাস ভদ্র-র গল্প
চল্লিশ

প্রভাস ভদ্র-র

গল্প

চল্লিশ

সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

PROVASH BHADRA-R

GOLPO

CHOLLISH

প্রথম প্রকাশ :

বইমেলা ২০১০

প্রকাশক :

ইন্দ্রনাথ মজুমদার

সুবর্ণরেখা

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

বর্ণবিন্যাস :

বাবলু দে

মুদ্রক :

বাণী আর্ট প্রেস

৫০এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :

সুব্রত

মূল্য :

দেড়শো টাকা

একান্ত স্নেহ আদরের

শিখা

ও

সত্যানন্দকে

—ন.দা

সূচি

অপদার্থ	সাত
পশু ও মানুষ	আট
মানুষ ও দেবতা	নয়
নামমাত্র মানুষ	এগার
বালকবৃদ্ধের গল্প	পনের
তবু	আঠারো
আইন কথা বলে	বাইশ
ছিনতাই	ছাব্বিশ
লজ্জা	আঠাশ
অন্য অভিধান	তিরিশ
তালতালি	চৌতিরিশ
বেনারসি	আটতিরিশ
অন্যমুখি	একচল্লিশ
পরবের দিন	চুয়াল্লিশ
স্বদেশ বিদেশ দেবালয়	আটচল্লিশ
স্বপ্ন সদন	চুয়ান্ন
মন্দ মধুর	ঊনষাট
প্রয়োজনের ঘর	সাতষট্টি
আলোছায়া	ছিয়াত্তর
জলছবি	বিরাশি
হারিয়ে পাওয়া	সাতাশি
মৃত কার্ডের ময়না তদন্ত	চুরানব্বই
জোয়াল কাঁধে	নিরানব্বই
নিঃসন্তান জনক	একশো আট
ঋষির চেয়ে বড়	একশো পনের
বুকের মধ্যে বাবা	একশো একুশ
এক একজন শহিদ	একশো সাতাশ
পার হতে সংশয়	একশো বত্রিশ
সোনালি সিদ্ধান্ত	একশো ঊনচল্লিশ
উত্তরাধিকার	একশো চুয়াল্লিশ
সেতু সভ্যতা	একশো সাতচল্লিশ
সাম্য ও রাজপথ	একশো চুয়ান্ন
সেকি ভোলা যায়	একশো ষাট
জীবন যেরকম	একশো চৌষট্টি
সুসংগঠিত সত্য এখন	একশো বাহাত্তর
কালের রাজা	একশো সাতাত্তর
কালের চিত্রনাট্য	একশো পঁচাশি
কালবেলা	একশো একানব্বই
স্বয়ং আগন্তুক	একশো আটানব্বই
অগতানুগতিক	দু'শো দুই

লেখকের আরও অসংখ্য গল্প

যে সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে

গল্প

গল্পদশক

সমকালের গল্প

সময়ের কণ্ঠস্বর

স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

সিম্ফনী

নীল নীলা

অন্তত একজন

প্রাকৃতিক

অপদার্থ

আবার আজ! তর্পিত তীর্থার ঝগড়া শুরু হতে বাপ্তুর ভয়ানক রাগ হল। কেননা, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে ম্যাথ প্র্যাক্টিশ করছিল। কাল থেকে ফার্স্ট টার্মের এগজাম শুরু। অথচ, বাপি মাম্ কিনা! বাপ্তুর অবাক লাগল। অনেক দিনের দেখাশোনা থেকে বুঝতে পারল, আজও একসময় একজন অপরজনকে পুরনো কথা দিয়েই আক্রমণ করবে। বেশ কয়েকবার দু'জনে দু'জনকে 'অপদার্থ' বলবে।

তর্পিত তীর্থার ঝগড়াঝাটির নাভিমূল যে কোথায় তা বোঝার বয়স বাপ্তুর এখনও হয়নি। তবু ঝগড়া শুনতেই হয়। এই যেমন এখন শুনতে হচ্ছে।

তর্পিত তীর্থা উভয়েই সুশ্রী। সমবয়সী সতীর্থ। পরবর্তীকালে বহুজাতিক সংস্থার সহকর্মি। তারপর বিবাহসূত্রে দম্পতি। তর্পিতের আদি বাড়ি মাহেশে গঙ্গার ধারে। বিশাল বাড়ি। মা বাবা ভাইবোন সবাই সেখানে। তর্পিত স্ত্রীপুত্র নিয়ে উত্তরপাড়া স্টেশনের কাছে আধুনিক ফ্ল্যাটে থাকে। ফ্ল্যাটটা স্বামী-স্ত্রীর সঞ্চয় ও লোনে কেনা। অনেক বিষয়েই ওদের দু'জনের মধ্যে তফাত্ তারতম্য সামান্য। উনিশ বিশ। সম্পর্কটা তাই অনেকটাই বন্ধুর মতো। সুতরাং, তর্ক বিতর্ক একটু বেশি হতেই পারে। কিন্তু অশান্তি দেখা দেয় তখন, যখন যুক্তি ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেউই হার মানতে নারাজ। একে অপরকে খাটো করতে চাইলে মেনে নেয়া যায় কখনও? স্বাভাবিক মতে তখন চড়া গলার স্বরে মেজাজ প্রকট হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায়, রণে নিয়ম ভঙ্গের আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ। ব্যক্তিগত কুৎসা আর চরিত্রহননের নানান তথ্যাদির উল্লেখ। অতীত বর্তমানের সেসব কিছুটা হয়ত সত্যি। কিছুটা অন্যমুখে শোনা কথা। বাকি সবটাই অবিশ্বাস অনুমান থেকে জন্ম নেয়া ধারণামাত্র।

দু'জনের সম্পর্কে এইরকম বিশ্রী অভিযোগ শুনতে শুনতে আরও ছোট বয়সে বাপ্তুর মনে হত, গুরুজনেরা কখনও মিথ্যা বলে না। বাপি মাম্ তো গুরুজন। ওরা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, তবে? কোনও উত্তর খুঁজে পেত না। কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হয়ে বাপ্তু এখন বারো বছরের বালক। গুরুজনদের কথায় বিশ্বাস রেখে এখন ওর মনে যে নির্মম বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে তাহলো, বাপি মাম্ কেউই তেমন ভাল না। ওদের বেশ কিছু খারাপ দোষ আছে। ওরা দু'জনেই অপদার্থ!

পশু ও মানুষ

কুয়াশাচ্ছন্ন অল্পশীতের সকাল। ভোরের আলো এখনও স্পষ্ট হয়নি। জায়গাটা জনবসতি থেকে অনেক দূরে। সবুজ জাজিমের বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ। নিরিবিলি নির্জন। এখানে অন্ধকার ভোর থেকে অনেকে আসে। বিভিন্ন যানবাহনে অথবা দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে। গাড়ি থেকে নেমে অনেকে জগিং দৌড়ঝাঁপ প্রাতঃভ্রমণ করে।

স্তূপীকৃত পাতা জঞ্জালের পাশে এসে একটি ইণ্ডিকা গাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়াল। ভেতরে স্টিয়ারিং হাতে সৌম্যদর্শন পুরুষটি খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী। ওর কলম তলোয়ারের চাইতেও ধারালো। পুরুষটি বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক আলোচনা সভায় উল্লেখযোগ্য স্পষ্টভাষী নির্ভীক বক্তা। দেশ বিদেশে সমাদৃত পুরস্কৃত ও আমন্ত্রিত অতিথি।

বুদ্ধিজীবীর পাশে বসা অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীটি বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষা। একাধিক নারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা। সমাজসেবিকা। অধ্যক্ষা বুদ্ধিজীবীর স্ত্রী নয়। অধ্যক্ষা অবিবাহিতা। বুদ্ধিজীবীর স্ত্রী পুত্র কন্যা জামাতা পুত্রবধূ নাতিনাতনি—সব আছে।

অধ্যক্ষার কোলে গরম চাদর জড়ানো দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন একটি ঘুমন্ত শিশু। সদ্যোজাত শিশুটির শুধু মুখাবয়ব দেখা যাচ্ছে।

অধ্যক্ষা চারদিকে দৃষ্টি ছুটিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর দু'হাত বাড়িয়ে দেবশিশুকে এগিয়ে দিলেন। বুদ্ধিজীবী নিরুদ্বেগ চিত্তে শিশুটিকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। দু'কদম এগিয়ে পাতা জঞ্জালের স্তূপশয্যায় সযত্নে শুইয়ে দিলেন। তারপর দ্রুত ফিরে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন।

প্রস্ফুটিত ফুলের মতো দেবশিশুর এবার ঘুম ভাঙল। কুয়াশার পর্দা হটিয়ে নরম হলুদ রোদ্দুরে ওর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হল। দেবশিশুটি স্বর্গীয় হাসি ছড়ালো। কিন্তু পরক্ষণেই কচি কণ্ঠে কাঁদতে শুরু করল। সেই কান্না শুনে কোথা থেকে একটি নেড়ি কুত্তা ছুটে এলো। বিস্মিত চোখ চেয়ে শিশুটিকে দেখল। চোখ পিট পিট করে বুঝবার চেষ্টা করল, শিশুটি কাঁদছে কেন! নিঃসঙ্গ বলে? নাকি ক্ষুধায় কাতর? অথবা ওর শীত করছে? নাকি বিষাক্ত কোনও কীটপতঙ্গের দংশনে যন্ত্রণাদগ্ধ? শিশুটি এখানে এলো কেমন করে? ওর মা-বাবা কেমনতর মানুষ!

এরকম হাজারো প্রশ্ন। কোনও উত্তর খুঁজে না-পেয়ে কুকুরটি অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল। কিছু একটা বিহিত করার তাগিদে ছটফট করল। আগুপিছু কয়েকবার হাঁটল। শিশুটির ধারে কাছে কোনও কীটপতঙ্গ আছে কিনা তদন্ত করল। তারপর ওর পাশে শুয়ে নিজের শরীরের ওম দেবার চেষ্টা করল। তবু কান্না না থামায় বিচলিত উঠে দাঁড়াল। যুতসই অবস্থানে শরীর বাঁকিয়ে দুধের বাট শিশুটির মুখের কাছে ধরল। তাতেও কাজ না হওয়ায় অগত্যা নিজেও অসহায় কান্না জুড়ে দিল। দেবশিশু আর কুকুরের কান্নায় কোনও তফাৎ রইল না। অবর্ণনীয় অব্যক্ত এক ধ্বনি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রথমে স্বাস্থ্যসচেতন ভ্রমণার্থীরা এসে জড়ো হল। তারপরে গাড়ি হাঁকিয়ে থানার লোকজন। খবরের কাগজের আলোকচিত্র সাংবাদিক হাজির। একজন বারবনিতা গঙ্গাস্নান সেরে রোজ এখানে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে যায়। জটলা দেখে সেও কৌতূহলী হল।

বাচ্চাটাকে দেবেন বাবু? থানার অফিসারকে বারবনিতা বলল, আমি ওকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করব।

চাইলেই কি পাওয়া যায়? রাশভারি অফিসার তবু কিছুটা চিন্তা করে বললেন, ঠিক আছে আপনি থানায় চলুন। অনেকরকম আইনি ব্যাপার স্যাপার আছে তো!

দেবশিশুটি এখন থানার গাড়িতে বারবনিতার কোলে। গাড়িটা চলতে শুরু করার মুহূর্তে কুকুরটা কুঁই কুঁই করে কিসব বলতে লাগল। ওর চোখে আবছা জল। বারবনিতা লক্ষ্য করল। ওকেও গাড়িতে তুলে নেয়ার আব্দার ধরে বলল, ওকে আমি আরও মানুষ করে তুলব।

মানুষ ও দেবতা

নাম দেবব্রত সর্বাধিকারী। কিন্তু, পরিচিতি দেবু ডাক্তার নামে। নতুন প্রজন্মের সিংহভাগ মানুষ ওঁর সম্পূর্ণ নামটা জানত না। তিনি যে আদতে কোনও পাশ করা ডাক্তার ছিলেন না, তাও অজানা ছিল। সেসময় দীর্ঘকাল কমপাউণ্ডারির অভিজ্ঞতা সুবাদে স্বীকৃত ডাক্তার হওয়া যেত। দেবু ডাক্তার তেমনই একজন।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেবু ডাক্তার দীর্ঘদেহী ছিলেন। পুরুষ্টু ঠোঁটের ওপর ছোট্ট এক থোক গোঁফ। চোখে সরু গোল মেটাল ফ্রেমের চশমা। মাথায় শোলার টুপি। পরনে ধুতি ফতুয়া। পায়ে পামস্যু। গলায় ঝুলত স্টেথিস্স্কোপ। সাইকেলের ক্যারিয়ারে থাকত ডাক্তারি ব্যাগ।

ডাক্তারখানা বা চেম্বার বলতে যা বোঝায় দেবু ডাক্তারের তা ছিল না। বাধ্য না হলে কোনও রোগী দেবু ডাক্তারের কাছে আসত না। বিপদে পড়ে তেমন কেউ এসে পড়লে বৈঠকখানায় রোগী দেখতেন। রোদ জল ঝড় বৃষ্টি রাত্রি—যে কোনও সময় ডাকলেই সাইকেল চড়ে দেবু ডাক্তার হাজির। তাছাড়া, সকাল বিকেল নির্দিষ্ট কিছু সময় সাইকেল নিয়ে দূর দূরান্তে চক্কর দিয়ে বেড়াতেন। রোগী দেখতেন। ওষুধ দিতেন। নানা পরামর্শ দিয়ে সচেতন করতেন। যে যা টাকা দিত নিতেন। না দিলেও খুশি। দাতব্যই ছিল বেশি। মূল উদ্দেশ্য ছিল, জনসংযোগ আর সেবা। তাই বলে ভোটে দাঁড়ানোর ধান্দা ছিল না। দু'এক তরফ থেকে তেমন প্রস্তাব এসেছিল। সোজা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, সবাই আমাকে ভালবাসে। ভোটে দাঁড়িয়ে ওদের অনেকের অপছন্দের হতে যাব কেন? তাছাড়া, ওসবে জড়িয়ে পড়লে মানুষের চিকিৎসা—সেবা করব কখন? তার চাইতে এই বেশ ভাল আছি।

তো সেই দেবু ডাক্তারের নাতি মানব সর্বাধিকারী এখন এম. ডি. ডিগ্রীধারী ডাক্তার। আধুনিক সৌখিন নজরদারী চেম্বার আছে ডাঃ সর্বাধিকারীর। এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছাড়া রোগী দেখে না। আগেভাগে নাম লেখানো জরুরি। একশ' টাকা ফি। সেই টাকাটা দিয়ে তবেই ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকতে হয়।

ডাঃ সর্বাধিকারী চেম্বারে থাকাকালে পারতপক্ষে বাইরের কলে যায় না। তাতে নাকি মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। আসলে পাকা ব্যবসায়ী বুদ্ধি। তা না হলে যদি বা কখনও সখনও যেতে বাধ্য হয় তো কমপক্ষে তিনজন রোগীর ফি নেয় কেন? এমনকি যাতায়াতের তেল খরচের টাকাটাও ছাড় দেয় না।

অথচ আশ্চর্য, এমন যার টাকার খাই সে স্নান আহার নিদ্রার সময় রোগী দেখে না। এমনকি সাপ্তাহিক বন্ধের দিন কোনও উদ্বেগজনক রোগীকে পর্যন্ত দেখতে যাবে না। মোটা টাকার বিনিময়েও না। বলে কিনা, আমরাও তো মানুষ। একটা দিন ছুটি ভোগ করব না! টাকাটাই কি সব নাকি!

অর্থাৎ কিনা, বিনা চিকিৎসায় একটি প্রাণ চলে যাওয়া ওর কাছে কোনও ব্যাপারই না। এমন হৃদয়হীন দৃষ্টিভঙ্গী আছে বলেই গ্রীষ্ম আর পূজায় আগাম নোটিশ টাঙিয়ে জানান দিয়ে দূরে ট্যুরে যেতে পারে। তবে টাকাটা সবকিছু না বললেও কতটা যে কি তা ওর ঠাটবাট দেখেই মালুম হয়। মাত্র পাঁচ বছরে সিওলো গাড়ি আর চোখ ধাঁধাঁনো বাড়ি যে আলাদীনের প্রদীপে হয়নি তা সবাই বুঝতে পারে। বোঝে বলেই বিখ্যাত দেবু ডাক্তারের নাতিকে অনেকে আড়ালে মানবডাকাত বলতে শুরু করেছে।

স্কুলের প্রিয়ছাত্র মানবকে যে মানুষ ডাকাত ভাবতে শুরু করেছে তা জানতে পেরে বিভূতি স্যার খুউব দুঃখিত মনঃক্ষুণ্ণ। মানবের বাবাও ওঁর ছাত্র। সেজন্য বিভূতি স্যারের প্রতি ডাঃ সর্বাধিকারীর শ্রদ্ধা ভক্তি দুর্বলতার অন্ত নেই। সেই আমলের শিক্ষকরা গরীব হলেও ডাঃ সর্বাধিকারীর চেম্বারে বিভূতি স্যারের অবাধ প্রবেশাধিকার। পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রেসক্রিপসান করে তর্জনী তুলে বলে, দশটা টাকা দেবেন স্যার। বিভূতি স্যার প্রথমবার অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিলেন, দশ টাকা কেন? ডাঃ সর্বাধিকারী একগাল হেসে জবাব দিয়েছিল, আগেকার দিনের মানুষ আপনি। কিছু অন্তত না নিলে হয়ত আপনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে, তাই।
বিভূতি স্যারকে চলতি পথে কখনও দেখতে পেলে ডাঃ সর্বাধিকারী ওর গাড়ি থামায়। কুশল জিগ্যেস করে। একই পথে যাবার থাকলে গাড়িতে তুলে নেয়। এমনি একদিন গাড়িতে বসে কুশল বিনিময় অন্তে বিভূতি স্যার বললেন, ডায়গনস্টিক সেণ্টার করেছো দেখলাম। এরপর আর কি ভাবছো?
নার্সিংহোম করার ইচ্ছা আছে।
তারপর?
এ্যামবুলেন্স।
তারপর?
এগুলো আগে হোক তারপর ভাবা যাবে। হঠাৎ খটকা লাগতে ডাঃ সর্বাধিকারী প্রশ্ন করল, এভাবে জিগ্যেস করছেন কেন স্যার?
দেখছিলাম তুমি আরও কত টাকা চাও। বিভূতি স্যার ক্ষোভ গোপন রাখলেন না, টাকা টাকা টাকা। আজকালকার প্রায় সব ডাক্তাররা অদ্ভুত অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। সেবার ব্যাপারটা ভুলতেই বসেছে। জানো, লোকে তোমাকে কি বলে?
কি?
মানব ডাকাত। বিভূতি স্যার তীব্র যন্ত্রণায় আক্ষেপ করলেন, দেবু ডাক্তারের নাতি তুমি এমন হলে কেমন করে?
কি রকম? ডাঃ সর্বাধিকারী প্রতিক্রিয়াহীন স্মিত হাসল।
তোমার ঠাকুর্দাকে কেউ দয়ার অবতার অথবা সাক্ষাৎ দেবতা ইত্যাদি বললে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হতেন।
কেন?
বলতেন, মানুষ মাত্রই দেবতা। নরনারায়ণ। বিবেকানন্দকে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ তিরস্কার করে বলেছিলেন, দয়া করার তুই কে রে? বল, জীবে সেবা। জীবে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। তো দেবু ডাক্তার বলতেন, তোমাদের সেবার ব্রতে আমি ঈশ্বরকে সেবা করছি মাত্র।
ঠাকুর্দার সঙ্গে আমার নামের তফাতটা দেখবেন না! ডাঃ সর্বাধিকারী বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত লজ্জিত বিব্রত না হয়ে দ্বিধাহীন বলল, ওঁর নাম ছিল দেবব্রত। আমি মানব। বৃত্তিতে ডাক্তার হলেও মানুষের ধর্মে কামনা বাসনা উচ্চাশা আমার তো থাকবেই। এটাই তো স্বাভাবিক।
বিভূতি স্যার বিস্ময়ে হতবাক। মনে মনে ভাবলেন, দেবু ডাক্তার কি তাহলে দেবতাই ছিলেন, মানুষ ছিলেন না!

নামমাত্র মানুষ

যদি না থাকেরে মান না থাকেরে হুঁশ
তবে সে তো হয় নারে মানুষ ....

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে গানটা। ইদানীং এই অভ্যেস হয়েছে সুজাতার। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে ছোট্ট যন্ত্রটিতে এফ এম চালিয়ে দিনের কাজ শুরু করবে। প্রথমদিকে সুরঞ্জন বিরক্ত হতো। এখন হয় না। কেননা, প্রচারিত গানগুলি শুনতে বেশ ভালোই লাগে।

বিছানায় শুয়ে সুরঞ্জন ভেসে আসা ওই গানের দু'কলিতে বেশ মশগুল হয়ে পড়ল। বেশ ধন্দ লাগল। ভাবল, মানীরা কি বেহুঁশ হন কখনও? আজকের দিনে মানীইবা কোন্ জনেরা! খাটো বুদ্ধিতে 'মানুষ' শব্দের অর্থটা সঠিক মালুম হল না। নিজেকে মানীগুণী না ভাবলেও যথেষ্ট হুঁশ আছে বলেই মনে করে। মনে মনে ভাবল, সেজন্যই তো মান বজায় রাখা আকছার দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুজাতা এসে তাগিদ দিল, ঝটপট উঠে পড়। চা তৈরি হয়ে গেছে। আজ একটু বাজারে যেতে হবে।

দশ দোকান ঘুরে সব্জি কিনতে হলে যে ধৈর্য ও সময় খরচ করা দরকার হয় তার কোনোটিই সুরঞ্জনের নেই। সেজন্য নির্দিষ্ট দোকানটি থেকে যতটা সম্ভব কেনাকাটি সারছিল। চাহিদার চাইতেও পঁচিশ পঞ্চাশ একশ গ্রামের বাটখারা বেশি চাপালে যে হিসেবে অসুবিধা হয় তা বললেও দোকানি ইচ্ছাকৃত আমল দেয় না। সুরঞ্জনের ধন্দ লাগত, ব্যস্ত ভিড়ে ভিন্নতর দর ও ওজনের এতরকম দ্রব্যের মোটমূল্য এত চটজলদি নির্ভুল বলে কেমন করে!

সুরঞ্জন আজ ধার করে আনা একটা ছোট্ট ক্যালকুলেটর নিয়ে এসেছে সত্যতা যাচাই করতে। তাতেই দোকানির ফটাফট মৌখিক হিসাব, আটচল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা হয়ে দাঁড়াল চল্লিশ টাকা পঁচিশ।

ঠকবাজ কোথাকার। উত্তেজনায় সুরঞ্জন মেজাজ সপ্তমে তুলে বলল, তুমি তো দেখছি ডাকাত হে। আমি তোমার বাঁধা খদ্দের। জানি না, দিনের পর দিন আমার মতো আরও কত খদ্দেরকে এভাবে ঠকিয়ে খাচ্ছ তুমি।

ডাকাত, ঠকবাজ! দোকানি প্রতিবাদী উচ্চ কণ্ঠে বলল, যা ইচ্ছে তাই বলছেন?

ঠকালে বলব না? অন্য কেউ হলে হাত চালিয়ে দিত।

ঠকালে তবে তো বলবেন। দোকানি লজ্জা সঙ্কোচহীন বুক চিতিয়ে বলল, ভুল হয় না দানব আর মহামানবের। আমি তো মানুষ। আপনার ভুল হয় না?

সুরঞ্জন নির্বাক। লক্ষ্য করল, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনের ভিড় জমেছে। আশঙ্কা হল, সংখ্যাটা বাড়তেই থাকবে। পরিণতিতে ঘোলাজলে ঝাণ্ডা ডাণ্ডার রাজনীতি এসে যেতে পারে। খেটে খাওয়া মানুষ দোকানিকে ডাকাত ঠগবাজ বলার জন্য বিশ্রী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ষোল আনা সম্ভাবনা। সুতরাং, হুঁশযুক্ত মানুষের মতো ঝটিতি প্রস্থান করল।

সুরঞ্জন বাড়ি ফিরল তিক্ত বিরক্ত মেজাজে। ফিরে দেখে, সুজাতার মেজাজও ঠিকঠাক নেই। কারণটা বুঝতে অসুবিধা হল না। অনুমানে জিগ্যেস করল, জবা আজও আসেনি বুঝি?

এলে তো দেখতেই পেতে। বাজারের থলে হাতে নিয়ে সুজাতা সোজা রান্না ঘরে গেল। এই সময় আর একবার চা খাওয়া সুরঞ্জনের অভ্যেস। সেই আশা ছেড়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসতে যাবে এমন সময় জবা হাজির।
কি গো জবা এই তিনদিন আবার কি অসুখ হয়েছিল তোমার? সুরঞ্জন তির্যক ঢঙে প্রশ্ন করল।
সবসময় অসুখ করতে যাবে কেন? জবা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জবাব দিল, আমরাও তো মানুষ। ঝি বলে কি সখ আহ্লাদ থাকতে নেই নাকি। কুটুম বাড়ি গিয়েছিলুম।
তেমন কথা তো কেউ বলেনি। এবার উত্তর জুড়ল সুজাতা, না বলে কয়ে হঠাৎ হঠাৎ ডুব মারলে যে অসুবিধায় পড়তে হয় তাতো কতবার তোমাকে বলেছি। অসুখ জলঝড়ের বেলায় নাহয় আগাম বলা যায় না। কুটুমবাড়ি যাওয়ার আগে তো বলা যেত।
আগে ঠিক থাকলে তো বলব।
বুঝেছি বুঝেছি। সুজাতা মাছ কুটতে কুটতে বলল, বাসন কোসন আমার ধোয়া হয়ে গেছে। পারতো তোমার দাদাবাবুকে এককাপ চা করে দাও।
চায়ের জল চাপিয়ে ফ্রীজ খুলে জবা বলল, বউদি দুধ দেখছি না তো!
দু'দিন দুধ দিয়ে যাচ্ছে না। র চা করে দাও।
দুধ দিচ্ছে না কেন?
কি করে বলব? সুজাতা বক্রোক্তি করল, সেও তো মানুষ। তারও সখ আহ্লাদ অসুখবিসুখ থাকতেই পারে।
ঠেস কাটছো কেন বউদিমণি। জবা মুখরা হয়ে উঠল, কার সঙ্গে কার তুলনা। দুধ বলে কথা। আজ যদি তোমার ঘরে একটা দুধের বাচ্চা থাকত। ওষুধের দোকান কি ইচ্ছেমতন বন্ধ রাখা চলে?
তাও থাকছে গো জবা। খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলে সুরঞ্জন বলল, অসময়ে ডাক্তার ডাকলেও আজকাল পাওয়া যায় না। এইতো আজকের কাগজে লিখেছে, ডাক্তাররাও ধর্মঘটে নামছে।
জবা নিরুত্তর ঘর মুছতে থাকল।
সুরঞ্জন প্রায় আধঘণ্টা হল তেমাথার বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে অথচ বাসের দেখা নেই। ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত হল, আজও বোধহয় হাজিরা খাতায় লাল কালির দাগ এড়ানো গেল না। হঠাৎই মোটর বাইকের এক আরোহী আশ্চর্যজনকভাবে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়ে অপরাধী ট্যাক্সিটাকে থামাল। প্রত্যক্ষদর্শী সুরঞ্জন দেখল, দোষটা ট্যাক্সিচালকের। সে ট্রাফিক নিয়ম মানেনি। চালাচ্ছিলও বেপরোয়া।
ব্যস্ এই নিয়ে দু'পক্ষের তর্কাতর্কি হম্বিতম্বি গালমন্দ থেকে হাতাহাতির উপক্রম। চায়ের দোকানে বসে থাকা ছেলেরা এসে অশান্তি থামাল। সুরঞ্জন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল, কেউই কিন্তু জৌলুসদার পোশাক পরা সুশ্রী মোটর বাইক আরোহীর পক্ষ নিল না। পরিবর্তে ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন মোটর আরোহীকে উদ্ধত মেজাজে বলল, অত গরম কিসের মোশাই? ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে কি মানুষ না। আপনার মতো অনেক ভদ্দরনোক দেখা গেছে। চুপ মারুন তো। নৈলে আপনাকেই কেলিয়ে দেব।

সুরঞ্জন ভাবল, দিনটা আজ নির্ঘাৎ খারাপ যাবে।
দীর্ঘক্ষণ পর আসা মিনিবাসটায় বস্তাঠাসা ভিড়। তবু, পাদানিতে ঝুলে হেল্পার হাঁকছে, উঠুন উঠুন, একদম ফাঁকা। অনেক কষ্টে ভেতরে ঢুকে সুরঞ্জনের নজরে পড়ল, ড্রাইভারের পেছনদিকটাতে লেখা, ব্যবহারেই আপনার পরিচয়। এদিকে প্রতিটি স্টপে গেটে দাঁড়িয়ে কণ্ডাক্টর বিরামবিহীন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে যাত্রীদের ধমকিয়ে যাচ্ছে, চাপুন চাপুন। আর একটু চাপুন।
কিছুটা পথ আসার পর কণ্ডাক্টর দরজার সুমুখের এক যাত্রীকে বিরক্তি প্রকাশ করল, ধু-র-র্ মোশাই। কখন থেকে বলছি, ডাইনে ঘুরে ভেতরে পেছনে যান। কানের মাথা খেয়েছেন নাকি! এরপর কণ্ডাক্টরটি কারও পা মাড়িয়ে কাউকে গোত্তা মেরে ভেতরে ঢুকে টিকিট কাটতে শুরু করল।
আর কত ঠাসবে ভাই? গলদঘর্ম অসুস্থ এক যাত্রী বলল, অফিস টাইম। ড্রাইভারকে স্পীডটা একটু বাড়াতে বল।
হাতে আরও সময় নিয়ে বের হতে পারেন না? কণ্ডাক্টর দুম করে জবাব ছুঁড়ল, এই স্পীড পছন্দ নাহলে ট্যাক্সি ধরুন।
ভদ্রভাবে কথা বলতে পার না?
অভদ্রভাবে কি বললাম? আসলে ড্রাইভার কণ্ডাক্টরদের আপনারা মানুষই ভাবতে চান না। তাই অভদ্র ব্যবহার আপনারাই করে থাকেন। দেখছি তো হররোজ।
এক একটা দিন মানুষের বোধহয় এমনই যায়। আজ সুরঞ্জনের অফিসেও ঘটল এক অঘটন। সুরঞ্জনের অফিসঘরের ওপারে বড় মেজ ছোট সাহেবদের চেম্বার। মাঝে কড়িডোর। সব সাহেবের দরজার সুমুখে অর্ডারলি পিওনদের টুল পাতা। ওদেরও মাথার ওপর বিদ্যুৎ পাখা ঘোরে। তাই নিষ্কর্মা বসে থেকে কখনও সখনও তন্দ্রা আসে। আবার নেশাও চাগাড় দেয়। তাই বিড়ি সিগ্রেট ফোঁকা অভ্যেস। বড় সাহেব নিজে ধূমপায়ী না হলেইবা কী! অর্ডারলির সিগ্রেটের ধোঁয়া ওপরের জালির ফাঁক দিয়ে চেম্বারে ঢুকলেও তিনি অবজ্ঞাই করে থাকেন।
এহেন বড় সাহেব ওপরঅলার জরুরি ডাক পেয়ে দ্রুত চেম্বার ছেড়ে বের হলেন। অন্যত্র একঘণ্টা আলোচনান্তে ফিরে এসে দেখলেন, চেম্বার থেকে ব্রিফকেস উধাও।
ব্যস্ অর্ডারলিকে লিখিত শো-কজ চিঠি ধরালেন। প্রত্যুত্তরে ডেপুটেশনে দাবি এলো, শো-কজ উইথড্র চাই। মানুষ মাত্রেরই বাথরুম পেতে পারে। সেই সময় চোর ঢুকলে তা দেখার দায়িত্ব পাহারাদারদের।
ঝামেলাটা তখনকার মতো মিটলেও ছুটির পর আবার জটিলতা।
বড়সাহেব থাকেন পৈলান পার্কে নিজ আবাসে। যাতায়াতের জন্য পদমর্যাদার গাড়ি বরাদ্দ আছে। বিবাদী বাগ থেকে পৈলান পার্কের দূরত্ব নেহাত কম না। বাস ছাড়া অন্য গতি নেই। সরকারি বেসরকারি বাস মিনি বাস লাক্সারি বাসের সংখ্যা কম না হলেও যাত্রীদের তুলনায় অপ্রতুল। তাই সহৃদয় বড় সাহেব ওদিককার যে কোনও শ্রেণীর কর্মীকেই সাদরে লিফ্ট দিয়ে থাকেন। নিজে বসেন সামনে ড্রাইভারের পাশে।
আজ বড়সাহেব দেখলেন, পিছনের সিটে ঠাসা সওয়ারি। ড্রাইভারের পাশে ওর জন্য নির্দিষ্ট সীটে অপরিচিত একজন বসে আছে।

অবাক বিরক্ত নির্বাক বড়সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন।
ড্রাইভার বলল, আমাদেরই স্টাফ স্যার। একটু চেপে বসলে ম্যানেজ হয়ে যাবে। আপনি সাইডেই বসুন স্যার। কোনও কষ্ট হবে না।
অসম্ভব। বড়সাহেব চোয়াল শক্ত করে বললেন, এভাবে যাব না আমি।
কেন? সম্মিলিত পরবর্তী প্রশ্ন, ওর পাশে বসলে আপনার ইজ্জত যাবে? সর্বশেষ প্রশ্ন, ওকি মানুষ না?
মানুষ মানুষ মানুষ। আজ সকাল থেকে এই মানুষ শব্দটা যেন সুরঞ্জনকে অদ্ভুতভাবে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। অফিস ছুটির পর অজস্র মানুষের মিছিলের ভেতর দিয়ে ব্যক্তিগত নানা কাজ সেরে সুরঞ্জন এখন এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে যেখান থেকে ট্রেনে বাড়ি ফেরা সহজ ও আরামদায়ক মনে হল।
সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ অল্পরাতের ট্রেনে এখন ঠাসা ভিড়। যাত্রী ট্রেনের কামরায় চালের বস্তা ছানাসব্জির ঝুড়ি। কাঠের গুড়োর বাণ্ডিল। বড়বাজারের সওদা। হরেক হকারের চিৎকার গুঁতোগুঁতি। ক্লান্ত বিবর্ণ বিধ্বস্ত সুরঞ্জনের পাশে ধেনো মদের বদবু মুখে খেটে খাওয়া একজন মানুষ বসে আছে। তেলকালি-পোশাক ঘাম জবজবে। বারবার ওর ঘুম-ঢুলুনিতে সুরঞ্জনের গা ঘিন ঘিন করে উঠছে। সুরঞ্জন বিরক্ত হলেও প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে। অশান্তির আশঙ্কাটা সেইখানে। নেশুড়েটি যদি ফোঁস করে জ্বলে.ওঠে, অত ঘেন্না কীসের! নোংরা জামা কাপড় পরে আছি বলে কি আমি মানুষ না?
চারদিকে এত এত মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অজস্র অন্যায় ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদের ইচ্ছেটা সুরঞ্জনের কাছে আহাম্মুকি মনে হতে থাকল। সেই সঙ্গে মনে হল, নিয়ত অজস্র মানুষ ক্রমশ নিস্তেজ নিস্পৃহ সহনশীল নির্বাক হতে হতে নামমাত্র মানুষ হয়ে যাচ্ছে। সংখ্যাটা দ্রুত বাড়ছে। অতি দ্রুত।

বালক বৃদ্ধের গল্প

আমি একা বাসায় আছি। মা বাবা বেড়াতে গেছে। বাবার বন্ধু তপেন কাকুদের সুন্দর একটা বাড়ি আছে। গঙ্গার ধারে। সেখানে। তপেনকাকু বিলেতে থাকেন। এদেশে এলেই পুরনো বন্ধুদের নেমন্তন্ন করেন। ওই সুন্দর বাড়িটাতে। সবাই মিলে খুব আনন্দ ফুর্তি করেন। খুব ছোটবেলায় আমিও একবার গিয়েছিলাম। তারপর থেকে আমাকে আর নেয়া হয়না। সেবারকার কথা আমার খুব ভাল করে মনে নেই। নদী নৌকা গাছ পাখি ফুলের কথা বেশ মনে আছে। যেসব পোশাকে বাবার বন্ধুদের দেখেছিলাম, তেমনটি এখনো দেখি। কাকিদের তেমন পোশাকগুলো দেখতে পাওয়া যায় না।

তপেনকাকু মেম বউ নিয়ে আমাদের বাসায় এসেছিলেন। ভারি সুন্দর দেখতে। চোখ চুলের রঙ আমার মায়ের মতো না। সব সময় হাসেন। ভীষণ মিষ্টি। বাবা খু-উ-ব খুশি। আমাকে বলল, তুমিও বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করবে।

বাবার কথা আমার ভাল লাগেনি। দিদা মোটা পাড়ের গরদের শাড়ি পরে। মা স্নান করে নতুন পোশাক পরে। পূজার ডালা নিয়ে দু'জনে মন্দিরে যায়। সে অনেক বেশি সুন্দর। মা-র একঢাল লম্বা কালো চুল। প্রতিমার মতো চোখ মুখ নাক। আমার ভাল লাগে। বাবা কিনা আমাকে মেম বিয়ে করতে বলে! তপেনকাকু কিন্তু মেমকাকিকে মা-র তাঁতের শাড়ি পরিয়ে দিতে বলেছিলেন। মেমকাকিও মা-র কাপড় পরে খুশিতে বলেছিলেন, একসেলেন্ট। বিউটিফুল।

মা অনেকরকম খাবার আয়োজন করেছিল। মেমকাকির সবচেয়ে ভাল লেগেছিল মোচার ঘন্ট, কচু শাক, শুক্তো আর ইলিশ মাছ।

মেমকাকি নাকি বাংলা শিখছেন। বলতে না পারলেও বেশ বুঝতে পারেন। আমি বাংলায় বলেছিলাম, এখানে তোমার খুব কষ্ট হয়—তাই না আন্টি? বাবা রেগে আগুন। বলল, এটা একটা প্রশ্ন হল? ওরা কীভাবে থাকতে অভ্যস্ত জানো না?

মেমকাকি আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরলেন। কপালে চুমু খেলেন। খুব সুন্দর করে হাসলেন। দিদা মা-র মতো। আমার ভাল লাগল। উঁনি বললেন, আই লাইক টু স্টে ইন ইণ্ডিয়া ফর এভার। ইণ্ডিয়া ইজ এ প্লেস অব ফ্যানটাসটিক ন্যাচারাল বিউটি। অ্যাণ্ড ব্রড হার্টেড পিপলস।

মা-র মুখে বাংলায় অর্থ বুঝে আমার আনন্দ হয়েছিল। আমার দেশ মা আর স্কুলকে কেউ ভাল বললে ভীষণ ভাল লাগে। বাবা অন্যরকম। সব কিছুতেই বিদেশের একজাম্পল দেয়। ওদের সব কিছুই নাকি ভাল। দুঃখ করে বলে, সামনের জন্মে যেন এদেশে আর না জন্মি।

শুনে বাবার ওপর ভীষণ রাগ হয়। এই যে একা আমাকে রেখে গেছে তাতেও রাগ হয়েছে। দাদু দিদা থাকলে ওঁরাও রাগ করত। দিদা বলত, ছেলেরে বাদ দিয়া ক্যামনতর নেমন্তন্ন। কাজ নাই গিয়া। অরা বুঝুক।

আগে আমি বুঝতাম না। যেতে ইচ্ছে হতো। আজকালতো বেশ বড় হয়েছি। একা থাকতে পারি। বুঝতেও পারি, ওসব সাহেবি নেমন্তন্নে কিসব হয়। ইংরেজিতে বলে 'পার্টি'। শুধু বাবা মা-দের জন্য। খোকা খুকুদের বাড়িতেই থাকতে হয়।

থাকিতো। প্রায়ই। কিন্তু ভীষণ একা একা লাগে। আমার আর কোন ভাইবোন নেই যে। বাবা মা বলে, আমি নাকি দাদু-দিদার আদরে বাঁদর হয়ে যাচ্ছি। দিদা বলে, এ্যাকটা বাচ্চা বইল্যা অত তুতুবুতু করো। অমন করলে বাচ্চারা সত্যিকার মানুয হইতে পারে না।

দিদা ঠিকই বলে। বাবা মা সর্বক্ষণ আমাকে শাসন করে। আমার ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারি না। বাবা মা না থাকলে কাজের মাসিটা আরও বেশি শাসন করে। ওরা যতটা বলে যায় তার চেয়েও অনেক বেশি। পাড়ার ছোট ছেলেরাও আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমার ভীষণ লজ্জা হয়। বাবা মা আমাকে নিয়ে অনেক কিছু আশা করে। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট চাই। তিনটে প্রাইভেট মাস্টার। আঁকা শেখাবার জন্য একজন আর্টিস্ট। সাঁতার শেখাতে আজাদ হিন্দ বাগে নিয়ে যায়। জেনারেল নলেজের জন্য কত ভারি ভারি বিদেশী বই এনে দেয়। আরও কত কীয়ে। আজকালতো আবার মর্নিং ওয়াক করাচ্ছে। আমার ভীষণ কষ্ট হয়। কিছু বলার উপায় নেই। তাহলেই একসঙ্গে দু'জনের বকুনি। বাবাতো রাগের মাথায় হাত চালিয়েও দেয় অনেক সময়।

বেশি বেলায় হঠাৎ ব্রজেন জেঠু এলেন। রোদ্দুরে ঘেমে। আমি আশ্চর্য। খুশিও। মা বাবাকে না দেখে ফিরে যেতে চাইলেন। আমি দিইনি।

ব্রজেন জেঠু থাকেন কল্যাণীতে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এরকম সময়েই আসেন। দুপুরে এখানে খান। আমার তখনও খাওয়া হয়নি। ফ্রিজে সবসময়ই বেশি বেশি খাবার থাকে। মাসি বেশ চালাকি করে দু'জনকে খাইয়ে দিয়েছে।

জেঠু আমাকে পেয়ে খুব খুশি। বাবা থাকলে তাঁর কাছে দুঃখ করতেন। ছেলে বউমা তেমন যত্ন করে না—সেই দুঃখ। মা-কে বলতেন, মাঝে মাঝে যখন অসহ্য লাগে তোমাদের কাছে চলে আসি। তোমাদের এখানে এসে অনেক শান্তি পাই।

বাবা মা কিন্তু জেঠুকে কোনদিনই দু'দিন থেকে যেতে বলে না। অথচ, কত বন্ধুরাইতো আনন্দ ফুর্তি করতে করতে রাত হয়ে গেলে থেকে যায়। জেঠুর বেলায় নাকি থাকার জায়গার অভাব। সেবার আমার আর বাবার যখন একই সঙ্গে খুব জ্বর হয়েছিল, হঠাৎ জেঠু এসে গিয়েছিলেন। দু'রাত্তির থেকেছিলেন। নিজে থেকেই। কি না করেছিলেন আমাদের জন্য। মা জেঠুর কষ্ট দেখে বাবার বন্ধুদের খবর দিতে চেয়েছিল। বাবা রাজি হয়নি। বলেছে, কি দরকার ওদেরকে বিব্রত করে। দাদাইতো আছে।

বাবা মা বাসায় না থাকায় জেঠু একবারও দুঃখ করলেন না। আমার পড়াশুনা সম্পর্কে অনেক খোঁজ নিলেন। শরীর সম্পর্কে যত্নবান হতে বললেন। অনেক ভাল ভাল উপদেশ দিলেন। জলের মতো বুঝিয়ে। বাবার মতো ভয়ডর দেখিয়ে নয়। উপদেশ সম্পর্কে আমার আর ভয় থাকল না। দুপুরে জেঠু জড়িয়ে শুলেন আমাকে। আমার লজ্জা করছিল। অনেকদিন হ'ল কারও সঙ্গে শোয়া অভ্যেস নেইতো। বাবা বলে, আমি নাকি বড় হয়ে গেছি। অথচ প্রলয়কাকু কাকিদের মতো অনেকের সঙ্গে যখন পাশের ঘরে মদ খায় আমাকে ঢুকতে দেয় না। কাকু কাকিরাওতো আমাকে ভালবাসেন। ওঁরা এলে কাছে গেলেই বাবা তাড়িয়ে দেয়। বলে, বড়দের কথার সময় বাচ্চাদের থাকতে নেই। যাও পড়গে। বই নিয়ে মন খারাপ করে বসে থাকি। হাসি ঠাট্টার শব্দ শুনি। ওঁরা যতক্ষণ থাকেন কিছুতেই পড়ায় মন বসে না।

জেঠু আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আঙুল ফুটিয়ে দিলেন। বারবার বুকে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন। কী যে আরাম। ভীষণ ভাল লাগছিল। আদর করলে কার না ভাল লাগে। বাবা মা সবসময় খিটমিট করে। নিজেরা ঝগড়া করে। শেষমেশ দোষ এসে পড়ে আমার ওপর। আমাকে অনেকসময় কেন যে মারে—বুঝি না।

জেঠুর কাছে শুধুই আদর। ওঁর বিরাট ভুঁড়িটায় ভয়ে ভয়ে হাত বোলালাম। কিছু বললেন না। মনে হয়, বেশ আরাম পাচ্ছিলেন। পাকা চুল তুলে দিতে বললেন। দিলামও। মনে হ'ল, জেঠু যেন দাদু হয়ে গেছেন।

সারা দুপুর নাক ডেকে ঘুমোলেন জেঠু। সন্ধ্যায় স্নান করলেন। চা খেলেন। আকাশে মেঘ জমেছে। জোরে হাওয়া বইছিল। জেঠু আমার হাতে দু'টো টাকা দিলেন। বললেন, কিছু কিনে খাস। আসার সময় ক্যাডবেরী এনেছিলেন। ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। খেতে খেতে বললাম, ঝড় উঠবে যে। জেঠু অবাক হয়ে বললেন, তুই অত ভাবিস্ আমার জন্যে? কাপড় পরতে পরতে বললেন, ওরা এখনো ফিরল নাতো? কতদূর গেছে জানিস্ কিছু?
জানিতো। কিন্তু, বলা ঠিক হবে কিনা ভাবলাম। বাইরের লোকজনকে ঠিকমতো কথা না বলতে পারলে বাবা মা ভয়ানক রাগ করে। বলে, হাঁদারাম। অথবা, তোমার এত পাকামোর কি দরকার ছিল।
জেঠুর যাওয়া হ'ল না। ঝড় উঠল যে। তারপর ভীষণ বৃষ্টি। ঘন ঘন বাজ পড়ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। শিল পড়ছিল। ভয় করছিল। ভালও লাগছিল। অনেক দেরিতে ভীষণ চিন্তা হ'ল। বাবা মা-র জন্য। ওরা ফিরবে কেমন করে। জেঠু চিন্তা করছিলেন নিজের জন্যে। কেবলি বলছিলেন, মহা মুশকিল হ'ল। ফিরবো কেমন করে। আমিতো বাবা মা-কে জানি। তাই বলতে পারি না—ভয় কী? থেকে যাবেন।
সন্ধেয় কোনদিন বাবা মা না ফিরলে আমাকে সন্ধ্যার বাতি ধূপ জ্বালতে হয়। নয়তো বকুনি খেতে হবে। আমি সন্ধ্যা দিলাম। শাঁখ বাজালাম। জেঠু, বাবা মা-র জন্য ঝড়বৃষ্টি থামিয়ে দেয়ার প্রার্থনা করলাম। জেঠু উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন। বললেন, বেশ তৈরি হয়েছি সতো। তোর মঙ্গল হবে।
অথচ, মা বলে—নষ্টের গোড়া। ঢেঁকি। তোর দ্বারা কিস্‌স্যু হবে না। বাবাও মাঝে মাঝে ওরকমই বলেন তবে ইংরেজিতে।
আমি পড়তে বসলাম। ওঁরা এসে পড়তে না দেখলে রাগ করবে যে। জেঠু একটা বই পড়ছিলেন। আমার পড়ায় মন বসছিল না। কেবলি ওদের কথা ভাবছিলাম। জেঠুর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করছিল। এসে গল্প করতে দেখলে বকুনি খেতে হবে যে। জেঠুর অসম্মান হবে। লজ্জা পাবেন। মাসি ঘরে নেই। পাশের ফ্লাটের মাসির সঙ্গে গল্প করছে হয়তো।
অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। জেঠু যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। আমার ভাল লাগল না। কলিং বেল বেজে উঠল। ওরা এল। জেঠু দরজা খুলে বললেন, বউমা একদম ভিজে গেছো যে।
আমি পড়ার টেবিল থেকে উঠলাম না। বাবা এসে বকলো, দরজাটা তুমি খুলতে পারলে না? অনেকসময় বকুনির মানে বুঝতে পারি না। আজকে বুঝতে পারছি। বাবার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। জেঠু জানতে পেরে গেছেন। বাবার রাগ সেজন্য।
আমি কিছু বললাম না। জেঠুই বললেন, তাতে কি হয়েছে। ওতো যেতই। দেখলাম, পড়ছে। বাবা কথা বাড়াল না। জিগ্যেস করল না, কখন এসেছিলে। কাপড় বদলে মা এসে জিগ্যেস করল। জেঠু বললেন, যেমন আসি। যেমন যাই—যাচ্ছিলাম। ঝড় বৃষ্টিতে আটকে গেছি। এবার চলি। কেউ দু'দণ্ড বসতে বলল না। বাবা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বলল, বাড়ির সব ভালতো? হ্যাঁ তোমাদের মতো আছে আর কী।
বাবা মা চুপচাপ। জেঠু যাবার আগে বলে গেলেন, ভীষণ একা লাগে। তাইতো চলে আসি। খোকা বউমাতো মেমসাহেব হয়ে গেছে। আজকাল প্রায়ই পার্টি হয়। বাড়িতেই। আজতো দুপুরেই ছিল। ওরাই চাইছিল, আমার না-থাকাই ভাল। তাইতো চলে এসেছিলাম।
জেঠু চলে গেলেন। পাশের ঘরে বাবা মা। মাসি রান্নাঘরে। জেঠুর জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে। আমার ভীষণ একা একা লাগে। এখনো লাগছে। কিন্তু, আমিতো জেঠুর মতো কোথাও চলে যেতে পারি না। আমার জন্য কারও কষ্ট হয় না। কান্নাও পায় না। আমি নিজেই নিজের জন্য কাঁদছি।

তবু

যে যার ঘরে এক একটি খুঁদে ডিক্টেটর। অথচ; মাঠ ময়দান মিছিলে স্বৈরতন্ত্রী স্বৈরতন্ত্রী বলে চেল্লাবে। ঘরের শান্তির দিকে নজর নেই। রাস্তায় বিশ্বশান্তির মিছিল করবে। যত্তসব।
বুড়ো মানুষটি বিরক্তির সঙ্গে আচমকা মন্তব্য করলেন। কাউকে উদ্দেশ করে শোনাবার জন্য নয়। নিজের মনেই।
মন্তব্যের কারণ একটাই। রাজপথে শান্তিমিছিল বেরিয়েছে। ভিড়টা অবশ্যই ঐতিহাসিক। সুতরাং, সমস্ত কলকাতা শহর জ্যামজটে স্তব্ধ অচল। 'বু'র ক্ষোভ সে কারণে। প্রায় দেড়ঘণ্টা যাবত চুপচাপ বসে আছেন। হয়তো খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। একটাও বিড়ি সিগারেট খাননি এতক্ষণে। বোঝা যায়, ধূমপানের নেশা নেই। থাকলে এতক্ষণে অন্তত এক আধটা খেতেন। তারপর ভাদ্রের গরম। সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। পরনের পাঞ্জাবি ঘামে জবজবে। নাকের ডগা এবং ঢাল পিচ্ছিল। চশমাটা বার বার গড়িয়ে পড়ছে।
রুমাল দিয়ে ঘাড় কপাল মুখ নাক মুছতে মুছতে 'বু' নিজের মনেই বলে চলেছেন, সেদিন একটা রঙিন পোস্টার দেখছিলাম। অনেকগুলো পেল্লাই লম্বা লম্বা হাত সূর্যের দিকে বাড়িয়ে আছে। অর্থাৎ, সূর্যটাকে ওরা ধরতে চায়—কতবড় স্পর্ধা।
পাশের সিটে বসে থাকা তরুণটিরও এতক্ষণ এভাবে বসে থেকে গরমে দারুণ কষ্ট হচ্ছিল। ঘন ঘন সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল। এতক্ষণ চুপচাপ শোনার পর 'বু'র স্বগত মন্তব্য গায়ে টেনে জবাব দিল, আপনার বুঝতে ভুল হয়েছে। ওরা আদপেই সূর্যটাকে ধরতে চাইছে না। দুঃখময় অন্ধকার পেরিয়ে আলোকউজ্জ্বল সুখের দিকে পৌঁছাতে চাইছে।
তাহলে ওভাবে হাত কেন? 'বু' প্রশ্ন তুলে যুক্তি জুড়লেন, পা বাড়িয়ে থাকা ছবি হওয়া উচিত ছিল।
পা কখনও চাওয়ার প্রতীক হতে পারে না। পাওয়া পৌঁছানো প্রাপ্তির হতে পারে। তাছাড়া, দুঃখ পেরিয়ে সুখের নাগাল পেতে হাতই দরকার সবার আগে। 'ত' বলল, বুঝলেন দাদু।
'বু' দমে যাবার পাত্র নন। 'দাদু' সম্বোধনটা ঠিক মনঃপুত হ'ল না। বিদ্রূপ বোধ করলেন। প্রত্যুত্তরে ছোট নাতিকে বোঝাবার ঢঙে বললেন, না দাদুভাই—ভুল কথা। হাত নয়—মাথাটা চাই সবার আগে। মাথা ঠিক না থাকলে যতই হাত পা ছোড় বজ্রমুষ্ঠি দেখাও চেল্লিয়ে শ্লোগান দাও—কিচ্ছুটি হবার নয়। হচ্ছেও না তাই। হবে কেমন করে? কারও মাথাইতো আজকাল আর ঠিকঠাক নেই।
'ত' কোন যুক্তিতে গেল না। তর্কবিতর্ক এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, আপনি প্রাচীনপন্থী। একযুগ অন্যযুগকে ঠিক বুঝতে চায় না। অথবা বুঝেও বোঝে না।
'যুগ' এবং 'প্রাচীন' শব্দ দু'টিকে কেন্দ্র করে 'বু' বললেন, কিন্তু চিরন্তন বলে একটা কিছু আছে তো? কোন যুগই কিন্তু তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না বাছা। আজকাল অনেক পার্টি হরেক ইজমের সমর্থক দেখছি—
'ত'র মনে হল, লোকটি বড় অপ্রাসঙ্গিক কথা জুড়ছেন। মূল উদ্দেশ্য বর্তমান রাজনীতি—বিরুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশ। 'ত' বলল, সর্বকালেই হরেক চিন্তাধারার দল গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান ছিল। এখনও আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে।

আমি কিন্তু আমার কথাটা এখনো শেষ করিনি। আমার জিজ্ঞাস্য, চিরন্তন ইজমটা কী—বলতে পার?
'বু' যেন মুখের ওপর ধা করে একখানা কঠিন ব্যাটমিন্টন চাপ মারলেন। 'ত' ফেরাতে পারল না। এক পয়েন্ট হারানোর মতো নৈরাশ্য বোধ করল। কিছুটা লজ্জা পেল। তবু, লড়তে হবে। তাই জিগ্যেস করল, তেমন কিছু আছে নাকি?
'বু' যেন জিতছেন এবং জিতবেন—এমন ভাবভঙ্গি করে হাসলেন। তারপর ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে জবাব দিলেন, জানো না! জানবে কেমন করে। একালের তোমরা ধর্মের আফিঙ খাওনা। তার বদলে পার্টিবাবুদের দেয়া আফিঙ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছো যে।
'ত' একটু অসন্তুষ্ট হল। যদিও ট্রামের অধিকাংশ যাত্রীরাই ইতিমধ্যে নেমে গেছে তবু গ্যালারি শূন্য নয়। লজ্জা বিশেষত সেই কারণে যে, ধারে কাছেই কয়েকটি অল্পবয়সী তরুণী বসে আছে। 'ত' আলোচনায় ইতি টানতে তৎপর হ'ল। 'বু'কে থামিয়ে দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাতে সুযোগ দিল। বলল, আবার রাজনীতি কেন? ওসব আমি আপনি—কেউই বুঝি না। আমি বুঝতেও চাই না। সবে বিজনেস্ শুরু করেছি। ব্যবসায়ীদের জটিল রাজনীতি নিয়ে ভাবতে নেই। আপনি বরং বলুন, চিরন্তন ইজমটা কি?
হিউম্যানিজম। বাংলায় মনুষ্যত্ববোধ। 'বু' আবার একটি কঠিন সার্ভ করলেন, জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কী—জানো?
'ত' আবার পরাজিত। বোকার মত বিষণ্ণ চোখ চেয়ে 'বু'র মুখের দিকে উত্তর শোনার অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকল।
'বু' বললেন, চরিত্রবল। বিশটা দুর্বল চরিত্রের লোকের চেয়ে একটি চরিত্রবান লোক অনেক বেশি শক্তিশালী। উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটি প্রশ্ন, দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে কেন জানো?
'ত' তেমনি নির্বাক। উদাস চাহনি। এবার মাথা নিচু করল। ভাবল, ওঁর সঙ্গে আলোচনায় না-জড়ানোই ছিল ভাল। ভুলটা অবশ্যই নিজের। সূর্য সম্পর্কিত মন্তব্যটা গায়ে মেখে অযথা জবাব না দেয়া সঙ্গত ছিল। ট্রামে বাসে পথে ভিড়ে নানা জনে কতরকম মন্তব্যই তো করে। 'ত' কোনদিন এরকম মন্তব্য-তর্কে জড়িয়ে পড়ে না। যদিচ, ট্রামের সুন্দরী তরুণীরা কেউই চেনা জানার মধ্যে নয়; তবু ভাবনা হল, বাড়ির অন্য কারও সূত্রে সেতো ওদের কাছে পরিচিত হতে পারে। সুতরাং, আর নয়—ইতি টেনে চুপ চাপ থাকাই শ্রেয়।
একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ওড়াল 'ত'। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে নির্বিরোধ উদাস তাকিয়ে থাকল। 'বু' ভাবলেন, ছেলেটি বোধ হয় বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে যুতসই কোন উত্তর খুঁজছে। অথবা, কঠিন কোন আক্রমণাত্মক প্রশ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বুঝতে পারলেন, তাঁর অনুমান ভুল। তাই আবার খোঁচালেন, চুপ করে গেলে যে—উত্তর খুঁজে পাচ্ছো না? তাহলে আমিই বলি। ভাল করে শুনে জেনে রাখো। দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে তার কারণ—মানুষের মন থেকে অতি দ্রুত আধ্যাত্মিক চেতনা উবে যাচ্ছে। সব্বাই বস্তুবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। কোয়ালিটি ছেড়ে কোয়ানটিটির দিকে ঝুঁকছে। কেননা, গণতন্ত্র যে। জনবল চাই সর্বাগ্রে।
'ত' তেমনি নির্বিকার। শুধুই চেন প্রথায় সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে যাচ্ছে। যেন কিছু শুনেও শুনছে না। ভাবল, কতক্ষণ আর একা একা বকবে। জবাব দিলেই সংঘর্ষ লড়াই। জবাব না দিলে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। এমনিতেই একসময় ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে।

‘বু’ কিন্তু কিছুতেই থামলেন না। বললেন, এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মূর্খ। তাদের দ্বারা পরোক্ষ পরিচালিত শাসনতন্ত্রের নাম কি হওয়া উচিত বলতো?
‘ত’ তেমনি নির্বাক। তাকালো না। নড়ল না। শুধুই সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে থাকল।
উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ‘বু’ বলে যেতে থাকলেন, কিছু জানো না দেখছি। নাম হওয়া উচিত— মূর্খতন্ত্র। গণতন্ত্রের মুখোশ পরে আসলে এখনো কিন্তু সেই রাজতন্ত্রই চলছে। একালের রাজারা রথ অথবা হাতির পরিবর্তে বিলিতি বিলাসবহুল গাড়িতে চড়েন। কান দিয়েই দেখেন। কারও ওপর হঠাৎ খুশি হলে মুক্তোহারের পরিবর্তে চাকরি দিয়ে দেন। অখুশি হলে প্রশাসন লেলিয়ে দিয়ে চূড়ান্ত নাজেহাল করেন। একালের রাজারাও কেউ যোগী বা ত্যাগী নয়—বুঝলে?
এই ‘জানো না’ অবজ্ঞা এবং ‘বুঝলে’ জিজ্ঞাসা কথা দুটি ‘ত’র মোটেই ভাল লাগল না। ভাবল, লোকটি কী অযাচিতভাবে ‘ত’র শিক্ষক হয়ে উঠতে চাইছেন। বোধহয় একটু বেশিই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। অতএব, ওঁকে আর বেশি বাড়তে না দিয়ে সোজাসুজি কথায় থামিয়ে দেয়া দরকার।
‘ত’ বলল, অতসব বুঝিনা। বুঝতেও চাইনা। বেশি বোঝাতেই যত অশান্তি। আমি সাতে পাঁচে নেই। খেটে খাই ষোল আনা তৃপ্তি পাই।
‘ত’ সঙ্গে আর যে কথাটি বলল না—তাহল, এবার আপনি ক্ষান্ত দিন। আর কচকচানি ভাল্লাগছে না।
অনুচ্চারিত কথাটা যে ‘ত’র শেষ কথাতেই লুকিয়ে আছে ‘বু’ তা বুঝতে পারলেন না। অথবা, হয়তো বুঝেও থামতে চাইছেন না।
‘ত’ ভাবল, বয়স্কদের এই এক দোষ। বড্ড বকবক করেন। অনেক ক্ষেত্রেই অকারণে এবং অপ্রয়োজনে। অল্প কথায় কোন কিছুই বোঝাতে জানেন না। বয়সে কনিষ্ঠ সকলকেই ছাত্র ভাবতে ভালবাসেন। তাদেরকে মূর্খ অথবা অনভিজ্ঞ—জ্ঞানে উপদেশ দিয়ে খুশি হন। ‘ত’র মনে হল, লোকটি নির্ঘাৎ স্কুল শিক্ষক অথবা উকিল ছিলেন। তা নাহলে এত বকতে পারেন!
‘বু’ বিরামবিহীন বকেই চলেছেন। ‘ত’র তরফ থেকে কোন প্রতিরোধ বা পাল্টা আক্রমণ না থাকায় উৎসাহটা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সিটের ওপর পা গুটিয়ে আয়েশ করে বসলেন। তারপর বললেন, ছোট্ট একটা ঘটনা বলছি শোন। মন দিয়ে ঘটনাটা শুনলেই দেশের বর্তমান অবস্থা জলের মতো সহজভাবে বুঝতে পারবে।
‘ত’ ট্রামের ভিতর সামনে পিছনে তাকিয়ে দেখল, সবাই নেমে গেছে। এখন অবশিষ্ট যাত্রী বলতে কেবলমাত্র ওরা দু’জন। অর্থাৎ দু’জনেরই নিশ্চিত মান্থলি টিকিট আছে। ‘ত’ এতক্ষণে কিছুটা সহজ হতে পারল, ঘটনাটা শোনার আগ্রহ দেখাল। ‘বু’র পাশ থেকে উঠে গিয়ে অন্য একটি সিটে বসে মুখোমুখি তাকিয়ে থাকল।
‘বু’ শ্রোতার আগ্রহ দেখে খুশি হলেন। বলে চললেন, গত বছর তীর্থে বেরিয়েছিলাম। অনেক তীর্থ ঘুরে সবশেষে হরিদ্বার পৌঁচেছি। হরিদ্বারে তখন সবে শীত এসেছে। কিন্তু, দু’দিন হঠাৎ অকাল-বৃষ্টিতে বেশ কনকনে শীত পড়েছে। তবু, সকাল সন্ধ্যায় রোজ দু’বেলা গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতাম। সন্ধ্যায় গঙ্গার স্রোতে হাজার হাজার ভাসন্ত প্রদীপ—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। শান্ত সুন্দর পরিবেশ। দু’চোখ জুড়িয়ে যায়। মনটা প্রশান্তিতে ভরে থাকে। ক্লান্তি অবসাদ হিংসা ঘৃণা—সব উবে গিয়ে দারুণ পবিত্র পবিত্র লাগে। হরিদ্বার গিয়েছো?
না।
যেও। খু-উ-ব ভাল লাগবে। যে কোন লোকেরই ভাল লাগার কথা।

'ত' দেখল, 'বু'-র ভাবে ডুব দিলে সেই দীর্ঘতর অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনায় আসল ঘটনাটা চাপা পড়ে যাবে। ঘটনাটা জানার কৌতূহলে বলল, কি যেন ঘটনার কথা বলবেন বলছিলেন।
'বু' বললেন, হ্যাঁ সেটাই বলছি শোন। গঙ্গার দু'ধারে পাকা বাঁধানো সুন্দর চাতাল। ইচ্ছে মতো বসো হাঁটো। মন চাইলে ঘুমিয়েও পড়তে পার। একদিন হাঁটতে হাঁটতে হর-কা-প্যারী ঘাটে জলের মধ্যবর্তী চাতালে এক জায়গায় দেখলাম ভীষণ ভিড়। অনেক লোকজন বৃত্তের মতো জড়ো হয়ে মাঝখানে কি যেন দেখছে এবং শুনছে। আমি কৌতূহলে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, ভিড়ের বৃত্তের মধ্যে একজন সাধু বসে আছেন। হাঁড় কাঁপানো শীতের মধ্যেও ওঁর সর্বশরীরে একটুকরো নেংটি ছাড়া বস্ত্র বলতে অন্য কোন কিছু নেই।
সাধুটির সুন্দর স্বাস্থ্য। লম্বা লম্বা কাঁচাপাকা চুল দাঁড়ি। গায়ে মাখানো ছাইভস্ম। কপালে বড় করে সিঁদুরের তিলক কাটা। পদ্মাসনে বসে আছেন। সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে বলে চলেছেন, তোরা তীর্থ করতে এসেছিস? কেন—পুণ্য অর্জনের জন্য? অনেক পরিশ্রম সময় এবং অর্থ ব্যয় করে এসেছিস। এসবের কোন দরকারই ছিল না। পাপ না করলেই তো পারিস—তাহ'লে পুণ্য অর্জনের জন্য এত কষ্ট করা দরকার হয় না। সংসারে থাকতে গেলে পাপ বাঁচিয়ে চলা খুব কঠিন কাজ, বুঝি। তোদেরকে সংসার ছাড়তে বলছি না। যখন এসেই পড়েছিস—এই পুণ্যক্ষেত্রে পরম পবিত্র মা গঙ্গার কাছে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে যা। আমার সঙ্গে সকলে এক সঙ্গে বল—মা, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, এবার সংসারে ফিরে গিয়ে আর লোভ হিংসা ঘৃণা দ্বন্দ্বে থাকব না। নিজস্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারীতে আকৃষ্ট হব না। মদ জুয়া বা অন্য কোন নেশা করবো না। ঘুষ নেব না। জাতপাত মানব না। গরিব দুঃখীকে ভালবাসব।
সাধুর সঙ্গে কেউ কণ্ঠ মেলাল না। সকলেই নিশ্চুপ শুনে গেল। সাধুটি বললেন, মনে মনে বললে হবে না। শব্দ উচ্চারণ করে বলতে হবে। প্রতিজ্ঞা করে ঘরে ফিরে যা—দেখবি, সংসার সুখ শান্তিতে ভরে যাবে। সংসারই পরম তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠবে। পুণ্যার্জনে কোথাও আর যেতে হবে না।
সাধুটি পুনর্বার একই প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে সমবেত সকলকে কণ্ঠ মেলাতে বললেন। কিন্তু আগেকার মতোই সকলেই নিশ্চুপ। ক্রমশ ভিড় কমতে থাকল। সাধুটি বিস্ময়ের সঙ্গে হালকা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোদের মধ্যে এমন দু'চারজন মানুষও নেই যারা এই প্রতিজ্ঞাটা এখানে দাঁড়িয়ে করতে পারে?
সাধুটি অনেক আশা নিয়ে তৃতীয়বার প্রতিজ্ঞামন্ত্রটি বলে গেলেন। কিন্তু একমাত্র ওঁর কণ্ঠস্বর ছাড়া কারও কোন সাড়া শব্দই পাওয়া গেল না। তাই হতাশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, এমন একজনও নেই?
'ত' বিস্ময়ের সঙ্গে জিগ্যেস করল, আপনি দেখলেন একজন লোকও করল না—প্রতিজ্ঞাটা?
'বু' বললেন, তবে আর বলছি কী। দেখলাম, একে একে সবাই চলে গেল। একা সাধুটি বসে রইলেন। অথচ আশ্চর্য দেখ—সাধু যা যা বর্জনের প্রতিজ্ঞা করতে বলেছিলেন সেগুলো সবইতো অশুভ। প্রতিজ্ঞাটা পালন করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপারও ছিল না।
'ত' মনে মনে হাসল। ভাবল, এবার কিন্তু আমার জয়। কিস্তিমাত্। পরক্ষণেই তরুণটির মনে ভীষণ দুঃখ হল। ভাবল, এই মুহূর্তে ট্রামের মধ্যে কেন যে তৃতীয় কোন যাত্রী নেই। সবাই চলে গেছে। থাকলে স্পষ্ট বুঝতে পারত দেশের জনগণকে জুতা মারতে গিয়ে বুড়ো লোকটি এবার নিজের গালেই মেরে ফেলেছেন।

আইন কথা বলে

দূর থেকে বাড়ির সামনে মানুষের জটলা দেখে ব্রজমাধব ভয় পেলেন। একরাশ আশঙ্কা বুকে ধরে এগিয়ে গেলেন। ভিড়ের মানুষ জনেরা সরে গিয়ে ঘরে ঢোকার পথ করে দিল।
ঘরে ঢুকেই দারুণ বিস্ময়, দু'জন পুলিশ! একজন আবার পেল্লাই গোঁফঅলা বন্দুকধারী।
আপনারা কেন? ব্রজমাধব জিগ্যেস্ করলেন।
ডেকেছেন তাই। বন্দুকধারী পুলিশটিই জবাব দিল।
কিন্তু কেন?
চোর ধরতে? পুলিশের আগে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করল বড় মেয়ে রমলা। হান্টারধারী পেটমোটা পুলিশের আড়ালের ছেলেটাকে হাত ধরে টেনে সামনে এনে বলল, তোমার টেবিল ঘড়িটা নিয়ে পালাচ্ছিল। আমি কুয়োতলায় গা ধুতে গিয়েছিলাম। শোভনাকে নিয়ে মা মনসাতলা থেকে ফিরে এসে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে।
ছেলেটাকে এক ঝলক দেখলেন ব্রজমাধব। দশ বারো বছর বয়স হবে বড় জোর। গরিব ঘরের দারিদ্র্য মালিন্য বিষণ্ণতায় ভরা চেহারা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে একটু আগেই সে কান্না থামিয়েছে। নির্ঘাৎ পুলিশ চড়থাপ্পর হান্টার চালিয়েছে।
পুলিশকে খবর দিয়েছে কে? ব্রজমাধব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।
পাড়ার পল্টুদা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসতে মা ওকে থানায় পাঠিয়েছিল।
এতটা বাড়াবাড়ি ব্রজমাধব অপছন্দ করলেন। পুরনো আমলের সামান্য একটা ঘড়ির জন্য এতটা ঠিক হয়নি। তখনকার দিনে বিশ পঁচিশ টাকায় খরিদ করা বোধহয়। নাবালক গরিব ছেলেটা হয়ত পেটের দায়েই সেটাকে হাতাতে চেয়েছিল, পারেনি। সামান্য লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, হয়নি ব্যস্। কিন্তু তারজন্য থানা পুলিশ! তাজ্জব ব্যাপার। হাজার রকমের বড় বড় ব্যাপারে ব্যস্ত ওদেরকে এভাবে হয়রান করার জন্য ব্রজমাধব সঙ্কোচ বোধ করলেন, আপনাদের অযথা এভাবে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি লজ্জিত দুঃখিত মার্জনা প্রার্থী।
এটাতো আমাদের ডিউটি, কষ্ট বলছেন কেন। বন্দুকধারী পুলিশটি সপ্রতিভ জবাব দিল।
তা বটে। খুন ডাকাতি ধর্ষণ ফেলে এরকম পেটিকেসে আপনাদেরকে ডিসটার্ব করা উচিত হয়নি। ব্রজমাধব হাত জোড় করে মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, দয়া করে আপনারা এবার আসতে পারেন।
ধন্যবাদ। ছেলেটির হাত ধরে হান্টারধারী পুলিশটি কর্কশ কণ্ঠে বলল, চল শালা মামা বাড়ি দেখতে যাবি।
ছেড়েই দিন না ওকে। ব্রজমাধব দয়ামায়া দেখাতে গেলেন, বাচ্চা বয়স তো। তাই ন্যায় অন্যায় এখনও ঠিক বুঝতে শেখেনি। তাছাড়া ঠিক চোরও হয়ে ওঠেনি। তা নাহলে ধরা পড়তে যাবে কেন। ক্ষমা ঘেন্না করে রেহাই দিয়ে দিন।
চুরি করার মনটাতো আছে। বন্দুকধারী তত্ত্বকথা আওড়াল, আচ্ছা রকম রগড়ে কড়কে পালিশ করে ওর চোরা মনের বীজটাকে উপড়ে ফেলা দরকার। নইলে ভবিষ্যতে দুঁদে চোর হবে যে।
ওর বিরুদ্ধে আমাদের যদি কোন অভিযোগ না থাকে? ব্রজমাধব আইনের প্যাঁচ কষলেন, তাহলে ছেড়ে দিতে বাধা কীসের!

এখন আর তা সম্ভব না। হান্টারধারী ক্ষুব্ধ হল্। পাল্টা আইনের পয়জার ছুঁড়ে দিল, আপনারা ডেকে এনেছেন। এসে বামাল চোরকে যখন হাতে পেয়েছি তখন কর্তব্যে অবহেলা করা যায় না। দয়া করে আইনমতে চলতে দিন। প্লীজ বাধা দেবেন না।
এরপর আর কোন কথা বলার মুখ খুঁজে পেলেন না ব্রজমাধব। বউ বিমলার ওপর প্রচন্ড রাগ হল। কিন্তু বিমলাকে গালমন্দ করতে যাওয়া মানেই তো গাল বাড়িয়ে থাপ্পর খাওয়া। এ বাড়ির গার্জেন তো বিমলাই।
আপনাকেও একবার থানায় যেতে হবে যে। পুলিশ-যুগল কোরাস বলল।
বলে কি! ব্রজমাধব ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন। ছোটবেলায় মা পুলিশ ডাকার ভয় দেখিয়ে ঘুম পারাতেন। সেই থেকে আজ অব্দি পুলিশ—ভীতি বহাল আছে। বরফ চাপা মাছের মতো চোখ মুখ করে বললেন, খামোকা আমাকে আবার থানায় টানতে চাইছেন কেন?
টানা উচিত ছিল আপনার ওয়াইফ আর পল্টুবাবুকে। কারণ ব্যাখ্যা করে বন্দুকধারী বলল, বামাল চোর ধরেছেন আপনার মিসেস। তিনিই এক নম্বর সাক্ষী। পল্টুবাবু খবর দিয়েছেন। তাকেও সাক্ষী হিসাবে দরকার ছিল। কিন্তু তিনি তো থানায় খবর দিয়েই হাওয়া।
লেডিসকে রিলিফ দেয়ার জন্যই আপনার যাওয়া উচিত। হান্টারধারী বলল।
ব্রজমাধব মনে মনে ভাবলেন, কীসের আবার রিলিফ! মেয়েলি বুদ্ধির পাকামির জন্য বিমলারই যাওয়া উচিত। থানায় গিয়ে বুঝুক একবার, কত ধানে কত চাল। ঘরে বসে স্বামীর ওপর যত হম্বিতম্বি খবরদারি। সেজন্য ওর একটু সাজা হওয়া উচিত।
ভাবলে কি হবে। সেটা বলার মতো যে সাহস দরকার বিমলা কি আর তার একবিন্দু অস্তিত্ব রেখেছে?
প্লীজ একটু ওয়েট করবেন? ভয়ে ম্লান কাচুমাচু ব্রজমাধব মোলায়েম অনুরোধ জানালেন, ট্রামবাস ট্রেন ঠেঙিয়ে সবে ফিরেছি। ঘামে ভিজে জামা কাপড় একশা হয়ে আছে। যদি একটু ফ্রেস হয়ে আসতে সময় দেন তো—
বসুন না একটু চা খেয়ে যাবেন। বিমলা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল, সারাদিনের পর বাবা ঘরে ফিরেছেন। আপনারা চা খেলে বাবাকে খালিমুখে যেতে হয় না।
পুলিশ দু'জন আপত্তি করল না। আবেদন মঞ্জুর করে খুশি মনে তক্তপোশের ওপর বসল।
ভয় পেয়ে ব্রজমাধব বাথরুম থেকে একবার ছোটঘরেও গেলেন। পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে এসে ছেলে ননীমাধবকে দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।
একালের ছেলেদের মতো নাহলেও ননী বেশ চালাক চতুর। পুলিশ দু'জনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়ে বন্ধুর মতো চুটিয়ে গল্প করছিল। সবাই মিলে আয়েস করে চা বিস্কুট খাচ্ছিল।
আপনি ব্যস্ত হবেন না স্যার। ব্রজমাধবকে উদ্দেশ করে হান্টারধারী সহানুভূতি জানাল, খেটেখুটে এসে ক্লান্ত আপনি বরং বিশ্রাম নিন। ননীবাবু গেলেই চলবে।
ফ্যাসাদ থেকে ছাড় পেয়ে ব্রজমাধব যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু ওরা চলে যাবার মুখে ছেলেটার হাত থেকে ঘড়িটা নিতে গিয়ে বাধা পেলেন।
ওটা এখন পাবেন না। বন্দুকধারী হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, ওর হাতেই থাক।
কেন? ব্রজমাধব চোখ মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।
ঘড়িটা আপাতত পুলিশ কাস্টোডিতেই থাকবে। পরে ফেরত পাবেন।
ওরা চলে যেতে পাড়ার চিন্তামণির নাতি নান্টু বলল, ছেলেটাকে আমি চিনতে পেরেছি দাদু। ওর বাবা বাজারে চাল বিক্রি করে। বাবার সঙ্গে ওকেও বসতে দেখেছি।

আহা বেচারা। ব্রজমাধবের দরদ উথলে উঠল, ওকে হয়ত হাজতে আটকে রাখবে। বাপ মা জানতেও পারবে না। তুই একটা খবর দিতে পারবি ওদের বাড়িতে?
পারব, বলে নান্টু চলে গেল।
ননীকে খালি হাতে ফিরতে দেখে ব্রজমাধব জিগ্যেস করলেন, ঘড়িটা কবে ফেরত দেবে বলেছে কিছু?
তাতো কিছু বলল না। আমার কাছ থেকে ডায়েরি লিখে নিয়ে চলে আসতে বলল।
ক'দিন বাদে ব্রজমাধব থানায় হাজির হয়ে ঘড়িটা ফেরত চাইতে বড়বাবু অবাক হলেন। যেন অন্যায় কোন আব্দার শুনছে এমনভাব করে বললেন, ঘড়ি ফেরত চাইলেই হল?
এতে অবাক হওয়ার কি আছে? আমার ঘড়ি আমি ফেরত চাইতে পারি না?
না, পারেন না। কেসটা তো ওই ঘড়ি নিয়েই। ওটা এখন রেকর্ডেড। হাতছাড়া করলে কেস চলবে কেমন করে। আইন বলে কথা।
বেশতো, আমি সইসাবুদ করে নিয়ে যাচ্ছি। লিখিত কমিটমেণ্ট থাকবে, প্রয়োজনে ডাকলেই ঘড়িটা নিয়ে হাজির হব।
তা হয় না। আইন বলে কথা। ওটাকে হাতছাড়া করা অসম্ভব।
তাহলে ঘড়িটা এখন পাওয়া যাবে না? ব্রজমাধব একটু রূঢ় হলেন, ইট্স এ মোস্ট এসেনসিয়াল। এ্যালার্ম আছে যে। বড়ছেলে ফার্স্ট ট্রেন ধরে কারখানায় যায়। ছোট মেয়ে মর্নিং কলেজের ছাত্রী। ছোট ছেলের কাছে খুব ভোরে দু'জন ছাত্র পড়তে আসে। আমি মর্নিং ওয়াকে বেরোই। আমার স্ত্রীকেও ঘড়ি ধরে ভোর রাত্রে উনান জ্বালাতে হয়। হোল ফ্যামিলি ডিসটার্ব হবে যে।
তাতো বুঝলাম। নাকে নস্যি গুঁজে বড়বাবু বললেন, কিন্তু আইন বলে কথা। কেসটার যতদিন ফয়সালা না-হচ্ছে ওটাকে ফেরত দেয়ার ক্ষমতা হাতে নেই।
কবে নাগাদ ফয়সালা হবে বলে মনে করছেন?
তা বলতে পারব না। আইন বলে কথা। এরকম হাজারা পেটি কেস ঝুলে আছে। সিরিয়ালি আপনার কেসের টার্ম আসবে।
তবু, একটা কিছু আইডিয়াতো দিতে পারেন? ব্রজমাধব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।
অত গরম দেখাচ্ছেন কাকে? বড়বাবু টেবিল চাপড়ে হুংকার দিলেন, আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন যে থানায় এসেছেন।
আই এ্যাম স্যরি। ভয়ে চুপসে গিয়ে ব্রজমাধব কপালের ঘাম মুছলেন।
আপনার প্রব্লেমটা বুঝতে পারছি ব্রজবাবু। বড়বাবু ফস্ করে মাচিস জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে বললেন, বাট আই অ্যাম হেলপ্‌লেস। অনুমানে কি বলব বলুন? আইন বলে কথা। আমাদের থানা ব্যারাকপুর কোর্টের আন্ডারে। কেসটা ওখানে ফরোয়ার্ড হয়ে যাবে। ধরুন কমসে কম তিন মাস পরে একটা কিছু আইডিয়া দেয়া যেতে পারে।
ব্রজমাধবের চোখ কপালে উঠল। বিস্ময়ের যেন আর কোনও শেষ নেই। পাঁচ স্টেশন পেরিয়ে ব্যারাকপুর। আজ পর্যন্ত কোনদিন কোর্টে যাওয়া দরকার হয়নি। পুরনো আমলের বিশ পঁচিশ টাকার ঘড়ির জন্য শেষ পর্যন্ত কোর্টে যেতে হবে কিনা কে জানে। থানা পুলিশের মতো কোর্টকাছারি সম্পর্কেও ব্রজমাধবের দারুণ ভীতি আছে। তাই আশঙ্কিত হয়ে জিগ্যেস করেই বসলেন, কোর্টেও হাজির টাজির দরকার হবে নাকি?

অফকোর্স। সিগারেটের টুকরোটা বুট জুতোয় পিষে বড়বাবু বললেন, আইন বলে কথা। আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে এমন একটা কাঁচা প্রশ্ন করছেন ব্রজবাবু।
ব্রজমাধব লজ্জিত হলেন। তার চেয়েও বেশি বিব্রত বোধ করলেন। মনে মনে বিমলার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে কিছুটা আরাম পাবার চেষ্টা করলেন। তারপর নিরাশ হয়ে উঠি উঠি করে বললেন, তাহলে তিনমাসের আগে ঘড়িটা ফেরত পাওয়া অসম্ভব বলছেন?
তিনমাসের আগেতো কোনমতেই না। মাথায় টুপি চড়িয়ে বড়বাবু বললেন, আইন বলে কথা। সিরিয়ালের হেরফের হলে একবছরও লেগে যেতে পারে।
এত কিছু ঝক্কি ঝামেলা পোষাবে না। ব্রজমাধব রেহাই চেয়ে বললেন, আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি আমার কোন দাবি নেই।
সেটা ডায়েরি হওয়ার আগে বলা উচিত ছিল। বড়বাবু তিরস্কার করে কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপরে সাজেশান দিলেন, আইন বলে কথা। আপনি বরং একজন ভাল উকিল ধরুন। তিনি আপনার হয়ে কোর্টে এ্যাপিল করবেন। ভাল হাকিম হলে ঘড়িটা আপনার কাস্টোডিতে রাখার অনুমতি দিলেও দিতে পারেন।
বিষণ্ণ বিধ্বস্ত ব্রজমাধব থানা থেকে রাস্তায় নেমে এলেন। মাথায় একরাশ চিন্তাভাবনা। উদ্ভ্রান্তের মতো পথ চলতে হঠাৎই মনে হল, সেই ছেলেটার হাল গতি কি হল তাতো জিজ্ঞাসা করা হল না। আজকাল তো খবরের কাগজে আকছার থানার লক আপে পিটুনির চোটে আসামি পঙ্গু হওয়ার খবর থাকে। অনেক আসামি বাথরুম থেকে ঝাঁপ মেরে পালাতে গিয়ে মরে। কেউ কেউ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যাও করে। আরও কত কী যে।
বেচারা কচি কাঁচা গরিব ছেলেটার বেলায় তেমন কিছু যেন না ঘটে যায়। ব্রজমাধব মনে মনে ওর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, ঘড়িটা ছেলেটার হাতে গুঁজে দিয়ে বিমলা বকেঝকে পাঠিয়ে দিলেই পারত। সেটা বরং একটা মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত।
মনমরা ক্লান্ত ব্রজমাধব বাজারে এক টুকরো পলিথিনের চাদরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিশ ত্রিশ কেজির মতো রেশনের চাল গম নিয়ে বসে আছে ছেলেটা। চোখে চোখ পড়তে ছেলেটা লজ্জা ভয় সঙ্কোচে মাথা হেঁট করল। ব্রজমাধব বললেন, হ্যাঁরে তুই না সেদিন—
মাপ কইর‍্যা দ্যান বাবু। ছেলেটা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমি কিন্তু সত্যই চুর না। মা আপনাগো বাড়িতে ঝিয়ের কাম করতে যাইত। এ্যাখুন আন্ধার থাইক্‌তে টেরেন ধইর‍্যা কইল্‌কাতায় বাবুদের বাড়ি কামে যায়। তাই ঘন্টিয়ালা ঘড়িটা কামে আইস্‌ত ভাইব্‌বাই দুযটা কইর‍্যা ফ্যালছি।
এরপর ছেলেটা দু'কান ধরে মা কালীর দিব্যি দিয়ে বলল, বাবারে আর কাঁন্দাবেন না বাবু। কথা দিত্যাছি, আর কুনুদিন চুরি করুম না।
আমি তোর খোঁজ নিতে এসেছি। আলতো হেসে ব্রজমাধব বললেন, থানায় তোকে অত্যাচার করেনি তো? ছাড়া পেলি কেমন করে?
সি আর কইবেন না বাবু। ছেলেটা থানার বড়বাবুর মুদ্রাদোয নকল করে বলল, আইন বইল্যা কতা। খপর পাইয়্যা বাপে গিয়ে কাঁন্দে আর কাঁন্দে। বিলাপ কইর‍্যা থানার জনে জনে পায়ে ধইর‍্যা মাপ চায়। কিন্তু বাবুরা কুনো মতেই নরম হইবেন না। শ্যাযে কীসে যে নরম হইল কইতে পারুম না। মানা আছে।
শুনে ব্রজমাধব হতভম্ব। ভাবনায় পড়লেন, বাদী বিবাদী উভয়পক্ষই যদি নাকাল নাজেহাল ক্ষতিগ্রস্ত, তাহলে লাভটা হল কার? আইন বলে কথা। কিন্তু, সেই আইন যে কার হয়ে কোন পথে কি কথা বলে, কে জানে।

ছিনতাই

ক'দিন ধারাবাহিক বৃষ্টির পর আজ ঝলমলে সোনালি রোদ্দুর উঠেছে। ঝুল বারান্দায় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে সূর্যকান্ত আশ্চর্য এক সুখানুভূতিতে বিভোর। সুমুখপানে জলময় বিশাল জলাভূমিতে এবার এখনও একটাও সাদা বক আসেনি। অথচ ফি বছর বর্ষায় অল্প জল জমতেই ওরা এসে থাকে। এখন ভাদ্র মাস চলছে। ভরাট জলাভূমিতে কচুরিপানা শাপলা কলমি হেলঞ্চা ইত্যাদিতে সবুজের সমারোহ। স্বচ্ছ নীল আকাশে ভাসছে সাদা মেঘ। দূরের ঝোপজঙ্গলে কাশফুল দোল খাচ্ছে।

সেই ছোট্টবেলা থেকেই এরকম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সূর্যকান্তর মনে পূজার বার্তা বয়ে আনে। আজ এই বয়সেও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। হঠাৎই মনে হল, পূজার তো আর মাত্র এক মাস বাকি। ওরাতো দেড় মাস আগেই এসে থাকে। নতুন পূজা কমিটির সর্বসম্মত প্যানেলের কাগজখানা নিয়মরক্ষায় এগিয়ে দিয়ে বলে, পাড়ার সকলে সভাপতি হিসেবে এবছরও আপনাকেই চাইছে। আপত্তি না থাকলে সই করে দিন।

সূর্যকান্তকে নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসে। পঁচিশ বছর আগেকার বয়সে ফিরে যায়। সুমুখে দাঁড়িয়ে কৈশোর-উত্তীর্ণ পাড়ার একদল উৎসাহী যুবক। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলে, এই তল্লাটে আজও কোন দুর্গাপূজা হয় না। পূজার স্বাদ পেতে হলে ছোট বড় সবাইকে সেই দেড় মাইল দূরে জনসন নগরে যেতে হয়। আমরা তাই এবার বারোয়ারি পূজা করব ঠিক করেছি। আপনাকে সভাপতি হিসেবে পেতে চাই।

সেকি! অবাক সূর্যকান্ত বলে, ওসব পদে তো বিস্তর টাকাকড়িঅলা নয়ত বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে বসানো হয়। আজকাল অবশ্য স্যুভেনিয়রের জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপন যোগাড়ের যোগ্যতাঅলা হলেও চলে। আমিতো কোনটাতেই নেই। তাছাড়া আজন্ম রুগ্ন ঘরকুনো আমি গা গতরে খেটে দিয়েও কোন সাহায্যে আসব না। তবু আমাকে চাইছ কোন আশাতে?

শ্রদ্ধা আর ভালবাসাতে। দলের ভেতর থেকে একজন বলে।

অপরজন ব্যাখ্যা করে, আমরা চাইছি গড়পড়তা আর দশটা পূজার চাইতে আলাদা কিছু করে দেখাতে। আমাদের নয়নাপাড়ায় অঢেল অর্থকড়ি দিয়ে সাহায্য করার সামর্থ যে ক'জনের আছে সকলেই তো বদনামী ব্যক্তি।

তৃতীয়জন সূর্যকান্তকে পছন্দের কারণ বলে, আপনি ভাল ছবি আঁকেন আবৃত্তি করেন। রাজনীতির দলাদলিতে থাকেন না। আপনার মতো আচার আচরণের রুচিশীল ব্যক্তি আমাদের পূজা কমিটির সভাপতি হলে আমাদেরও ইজ্জত বাড়বে।

সূর্যকান্ত মুগ্ধ অভিভূত। ওদের বিনম্র আবেদনের দুর্লভ সম্মান ফেরানো সম্ভব কখনও?

সেই থেকে সময়ান্তরে ছাত্রধারার মতো উদ্যোক্তাদের এক একটি দল পর্ণে পরিণত হয়ে দূরে সরে গেছে। এই দীর্ঘকালে বদলে গেছে অনেক কিছুই। ছবি আঁকার জগতে সূর্যকান্ত ক্রমশ প্রখ্যাত শিল্পী হয়েছে। একের পর এক আবৃত্তির ক্যাসেট বেরিয়েছে। চুলে পাক ধরেছে, দাঁত নড়েছে। কেরানি হয়েও অবসর নেয়ার আগে বাংলা টাইপের শিল্পীসুলভ ছোটখাটো এই দোতলা বাড়িটা তৈরি করতে পেরেছে।

কিন্তু পূজার আড়ম্বর বাড়লেও নয়নাপাড়ার বারোয়ারিতে সাবেকি চরিত্র পাল্টায়নি এতটুকুও। এখনও ফি বছর সেই ডাকের সাজের প্রতিমা হয়। এখনও বর্জিত, লাউড স্পীকারের হিন্দী গান আর হালে আমদানি ভিডিওতে চটুল সিনেমা প্রদর্শন। চালু আছে, পূজার তিন দিন মন্ডপে পাড়ার সকলের সারিবদ্ধ বসা ভোজন। সন্ধ্যায় আরতি প্রতিযোগিতা। দরিদ্রদের কাপড় কম্বল বিতরণ। বিসর্জন অন্তে বিজয়া সম্মিলন।
এমন একটি ভিন্নস্বাদের পূজার পরিচালক কমিটির চিরস্থায়ী সভাপতির অনুভূতিটাই অন্যরকম। গর্বসুখে বিভোর সূর্যকান্ত ভাবনায় পড়ে যায়, এবার এখনও ওরা এলো না কেন?

শরতের সোনাঝরা রোদ্দুরের আঁচে মণিমালার মনেও পূজার দোলা লাগে। এই বয়সে পূজায় কিছু পাওয়াতে যত না তার চাইতে ঢের বেশি আনন্দ দশ জনকে কম বেশি কিছু অন্তত দেওয়ার মধ্যে। পুত্রকন্যা সূত্রে আপন প্রিয়জনদের সংখ্যা বেড়েছে বিস্তর। এতজনের কেনাকাটা কি আর দু'একদিনে সম্ভব? মণিমালা আজ প্রথম কিস্তির কেনাকাটায় বেরিয়েছে।
আঁধারি বারান্দায় বসে সুমুখের জলাধারে ঝিকমিক জ্যোৎস্না দেখছে সূর্যকান্ত। বাতাসে ভাসছে শিউলি-সুবাস। জোনাকি জ্বলছে। ঝিঁঝি ব্যাঙ ডাকছে। সূর্যকান্তর মনে তির তির প্রবাহ শূন্যতা, এবার এখনও সাদা বকগুলি এলো নাতো!
রাত বাড়ে অথচ মণিমালা এখনও ফিরল না কেন? বয়স তো কম হয়নি মণিমালারও। সেই সঙ্গে আছে বাত আর ঊর্ধ্বগতির রক্তচাপ। সড়কে খানাখন্দ। ট্রেন বাস এ্যাক্সিডেন্ট। হঠাৎ পথ অবরোধ। খুনজখম ভাঙচুর। সমাজবিরোধীদের অবাধ দাপট। হাজার রকমের অশুভ আশঙ্কায় সূর্যকান্তরও রক্তচাপ বাড়ে। উন্মুখ পথ চেয়ে থেকে প্রতিবেশি পরিতোষকে আসতে দেখে।
পরিতোষের বাড়িতে ফোন আছে। তবে কী মণিমালার কোন বার্তা নিয়ে আসছে?
সুমুখ দরজায় এসে দাঁড়ায় সূর্যকান্ত।
পরিতোষ অন্যকথা শোনায়, খবরটা শুনেছেন? পঁচিশ বছর পূর্তি পূজা কমিটিতে এবার আপনি আমি—পুরনো সকলেই বাদ পড়েছি। আপনার জায়গায় কাকে সভাপতি করা হয়েছে জানেন? দু'নম্বরী ব্যবসায় হালে আঙুল ফুলে কলাগাছ নৃপকৃষ্ণ দাস ওরফে ন্যাপ্‌লাকে। ওর টাকায় কাঠের গুঁড়োর প্রতিমা হবে এবার। সম্পাদক করা হয়েছে সরকারি দলের উঠতি নেতা গোপাল হালদার ওরফে গোপ্‌লাকে। সে নাকি তাজমহলের আদলে প্যান্ডেল তৈরির সব খরচ দেবে। দেখে নেবেন, ন্যাপ্‌লা গোপ্‌লারা এবার এতদিনের পূজার সব ঐতিহ্যটাই মাটিতে মিশিয়ে দেবে।
সূর্যকান্ত দীর্ঘশ্বাস গোপন রাখে। ঠোঁটে কপট হাসি ফুটিয়ে বলে, ভালই তো হল। একঘেয়েমি ছাড়িয়ে বৈচিত্র্যে জমজমাটও দরকার।
পরিতোষ হতাশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়। বৃথা আর কথা না বাড়িয়ে চলে যায়।
মণিমালা বিষণ্নমুখে ফিরে আসে। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে বলে, আমার অমন সুন্দর বিছে হারটা ট্রেন থেকে নামতেই কে যেন ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। থানাপুলিশ করে ফিরতে তাই এত দেরি হল।
এমন দুঃসংবাদ শুনেও সূর্যকান্তর মনে কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। মণিমালাকে সান্ত্বনা দেয়া দরকার জেনেও নির্বিকার থাকে। মনে মনে ভাবে, এতবছর ধরে প্রাপ্তিযোগ সম্মানের ফুলমালার মূল্য তো মণিমালার সোনার মালার চাইতে কম কিছু ছিল না। সেটিওতো স্রেফ টাকার জোরে ছিনতাই হয়ে গেছে। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে।

লজ্জা

শ্রীমতী কল্যাণী চৌধুরী
সমীপে
মহাশয়া, কলকাতা থেকে বাংলায় প্রকাশিত দৈনিক খবরের কাগজটি এখানে আসার কথা নয়, তবু অপ্রত্যাশিতভাবে আমার হাতে এসেছে। তাইতো 'হারান প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' কলমে বিজ্ঞাপিত চিঠিটি নজরে পড়েছে। চিঠির শেষাংশে আমাকে ঘরে ফিরে যাওয়ার আকুতি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে অবশ্য একমাত্র সন্তান এই অকৃত্রিম চৌধুরীর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয়নি। তবু, এই চিঠি লেখা কেন? কারণ, আপনি রীতিমতো অবাক করে লিখেছেন, টাকার দরকার হলে জানাস। লজ্জা পাস না।
আমার প্রশ্ন, আপনার কি ধারণা যে, নিরুদ্দেশ হওয়ার পর আমার ভেতর লজ্জা নামক অনুভূতি আবির্ভূত হয়েছে? সেই ছোট্টবেলা থেকেই আপনি এবং আপনার স্বামী শ্রী সুখময় চৌধুরী আপনাদের ইচ্ছা বর্হিভূত কিছু করতে দেখলেই শাসনকালে আমাকে 'বেলজ্জ' বলতে অভ্যস্ত। সেই কারণে আক্ষেপ করতেন, কবে যে তোর লজ্জা হবে। আমার আচার আচরণ আপনাদের মনের মতো ছিল না। সেজন্য দু'জনের বিস্তর রাগ ক্ষোভ অসন্তোষ ছিল। মারধর, বকাবকি ছাড়াও নানান প্রক্রিয়ায় আমাকে শাসন করা হতো। তাতেও কোনও পরিবর্তন দেখতে না পেয়ে হতাশায় বলতে শোনা যেত, বংশের কলঙ্ক তোকে সন্তান হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।
আমার নাকি গন্ডারের চামড়া। আপনারা দু'জনে অহরহ শোনাতেন, জীবনে তুই কিচ্ছুটি করতে পারবি না। আচ্ছা বলুন তো, জীবনে কিছু করতে পারা বলতে আপনারা কি বোঝাতে চাইতেন? অগাধ টাকাকড়ি গাড়ি বাড়ি বিষয় আশয়ের মালিক হওয়া? যা কিনা মধ্যবিত্ত সুখময় চৌধুরীর ছিল না। অথচ, মেকি শ্রমিক কৃষক দরদি দৌলতে ও দেশসেবার মুখোশ পরে সামান্য ক'বছরে হতে পেরেছেন।
সত্যি বলছি, আমি কোনও দিনই বিপুল বিলাস ধন সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার স্বপ্ন দেখিনি। আর দশজন রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী-পুত্রের মতো অনৈতিক সুযোগ নিয়ে কোটিপতিও হতে চাইনি। তাই স্বামীর প্রতি আপনার পূর্ণ সমর্থন থাকলেও আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। তাই আপনারা আমাকে বলতেন, অপদার্থ। অথচ আমি কি দেখতাম শুনতাম? আপনারা হামেশা দু'জনে খিটিমিটি ঝগড়া করতেন। রাগের মাথায় একে অপরকে অপদার্থ বলতেন। কচি বয়সে গুরুজন আপনাদের দু'জনের কথাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হতো। জেনেছিলাম, আপনাদের বিয়েটা ছিল ভালবাসার পরিণতি। বয়সের ফারাক না থাকায় দু'জনে বন্ধুর মতো ছিলেন। দুই বন্ধুর ঝগড়ার সময় শুনেছিলাম, আমি নাকি আপনার গর্ভে এসেছিলাম বিয়ের আগেই। রাগের মাথায় সুখময় দু'একবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আমি আদৌ ওঁর সন্তান কিনা। আপনিও ওঁর চরিত্র-দোষ নিয়ে কটু জবাব দিয়েছিলেন। বয়স বাড়তে আমি অনেক সময় রেফারির ভূমিকায় তিক্ততা থামিয়ে শান্তি আনার চেষ্টা করেছি। সফল হইনি। কারণ, আপনারা কেউই আমাকে নিরপেক্ষ হিসেবে চাননি। নানা প্রলোভনে আমাকে নিজের সমর্থক হিসেবে পেতে উৎসাহী ছিলেন। সোজা বাংলায় আমাকে ঘুষ দিয়ে হাত করতে চেয়েছেন।
সুখময় তো ওই পদ্ধতিতেই দ্রুত ওপরে ওঠার সিঁড়ি-পথ বেছে নিয়েছিলেন। বারো হাজার কর্মীর কারখানার মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি তিনি তখন। পঁচাত্তর দফা দাবিতে রেকর্ড সৃষ্টিকারী একশ' একাশি দিনের ধর্মঘট চলছিল। ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আপোষহীন সংগ্রামকালে অনেকের হাতের সঞ্চয় শূন্য হয়ে গেছে। ঘটি বাটি গহনা বিক্রিবাট্টা শেষ। অনেক ঘরের মেয়েদের ইজ্জত পর্যন্ত খোয়া গেলেও কেউ চুরি চামারি করেনি। কিন্তু বেইমানি করেছিলেন সুখময়। সেই

থেকে ওঁর ঠাঁট বাট গাড়ি, বাড়ির স্বপ্ন সাফল্য শুরু। হোক না কেন সভাপতি পদ হাতছাড়া। হলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তারপর বিধানসভা নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হলেন। এমন একটি দপ্তর পেলেন যেটিতে লক্ষ লক্ষ টাকা কামানোর সুযোগ। সুযোগ হাতছাড়া করার মধ্যে সততা থাকলেও তিনি তাকে মূর্খামি মনে করেন। সেই পথে হাঁটেননি তিনি। হোক না কেন চলতি পথে অথবা চায়ের দোকানে ওঁর সম্পর্কে নানান কটু মন্তব্য। খবরের কাগজে তীব্র বিরূপ সমালোচনা। ভোটারদের অসন্তোষ। পরোয়া কিসের, পেশীবল অর্থবল আর বিজ্ঞাপনের দৌলতে নির্বাচনে নিশ্চিত জয় যার হাতের মুঠোয়।

অপ্রিয় হয়েও পর পর তিনবার রেকর্ড ভোট পেয়ে জিতলেন সুখময়। মন্ত্রীও হলেন। কিন্তু কোনও অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র স্যুভেনিয়র অথবা সভা সম্মেলনের প্রচারপত্রে মন্ত্রী পদ মর্যাদায় সুখময়ের নামের আগে 'মাননীয়' মুদ্রিত হলে কি হবে? জনগণমনে ওঁর পরিচিতি ভ্রষ্টাচারী, খুনি, ঘুষখোর আর মাফিয়া-বন্ধু হিসেবে। কথায় আছে, রাজা কান দিয়ে দেখতে পান। কিন্তু, বিরুদ্ধ দলের সভার লাউড স্পীকারের শব্দবাক্য কী ওঁর কানে ঢুকতো না! নজরে পড়ত না, ওঁর কেচ্ছা কেলেঙ্কারি নিয়ে পত্র পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি?

সেই সময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করতাম, আপনাদের দু'জনের মধ্যে বিন্দুমাত্র তিক্ততা ছিল না। আসলে অঢেল বিলাসিতার বিনিময়ে সুখময় আপনাকে বাগে এনেছিলেন। আপনি হয়ে উঠেছিলেন ওঁর অন্ধ সমর্থক ও প্রেরণাদাত্রী। দলের অন্য যেকোনও সৎ নিষ্ঠাবান, কর্মীর চাইতেও বেশি নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওঁর ক্রিয়াকর্মে অন্যতম পরামর্শদাত্রীও বটে। আপনার ইচ্ছাতেই আমাকে পাঠানো হয়েছিল শৈল শহরে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করতে। বিস্তর টাকা আর ছাত্রের মেধা না থাকলে সেখানে পড়ার সুযোগ হয় না। মেধা থাকলেও আমি পড়াশুনোয় অনীহাতে কোনকালেই ভাল রেজাল্ট করিনি। তবু মন্ত্রী কোটায় সেখানে পড়তে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগত। সম্ভব ছিল না, একজন মন্ত্রীর আয়ের টাকায় সেখানে থাকা ও পড়াশুনো করার। সেজন্য নানারকম মন্তব্য শুনতে হত আমাকে।

তারও পর আছে। মানবাধিকার কমিশনে সুখময়ের বিরুদ্ধে জনগণের অর্থ হাতানোর অভিযোগ জমা পড়ল। কোটি কোটি টাকা তছরুপের মামলা দায়ের হল। কোর্ট নির্দেশ দিল, গোয়েন্দা তদন্তের। সুখময় বললেন, আমি নির্দোষী। এসব কিছু রাজনৈতিক চক্রান্ত। যথা সময়ে সব কিছু প্রমাণ হবে। তদন্তকারী দল শুধু আমাদের বাড়িতেই নয়, তিন মামা বাড়িতেও হানা দিল। আবিষ্কার করল, শৈল শিখর আর সমুদ্র তীরে চাকর চাকরানির নামে আরও দু'টি বাড়ির।

সেইসঙ্গে হিসাব বহির্ভূত প্রচুর টাকা আর মহামূল্য রত্নালঙ্কার। আরও কত কীযে!

পরমবন্ধু মুখ্যমন্ত্রী বিপাকে পড়ে সুখময়কে মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দিতে অনুরোধ জানালেন। সুখময় বললেন, কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হলে তবেই সেটা সম্ভব। এখনও বলছি, আমি নির্দোষী।

অন্যান্য মন্ত্রীরা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, আপনার চেয়ার খালিই থাকবে। নির্দোষী প্রমাণিত হয়ে ফিরে এসে আপনিই আবার এই চেয়ারে বসবেন। সুখময় সেই প্রস্তাব না মানার কারণ দর্শালেন, বোকার মতো ফাঁদে পা দেব কেন আমি? এখনও তো দোষী প্রমাণিত হইনি।

দলের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বললেন, তাতে জনমানসে আপনার ইমেজ বাড়বে।

সুখময় উত্তপ্ত হলেন, যে যার নিজেকে নিয়ে ভাবুন। সবাইকেই আমার জানা আছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও শেষমেশ সুখময়কে মন্ত্রীত্ব ছাড়তে হলো। চার্জশিট ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হল। আর আপনি? জনৈক মুখ্যমন্ত্রীর পত্নীর মতো সুখময়ের মন্ত্রীপদটি গ্রহণ করলেন না কেন? জানিনা, কোন উদ্দেশে আমাকে বাড়িতে ফিরতে বলছেন। আমি আর কোনও দিনই আপনাদের কাছে ফিরে যাব না। কেন জানেন? যাঁদের সবচাইতে বেশি লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল তাঁদের বিন্দুমাত্র লজ্জা না হলেও এখন এতকাল পরে আমার অন্তত হচ্ছে। ভীষণভাবে।

ইতি-অকৃত্রিম।

অসম্ভব। হতাশ বিভূতিভূষণ ভাবলেন, শুধুমাত্র নিঃস্বার্থ সমাজসেবা আর অকৃত্রিম ভালবাসা নির্ভর করে হবে না। হলেও বা তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও হরেকরকম গুণের অধিকারী ডাক্তার। বিনা পারিশ্রমিকে দীনদরিদ্রদের চিকিৎসার মূল্যইবা কে কতটুকু দিয়েছে! উত্তরাধিকার সূত্রে স্বচ্ছলতা সুবাদে গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে দাতব্য চিকিৎসালয় চালাচ্ছেন প্রায় দশ বছর হল। পাঁচ পাঁচটি নলকূপ বসানোর খরচ জুগিয়েছেন। ফ্রি প্রাইমারি স্কুল গড়েছেন। নারী কল্যাণ সমিতির প্রেসিডেন্ট তিনি। আরও টুকটাক কত কিসে যে তার অবদান আছে। তবু কিনা নির্দল প্রার্থী হয়ে তিন তিনবার জামানত খোয়াতে হল!

জনগণ যে এভাবে ফি বার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তার কারণটা কি? বিভূতিভূষণ নানাভাবে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, কারণ একাধিক। প্রধান কারণটি হল, জনগণ এখন দীক্ষিত শিষ্যদের মতো। পার্টির নেতারা হলেন গুরুদেব তুল্য। অতএব নেতাদের ত্রুটি দুর্নীতি কলঙ্ক বিচার মহাপাপতুল্য। গুরুদেবের বক্তব্য অবশ্যই শিরোধার্য। দ্বিতীয় কারণটি হল, আজকাল নির্বাচনে জিততে হলে চাই বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রিগিং মেশিনারি।

ধিক্কার আর ঘেন্নায় বিভূতিভূষণ ভেবেছিলেন, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এবার নোংরা রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন। পরে ভাবাবেগ স্তিমিত হতে ভাবলেন, যুদ্ধে জয় পরাজয় থাকেই। থাকে ছলবল কৌশলও। সুতরাং, কাপুরুষের মতো পালাবেন কেন?

বিভূতিভূষণ অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলেন, আগামীবারের নির্বাচনেও দাঁড়াবেন। প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। প্রথম কাজ হবে, যেকোনও প্রকারেই হোক চানাকে নিজের অনুকূলে টেনে আনা। চানাদের সবচাইতে সুবিধা হল সবাই ওদেরকে কাছে পেতে চায়। সেজন্য সারাজীবন দুধে ভাতে থাকে। পাল্টি খেতে ওদের কোনও অসুবিধা হয় না। স্বভাবতই বিভূতিভূষণের খুব একটা বেগ পেতে হল না। চতুর্থবারের নির্বাচনে চানার নেতৃত্বে ওর দলবলের লাগামছুট অরাজকতায় বিভূতিভূষণ জিতলেন। অপ্রত্যাশিত রেকর্ড ভোটে।

যে পদ্ধতিতেই জিতুন না কেন ত্রিশঙ্কু অবস্থায় বিভূতিভূষণের কদর বেড়ে সরকার গড়তে যথেষ্ট ভূমিকা থাকল। সরকারের সমর্থক বিভূতিভূষণের মগজ থেকে সমাজসেবা আর সামাজিক পরিবর্তনের শুভচিন্তা উধাও হল না। ভাবলেন, ওঁর প্রথম কাজ হল চানা আর ওর দলবলকে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে আনা। সেজন্য একা চানাকে ডাকলেন। বললেন, আমার জন্য তোমরা যা করেছ সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তোমাদের জন্য আমারও কিছু করা দরকার। আপাতত তোমাকে একটা চাকরি দিতে চাই। পরে তোমার মনোনীত আরও ক'জনকে ব্যবস্থা করে দেব। রাজি আছতো?

আমার চাকরি! অবাক চানা বলল, আমার কতটুকু কি বিদ্যে আছে জানেন?

শুনেছি, তুমি গ্র্যাজুয়েট। বিভুতিভূষণ বললেন, ওতেই চলবে।

হলেই বা গ্র্যাজুয়েট। চানা খোলামনে জানাল, ঠিকঠাক চান্স পাইনি বলে মাধ্যমিকে দু'বার উচ্চ মাধ্যমিকে একবার গাড্ডা মেরেছি। ডিগ্রি কোর্সে অবশ্য একবারেই হিট। ইউনিয়ন করতাম তো তাই। কিন্তু কথা হল, আমার ঘটে কতটা কি আছে সেতো জানি।

যাই থাক না কেন। বিভূতিভূষণ আশ্বস্ত করে বললেন, ডিগ্রিটাই যথেষ্ট। তাছাড়া, সুপারিশ যখন আমার, ইণ্টারভ্যু হবে নামকে ওয়াস্তে।
বুঝলাম। কিন্তু মাইনেটা কত হবে জানা দরকার। কেননা, বছরে চারখানা বারোয়ারি পূজা চালাই। মহল্লার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাসে তোল্লা পাই। এছাড়াও পেটো গোলাগুলির রিটার্নে কামাই আছে। টোটাল ইনকামকে বারো দিয়ে ভাগ করলে মাসে হাজার চারেক দাঁড়ায়। তার চাইতে বেশি হবেতো?
অবশ্যই। সবকিছু মিলে সাত আটে দাঁড়াবে। তার চাইতেও ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হল, ইজ্জতদারি চাকরি। নো টেনশন। সৎভাবে নতুন জীবন। ওকে?
ওকে।
নাও সই কর। বিভূতিভূষণ একখানা সাইক্লোস্টাইল দরখাস্তের ফর্ম এগিয়ে দিলেন।
বাংলা না ইংরেজিতে? ইংরেজি হাতের লেখাটা কিন্তু যাচ্ছেতাই। চানা দ্বিধাহীন জানাল।
তবুও ইংরেজিতেই কর। বিভূতিভূষণ বোঝালেন, বহু বিখ্যাত ব্যক্তির হাতের লেখাই জঘন্য। ওটা কোনও প্রব্লেম না। তোমার সঙ্কোচ করার কিছু নেই।
বিভূতিভূষণ ওঁর দামি কলমটি এগিয়ে দিলেন। চানা চথেষ্ট সমীহ ও যত্নসহকারে ইংরেজিতে নিজের নাম লিখল।
মাত্র দশদিনে বিভূতিভূষণ মারফৎ চানার হাতে ইন্টারভ্যু লেটার পৌঁছে গেল। সাজানো কেসে যেমনটি হয়ে থাকে চানার ক্ষেত্রেও লোকদেখানো তেমনি ইন্টারভ্যু হল। বিশদিনের মাথায় চানার হাতে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে বিভূতিভূষণ বললেন, উইস ইউ গুড লাক। অতীতের নোংরা দিকটা ভুলে এবার জীবনটাকে পরিচ্ছন্ন নতুনভাবে শুরু কর।
নির্দেশমতো চানা নির্দিষ্ট সদরদপ্তরে হাজির হল। এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারখানা বড়বাবুর হাতে দিয়ে বলল, আমার কেসটা কিন্তু টপমহলের। বুঝেসুঝে টপক্লাসের পোস্টিং দেবেন দাদু।
আগে জয়েনিং রিপোর্টতো দিন, তারপর দেখছি। দাদু সম্বোধনে অসন্তুষ্ট হলেও অজস্র কাটাফাটা আর ব্রণর দাগঅলা ভয়ঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে বড়বাবু সভয়ে বললেন।
সেটা আবার কি মোশাই? চানা মস্তানি ঢঙে জানতে চাইল।
আপনি যে এই অর্ডার মতো কাজে যোগ দিতে চাইছেন তা লিখে জানাতে হবে।
ফালতু ঝামেলা পাকাচ্ছেন। অপ্রস্তুত চানা ইতস্তত করে বলল, ঠিক আছে যা লিখতে হবে আপনি লিখুন। আমি সই করে দিচ্ছি।
চানার অসুবিধাটা বড়বাবু ধরতে পারলেন। কাজেই বিনা বাক্যব্যয়ে একখানা কাগজ টেনে নিলেন। জয়েনিং রিপোর্ট লিখতে শুরু করলেন। কিভেবে চানা ইতিউতি চারদিকে নজর ঘোরাল। অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল, বেশ কয়েক জোড়া চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সবার ঠোঁটে কৌতূহলী হাসি। সঙ্কোচ এড়াতে একজনকে উদ্দেশ করে চানা হুংকার ছাড়ল, মজা দেখছ চাঁদু? দেব শ্লা চ্যাংদোলা করে জানলা দিয়ে ফেলে।
নিমেষে সবকটি চোখ ভয়ে নিম্নমুখি হল। বড়বাবু ঝটপট জয়েনিং রিপোর্ট এগিয়ে দিলেন।
আর কিছু? সই করে চানা অসন্তোষ প্রকাশ করল।

আজ্ঞে না। বিনীত বড়বাবু বললেন, আপনি ধৈর্য ধরে একটু বসুন। আমি এক্ষুণি আপনার পোস্টিং অর্ডার নিয়ে আসছি।
বড়বাবু চেয়ার ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে যেতে চানা শূন্য চেয়ারটায় বসল। আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল। অজস্র ধোঁয়ার রিং ছাড়ল।
পরের দিন চানা সাব এরিয়া অফিসে গেল। সেখানকার বড়বাবুর সহায়তায় একই পদ্ধতিতে জয়েনিং রিপোর্ট দাখিল করল। একজন করণিক হাজিরা খাতায় ওর নাম লিখে দিয়ে বললেন, সই করুন।
আর কি করতে হবে? নিজের নামের লাইনে সই করে চানা জানতে চাইল।
প্রথম দিন আজ আর কিছু না। করণিকটি জানালেন, দু'চার দিনের মধ্যে বড়সাহেব আপনার কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। আপাতত রোজ এই খাতায় সই করবেন।
সেইমতো চানা রোজ ঠিক দশটায় দপ্তরে পৌঁছায়। সই করে উধাও হয়ে যায়। ওই সময় সাধারণত কেউই দপ্তরে পৌঁছায় না। এমনকি দপ্তরের গার্জেন বড়সাহেবও না। হঠাৎ একদিন বড়সাহেব জরুরিভাবে সহকারীকে ডেকে পাঠালেন। বিস্ময়ের সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, চন্দ্রেশ্বর চৌধুরী নামে নতুন যে স্টাফটি জয়েন করেছে তাকেতো আজ পর্যন্ত চোখেই দেখলাম না। ডাকুনতো ওকে।
কি করে দেখবেন স্যার! সহকারী জানালেন, সেই প্রথম দিনে ওকে যা দেখা গেছে। তারপর আজ বিশ দিন হল কেউই দেখেনি।
তা কি করে হয়? অবাক বড়সাহেব বললেন, এ্যাটেনডেন্ট রেজিস্টারে রোজ সই দেখতে পাচ্ছি যে!
ঠিকই দেখছেন। সহকারী রহস্যটা ব্যাখ্যা করলেন, শুনেছি সে নাকি রোজ পাক্কা দশটায় অফিসে আসে। সই করেই চলে যায়।
তার মানে এখন ও অফিসে নেই?
না স্যার।
তাজ্জব ব্যাপার। আমার নোটিশে আনা উচিত ছিল। পলিটিক্যাল রিক্রুটমেন্ট বলে—ওকে এতদিনে বিনা কাজে বসিয়ে রাখা উচিত হয়নি। অশুভ আতঙ্কে দুর্বল হয়ে বড়সাহেব বললেন, ছেলেটি যদি ওর খুঁটিকে রিপোর্ট করে? অপরাধের দায়ে আমার হাল কি হতে পারে ভেবেছেন কিছু?
আই এ্যাম স্যরি স্যার। বড়সাহেবের ইঙ্গিতের গুরুত্বটা ধরতে পেরে সহকারীও শঙ্কিত হল।
শুধু স্যরি বললেই হবে না। বড়সাহেব নির্দেশ দিলেন, কাল অবশ্যই দশটার আগে অফিসে আসবেন। ছেলেটিকে ধরবেন। আমার সঙ্গে আর্জেন্টলি দেখা করতে বলবেন। সবচাইতে ওয়েটি সেকশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বটা ওকেই দেয়া দরকার। ওকে?
ইয়েস স্যার। আশাকরি, আপনি কি বলতে চাইছেন তা বুঝতে পেরেছি।
পরদিন চানা বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। বড়সাহেব ওকে ভি আই পি মর্যাদায় তোয়াজ করলেন। তারপর বললেন, পরিশ্রম কম অথচ ইজ্জতদারি লোভনীয় কাজের দায়িত্বটাই আপনাকে দেয়া হয়েছে। যদি কোনও প্রব্লেম হয়, আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আর একটা কথা, আপনি

শুধুমাত্র এ্যারাইভেলে সই করছেন দেখলাম। এবার থেকে ডিপারচারেও সময়সহ একটা সই করবেন। যদি সাড়ে পাঁচটার আগে চলে যাওয়া দরকার হয়, অবশ্যই যাবেন। সেক্ষেত্রে পরের দিন এসে শূন্য ঘরটা পূর্ণ করে দেবেন। আন্ডার স্ট্যান্ড?
বিলকুল বুঝেছি।
দেখতে দেখতে মাস কাবার হয়ে গেল। চানা কাজকর্ম তেমন কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। মাসান্তে বেতনের দিন প্রাপ্ত টাকা গুণে রীতিমতো বিস্মিত হল। সাকুল্যে তিনবার গণনায় চার হাজার পঁচিশ টাকা দেখে বলল, এত কম কেন?
ঠিকইতো আছে। পে বিলের হিসাব পরীক্ষা করে বড়বাবু বললেন, কোনও ভুলতো দেখছি না।
আর একবার দেখুনতো। চানা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, নির্ঘাৎ কোথাও কিছু ভুল আছেই।
কোনও ভুল খুঁজে পাচ্ছি না। বড়বাবু পুনর্বার হিসাব যাচাই করে বললেন।
চানা ফের কিছু বলল না। রাত্রে বিভূতিভূষণের সঙ্গে দেখা করল। অক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলল, আমার সঙ্গে বৈঠকি খেলে আপনার কি ফায়দা হল বিভূদা!
কেন, কি হয়েছে? বিভূতিভূষণ প্রতিক্রিয়াহীন শান্ত মেজাজে জিগ্যেস করলেন।
আপনি যে বলেছিলেন, সাত আট হাজার মাইনে পাব। পেলামতো মাত্র চার হাজার পঁচিশ। এই টাকার জন্য আমার গোলামি করার দরকার কি ছিল?
বিশ্বাস কর, আমি এতটুকু মিথ্যে বলিনি। বিভূতিভূষণ ভরসা দিয়ে বোঝালেন ধৈর্য ধর। সজাগ থেকে বুঝতে চেষ্টা কর। যে কাজের দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছে তাতে সাত আট কেন, দশ বারোতে পৌঁছে যেতে পার। তোমাকে চৌকস করিতকর্মা হতে হবে। ওয়েট এ্যান্ড সি।
বিভূতিভূষণ যে দু' নম্বরী টাকা রোজগারের কথা বলছেন তা বুঝতে চানার অসুবিধা হল না। চানা নির্বাক অবাক হয়ে ভাবল, তবে যে চাকরি দেয়ার সময় বিস্তর জ্ঞান বিতরণ করা হয়েছিল! এ কোন সৎপথের পরিচ্ছন্ন নতুন জীবন সে শুরু করতে যাচ্ছে!

তালতালি

নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী অটলবিহারী রত্ন ছিলেন অসাধারণ দৃঢ়চেতা নীতিনিষ্ঠ ও আইনজ্ঞান সম্পন্ন। তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় শক্ত হাতে নির্বাচন পরিচালনার হাল ধরেছিলেন। ফলশ্রুতি, কোনও দলই ঘৃণ্য পাশবিক পদ্ধতিতে আইনকে দু'পায়ে মাড়াতে সাহস পায়নি। ভোটে কারচুপি জালিয়াতি করার সুযোগও মেলেনি। ফল দাঁড়াল, কোনও দল গায়ের জোরে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারল না। বারো রকম এক ডজন নির্দল সদস্য হয়ে দাঁড়াল নতুন সরকার গড়ার ক্ষেত্রে তীব্র সঙ্কট মোচনের নয়নের মণি।

পাক্কা পাঁচ দিন টানা হ্যাঁচড়া শর্ত আরোপ দর কষাকষির চূড়ান্ত। শেষমেশ ক্ষমতাসীন সমঝোতা পার্টি নয় জন নির্দল সদস্যর সমর্থন সংগ্রহে সমর্থ হল। ব্যস, নবনির্বাচিত সদস্যদের এক বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ফের পরিষদীয় নেতা নির্বাচিত হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সমন্বয় সরকার। তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। চিঠিতে দাবি জানালেন, অধিকাংশ বিধায়কই তাঁদের সঙ্গে আছেন। সুতরাং, তাঁদেরকে সরকার গড়তে দেয়া হোক। চিঠিটির সঙ্গে গরিষ্ঠসংখ্যক বিধায়কের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর তালিকাও পেশ করা হল।

শ্রী সমন্বয় সরকার দাবির অনুকূলে আমন্ত্রণ পেলেন। নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসল। বেশ কয়েক লিটার চা কফি খরচ হল। কার্টুনের পর কার্টুন সিগারেট পুড়ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল। শেষে মিলিঝুলি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল।

দপ্তর ভাগাভাগির পর দেখা গেল, আরও একজন দাবিদার বাদ পড়ে গেছেন। মন্ত্রিসভায় সব জেলা ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নাকি অটুট ঐক্যের প্রতীক। পাছে ঐক্যে ফাটল ধরে সেই অশুভ আশঙ্কায় নতুন আর একটি পদ সৃষ্টি করে সেই বাদ পড়া দাবিদার শ্রী কোটালেশ্বর কোহলিকে মন্ত্রী করা হল।

যথাসময়ে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নিলেন। মন্ত্রীরা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। সকলেরই কৌতূহল, নতুন পদের মন্ত্রী শ্রী কোটালেশ্বরকে মুখ্যমন্ত্রী কোন কাজের দায়িত্ব দেবেন? বারো মাসেই তেরশ' তেষট্টি অনুষ্ঠানের রাজ্যে কাজের অভাব! পূজাপার্বণ জন্মদিন মৃত্যুদিন থেকে শুরু করে দৌড় পদযাত্রা শবযাত্রা শোকসভা ইত্যাকার সব অনুষ্ঠানেই একজন মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতি কাম্য। তা নাহলে নাকি কৌলিন্য থাকে না। প্রেস টিভি প্রতিনিধি পাঠায় না। তেমন উল্লেখযোগ্য জনসমাগম অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু মুশ্‌কিল হল, বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদেরকে হরেকরকম জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। পার্টির সভা সম্মেলনে অনুপস্থিতি চলে না। কথায় কথায় হিল্লি দিল্লি উড়তে হয়। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মাঝে মধ্যে বিদেশে যাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। কেউই দেশ সেবার সাধু সংকল্পে অকৃতদার নন। সুতরাং স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনধর্ম তো আছেই। স্বভাবতই প্রধান অথবা বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে চারদিক থেকে প্রতিনিয়ত ডাক এলে সাড়া দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। ওই কাজগুলির দায়িত্বই দেয়া হল শ্রী কোটালেশ্বরকে। পদটির নাম দেয়া হল, 'অল পারপাস মিনিস্টার'। বাংলা ভাষায় বলা চলে, সর্বযজ্ঞে কাঁঠালি কলা মন্ত্রী।

বিদ্রূপাত্মক বাংলা অর্থ যা দাঁড়াক না কেন শ্রী কোটালেশ্বর মন্ত্রী হতে পারায় খুব খুশি। আহ্লাদে আটখানা। হবেনই বা না কেন? হোক না সংক্ষিপ্ত হয়ে নাম পরিচিতি 'কোটামন্ত্রী'। ঘুম চোখে খবরের কাগজ খুললেই যে প্রতিদিন নিজের ফটো দেখা মেলে। বক্তৃতা দিচ্ছেন। স্ট্যাচু প্রতিকৃতিতে মালা চড়াচ্ছেন অথবা কোনও অনুষ্ঠানে উদ্বোধনি ফিতে কাটছেন ইত্যাদি। হররোজ নতুন নতুন ভূমিকায় টিভির দৃশ্যপটে চলমান তাঁকে দেখা যাবেই। উল্লেখযোগ্য জ্ঞানগর্ভ ভাষণের জন্য তিনি। কাগজে মুদ্রিত আখরে অথবা তুলির টানে দেয়ালে তাঁর উদ্ধৃতি। এমন সর্বজ্ঞানী মহাপণ্ডিত ভূভারতে ক'জন আছেন। এসক্লোপাইডিয়া তিনি।

পাদপ্রদীপের আলোয় থাকা এহেন কোটামন্ত্রীর সচিব শ্রী বিপদভঞ্জন বাগল মহাবিপাকে পড়লেন। রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দেয়ার আগে মাননীয় কোটামন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আগামী বৃহস্পতিবারের তারিখটা মনে রাখবেন স্যার। সাহিত্য সম্মেলনের কার্ডে প্রধান অতিথি হিসেবে ওঁরা আপনার নাম বোল্ড টাইপে ছেপেছেন। এ্যাড মাধ্যমে ভাস্ট পাব্লিসিটিও দিচ্ছেন। প্রেস টিভি ইনভাইটেড। যতদূর খবর পেয়েছি, ভিড় ভালই হবে। আপনার প্রেজেন্ট থাকা খুবই জরুরি। হয়তো দিল্লিতে আপনাকে দারুণ ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। বলেন তো, বুধবার আর একবার রিমাইন্ড করিয়ে দিতে পারি।

নো নীড। শ্রীবাগলের ওপর গুরু দয়িত্ব অর্পণ করে কোটামন্ত্রী বললেন, শুনেছি একালের সেরা সাহিত্যিকরা সেদিন সম্মিলিত হবেন। মহাজ্ঞানী যশস্বী অধ্যাপকরাও উপস্থিত থাকবেন। শ্রোতাদের পাণ্ডিত্যও খাটো করে দেখা উচিত হবে না। প্রধান অতিথি হিসেবে আমাকে নিশ্চিত কিছু বলতে বলা হবে। কাজেই বুঝতেই পারছেন। এই দু'দিনে আপনি জবরদস্ত কিছু লিখে রাখবেন। ওকে?

সাহিত্যের ব্যাপারেও আমাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন স্যার! অবাক শ্রীবাগল মিন মিন করলেন।

অফ কোর্স। কোটামন্ত্রী সচিবের দক্ষতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তবু গোপনীয়তা বজায় রাখতে রেহাই দিলেন না। অকপটে স্বীকার করলেন, আপনাকে পেয়েছি বলেই তো যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পারছি। নিশ্চিন্তে আছি। এ ব্যাপারেও আপনি আমার মুখ রক্ষা করতে পারবেন বলে পূর্ণ আস্থা আছে। ডোন্ট বি ওরিড্।

বললেই তো আর হয় না। শ্রী বাগল ভয়ানক মুষড়ে পড়লেন। যে কোনও সাবজেক্টের ওপর কোনও লেখা নানা বই কনসাল্ট করে চালিয়ে দেখা যায়। ব্যক্তি বিশেষের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে রেফারেন্স বই-এর অভাব হয় না। রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত শরৎ সম্পর্কিত লেখাগুলি সেভাবেই চালিয়ে দেওয়া গেছে। তাই বলে সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক কোনও ধারণা না থাকলে লেখা চলে কী? তার ওপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের ভাষণ বলে কথা। লেখাটা যথেষ্ট উত্তীর্ণ হওয়া দরকার যাতে সম্মান রক্ষা হয়।

রাত্রে শ্রীবাগলের ঠিকঠাক ঘুম হল না। হাজারো ভাবনা চিন্তায় সমস্যা উত্তরণের কোন কূল কিনারা খুঁজে পেলেন না। সকালে চা জলখাবারের টেবিলে দীপা হতাশার অন্ধকার দূর করতে আলো দেখালেন, চিনি তো সাহিত্যটাহিত্য নিয়ে বেশ মাথা ঘামায়। লিটল ম্যাগাজিনে লেখে টেখে। ওকে ডেকে এনে বিপদের কথাটা বলে দেখনা একবার।

চিন্ময় থেকে চিনি। চিনি দীপার দূর সম্পর্কের ভাই। অর্থাৎ কিনা শ্রীবাগলের শ্যালক। মধুর সম্পর্ক। হলে কি হবে নাক উঁচু শ্রীবাগল এতকাল তেমন আমল দেননি ওকে। বাংলা সাহিত্যে

ফাস্ট ক্লাসের কাছাকাছি নম্বর পেয়ে এম. এ ডিগ্রী পেয়েছে চিনি। অনেক চেষ্টা চালিয়েও কোনও কলেজে লেকচারার হতে পারেনি। ওর ধারণা, স্রেফ ব্যাকিং-এর অভাবে হচ্ছে না। সেই অভাবটুকু ভরাট করতে শ্রীবাগলের সাহায্য চায় বলেই ওকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়।
অগত্যা নিজের তাগিদে সেই চিনির ডাক পড়ল। জরুরি ভিত্তিতে।
স্কুলে পড়ানো কামাই করে চিনি হাজির। শ্রীবাগল যথেষ্ট আপ্যায়ন করে অনুরোধ রাখলেন, এবার বোধহয় স্কুলে পড়ানো তোমাকে ছাড়তে হতে পারে। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে একটু খুশি করা দরকার। এর সঙ্গে অবশ্য আমার ইজ্জতের ব্যাপারও জড়িত। কোনও রকমে উতরে দাও ভাই। তোমার দিকটা আমি সিরিয়াসলি দেখব বলে কথা দিচ্ছি। প্লীজ।
আহা, এভাবে বলছেন কেন? চিনির চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনার জন্য কিছু করতে পারা তো ভাগ্যের ব্যাপার। কি করতে হবে বলুন।
সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয়কে বক্তব্য রাখতে হবে। আর দশটা সাবজেক্টের মতো। এ বিষয়েও আমার ওপর ভরসা করে আছেন। সামনেই আমার রিটায়ারমেন্ট। সার্ভিসে এতদিনের নামযশ নিষ্ঠার জন্য এক্সটেনশান অবধারিত। ভয় হচ্ছে, তীরে এসে তরী না ডুবে বসে। ফ্রম বোথ সাইড। তোমার আমার দু'জনেরই। আই নীড ইওর হেলপ। প্লীজ।
মন্ত্রী এবং সচিব—দু'জনের ইজ্জত রক্ষার ব্যাপার। চিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে বলল, আমার কতটুকু আর যোগ্যতা? আমাকে এত বড় গুরুদায়িত্ব দেওয়া উচিত হবে কিনা সেটা একবার ভেবে দেখা দরকার।
আই নো ইওর কোয়ালিটি। শ্রীবাগল পূর্ণ আস্থা রেখে বললেন, দীপাকে দেওয়া নানা পত্রপত্রিকায় লেখা তোমার আর্টিকেলগুলি পড়ি না ভেবেছো? তোমার নলেজ ডেফথ্ সম্পর্কে আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তোমার এলেম অস্বীকার করব কেমন করে? ইউ আর রিয়েলি এ রাইজিং লিটারেরি ট্যালেন্ট।
চিনি একবারও পুরনো সংলাপ নিয়ে মাথা ঘামাল না। এই ব্যক্তিটিই একদিন বলেছিলেন, এম.এ পাশ করলেই কলেজে পড়ানোর যোগ্যতা থাকবে তার কোনও মানে নেই। আদার্স কোয়ালিটিও দরকার হয়। লিটল ম্যাগাজিনে কিছু লেখটেখ। তার বেশি কিছু তো নয়।
চিনি বরং উচ্ছ্বসিত পুলকিত হল। মনে মনে ভাবল, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে যে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিতেই হবে তার কি মানে আছে? সোজাসুজি বললেই তো পারেন, বিশাল সমুদ্রতুল্য বাংলা কথা সাহিত্যের কতটুকু কি আর জানি আমি? দেশের আপামর জনসাধারণের হাজারো সমস্যা নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই, আ মরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পড়াশুনোর সময় সুযোগ হয়ে ওঠে না। সেজন্য, অনেক সময় নিজেকে বেরসিক অপদার্থ অপরাধীও মনে হয়। আজ এই মহতি সভায় অনেক জ্ঞানী গুণী বিদগ্ধজনের মাঝে আমিও যে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছি সেজন্য নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। মাননীয় পণ্ডিত মহাশয়দের সামনে বাংলা কথা সাহিত্যের আলোচনায় গিয়ে নিজের ধৃষ্টতা দেখাতে চাই না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিনি সুমুখে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বলল, যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমাকে বিশ্বাস করে দিলেন তার যথাযথ মর্যাদা দেওয়া চেষ্টা করব। আর্শীবাদ করুন যেন সফল হতে পারি।
ভাবাবেগে দায়িত্ব কাঁধে নিলে কি হবে, ঘরে ফিরে চিনি চিন্তায় পড়ল। মানসিক অস্থিরতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল। হীনম্মন্যতায় কুঁকড়ে গিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল, কতটুকু কি আর জানে বাংলা কথা সাহিত্য জগতের? লেখাটা যদি যথার্থ গুণমানের না হয়? ভগ্নীপতির কাছে ইজ্জত থাকবে না। তিনি বেইজ্জত হবেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে। আর সভায় যদি ওঁর শূন্যকলসি ভাষণ সকলে শোনেন তো তার প্রতিক্রিয়া কি হবে?
চিনি ঘামে ভিজে একশা। অনিদ্রায় রাত কাবার হয়ে গেল।
ভোরের আলো দেখা দিতেই চিনি সল্টলেকে ছুটল। সেখানে স্কুলে জীবনের বন্ধু শ্রী সুফল সরকার থাকে। গরিব ঘরের অসাধারণ মেধাবি ছাত্র শ্রী সুফল বাংলা সাহিত্যে ডক্টরেট। নিজগুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক সমালোচক। প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা কলাম কভার করে। থিসিস পেপার ছাড়াও সমালোচনা সাহিত্য বিষয়ে ওর বেশ ক'খানা বই প্রকাশিত হয়েছে। দারিদ্র্যকালে, চিনির কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত সুফল এককালে চিনি সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিনের উপদেষ্টাও ছিল। মোদ্দা কথা, ইদানীং যোগাযোগ না থাকলেও সম্পর্কটা মরচে ধরা পর্যায়ে পৌঁছায়নি।
সকালের এই সময়টাতে ডঃ সুফল লেখাপড়ার টেবিলে ব্যস্ত থাকে। কেউ সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে বা ফোন করলে সাধারণত ঘুমোচ্ছে অথবা বাথরুমে আছে জাতীয় কিছু বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। চিনির নাম শুনে সোজা নিজের পড়ার ঘরে ডেকে পাঠাল।
দীর্ঘদিন পর দেখা সাক্ষাতের আবেগ উচ্ছ্বাস আচমকা থামিয়ে চিনি ওর আসার উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করল। ডঃ সুফল মনযোগ দিয়ে বিস্তারিত শুনল। প্রতিক্রিয়াহীন মুচকি হেসে বলল, ঘুম থেকে উঠেই সাতসকালে এসেছিস। চা পর্যন্ত খাসনি। ভেতরে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর। চা জলখাবার খা। ততক্ষণে আমার অসম্পূর্ণ লেখার বাকিটুকু শেষ করে ফেলি।
তা নাহয় হল। চিনি মানসিক উদ্বেগে বলল, সব তো শুনলি। ভরসা দিচ্ছিস তো?
আগে যা বলছি কর। সম্মতিসূচক হেসে ডঃ সুফল বলল, টাইম ওয়েস্ট করলে তোর ক্ষতি। নো মোর ডিসটার্ব মি।
পাক্কা পঁচিশ মিনিট পর ডঃ সুফল স্বয়ং ভেতরের ঘরে এলো। চিনির চাহিদা মতো দু'পাতার লেখা এগিয়ে দিয়ে বলল, নিজের হাতে কপি করে দিস। বিপদভঞ্জনবাবু নিশ্চিত সেই লেখাটা আবার নিজের হাতে কপি করবেন। যে যার ইজ্জত বাঁচাতে হবে তো।
কিন্তু, এই সামান্য সময়ে এত বড় লেখা তুই লিখলি কেমন করে? অবাক চিনি বলল, এযে শিবের অসাধ্যি ব্যাপার।
ডঃ সুফল গূঢ় রহস্যটা প্রকাশ করল না। দুর্বোধ্য হেসে বলল, জেনে লাভ কী? কার কোন সমস্যা কোথা থেকে কেমনভাবে মিটে যায় তার অধিকাংশই চিরকাল অজান্তে অন্তরালে থাকে। ওসব নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল।
যথারীতি নির্দ্দিষ্ট দিনক্ষণে সাহিত্য সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ পাঠান্তে সর্বপ্রথম হাততালি দিয়ে উঠল মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি ডঃ সুফল।

বেনারসি

ব্যতিক্রমী অভিনব বিজ্ঞাপনটিতে কুমুদশঙ্করের সন্ধানী দৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়াল। আজ রবিবার। বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে 'পাত্র চাই' কলমে বিস্তর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। গত তিনটি রবিবারের মতো আজও এতক্ষণ একটিও পছন্দমতো পাত্রীর খোঁজ না পেয়ে কুমুদশঙ্কর রীতিমতো হতাশ। ভাবছিলেন, ঠিক যেমনটি কাম্য তা উল্লেখ করে আগামী সপ্তাহে নিজেই একটি বিজ্ঞাপন দেবেন। এমন সময় এই বৈচিত্র্যময় বিজ্ঞাপনটি নজর কাড়ল।

অবাক কুমুদশঙ্কর বেশ কয়েকবার খুঁতিয়ে পড়লেন। প্রথমে ইদানীংকার 'কল মি' 'পার্টি লাইন' ইত্যাদি জাতীয় মনে হলেও পরে ভুল ভাঙতে কৌতূহলী হলেন।

বিজ্ঞাপনটিতে নাম ঠিকানা বক্স নম্বর নেই। কেবলমাত্র ফোন নম্বর উল্লেখে জানানো হয়েছে, পাত্রী পূর্ববঙ্গীয় ব্যানার্জী। বয়স তেইশ বছর। উচততা পাঁচ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি। কনভেণ্ট গ্র্যাজুয়েট, এম এস সি পাঠরতা। রেজিস্ট্রি বিবাহে উৎসাহী দাবিহীন স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই। স্বয়ং পাত্র ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। ফোনালাপে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিনিময়ের পর উভয়ে আগ্রহী হলে নির্দিষ্ট স্থান দিনক্ষণে সাক্ষাৎকার। চাক্ষুস দেখা ও বাক্যালাপের পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তি অবাঞ্ছিত অনভিপ্রেত।

নিছক কৌতূহলে কুমুদশঙ্কর ফোনের নব টিপলেন। ওপার থেকে বয়স্ক পুরুষ কণ্ঠে ভেসে এলো, হ্যালো।

আজকের খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করছি। কুমুদশঙ্কর আগেভাগে জানালেন, আমি কিন্তু পাত্রের বাবা। কুমুদশঙ্কর চক্রবর্তী।

আমি পাত্রীর বাবা ত্রিলোকেশ ব্যানার্জী। বলুন, কি বলবেন।

অর্থাৎ কিনা, আপনিও অবাঞ্ছিত অনভিপ্রেত। কুমুদশঙ্করের গলার স্বরে বিস্ময়-জিজ্ঞাসা, ব্যাপার কি বলুন তো। আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে বলেই ফোন করছি।

আমার মেয়ের ধারণা, পাত্র স্বয়ং যদি কাউকে পছন্দ করেতো সাধারণত গার্জেনরা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তাহলে, খামোকা গার্জেনদের প্রাথমিক পছন্দের নিরানব্বই শতাংশকে অমনোনীত করার সুযোগ কেন পাত্রকে দেয়া হবে?

যথেষ্ট যুক্তি আছে। কুমুদরঞ্জন সহমত প্রকাশ করে বললেন, ওকে আমার সাধুবাদ জানাবেন। জানি না, আমার পুত্র কি করবে। আমি কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহী।

স্পন্দন দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা পড়ছিল। কলমে মার্কিং করে কুমুদশঙ্কর বিজ্ঞাপনটা পড়ালেন। পরে জিগ্যেস করলেন, ইন্টারেস্টিং না?

আনকমন, নতুনত্ব আছে। স্পন্দন কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে নিরাসক্ত বলল।

একটু আগে মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বললাম। অতি উৎসাহ আগ্রহে কুমুদরঞ্জন বললেন, লাইনটা ধরে দিচ্ছি। কথা বলে দেখ না। নতুন অভিজ্ঞতাতো হবে।

মা মরা সন্তান। কুমুদশঙ্করের সঙ্গে অনেকটা বন্ধুসুলভ ঘনিষ্ঠতা। স্পন্দন টু শব্দটি করল না। নীরবতার অর্থ, সম্মতি আছে অনুমানে কুমুদশঙ্কর ফের ফোনের নবগুলি টিপলেন।

এবারও ত্রিলোকেশ ধরলেন। দু'জনের হাতের রিসিভার হস্তান্তরিত হওয়ার পর ওরা তৃতীয়পক্ষ হিসেবে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।
ইয়েস, মিস ব্যানার্জী বলছি। বলুন কি বলবেন।
আমি স্পন্দন চক্রবর্তী। আপনার অসাধারণ বিজ্ঞাপনটা দেখে ফোন করছি।
শুধু কি অসাধারণ বলে, আর কিছু না?
অবশ্যই। স্পন্দন সপ্রতিভ জবাব দিল, আপনার প্রস্তাবমতে রাজি না থাকলে ফোন করতে যাব কেন!
আমার সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতো বিজ্ঞাপনে পড়েছেন। আপনার সম্পর্কে সর্টে কিছু বলুন শুনি।
শিবপুর থেকে আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার। তিন বছর দুবাই ছিলাম। এখন এখানে নিজের প্রতিষ্ঠান। ভালরকম ইনকামট্যাক্স দিতে হয়। নিজস্ব উপার্জনে কেনা আস্ত্রা আছে। আমার হাইট পাক্কা ছ'ফুট। সাউন্ড হেলথ। মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট রেডি আছে। ভাল টেনিস খেলতাম। ক্রিকেট ফুটবল পাগল। বেড়াতে বই পড়তে ভালবাসি। এনিথিং মোর?
আপাতত এইটুকুতেই চলবে। ফুল গান ভালবাসেন না?
মনস্তত্ব পরীক্ষা? স্পন্দন শব্দ করে হাসল, ফুল গানতো বটেই সৌন্দর্য স্বপ্নও ভালবাসি। রজনীগন্ধা আর শিউলি আমার প্রিয় ফুল। রঙের মধ্যে পিংক বেশি পছন্দ।
পাত্রী গান জানে কিনা জিগ্যেস করলেন নাতো?
যদি বলে বসেন যে আমি তবলা সঙ্গত করতে পারব কিনা। স্পন্দন হালকা মেজাজে খোলা মন হল, তাছাড়া বিয়ের পর ওসব চর্চা ক'জনের থাকে? মিডিওকারদের বেলায়তো সম্ভবই না। জানেন নাকি গান?
ওই কারণেই শিখিনি। তাছাড়া, অধিকাংশেরইতো সেই চিরন্তন চিন্তাধারা। প্রথমে চাই দর্শনে অনিন্দ্যসুন্দরী, পরে বিচার্য গুণাবলী। আমার ম্যাক্সিমাম টাইম এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট ওই রূপচর্চাতেই করেছি এবং করছি।
রেজাল্ট কি? স্পন্দন কৌতূহলী হল, অনিন্দ্যসুন্দরী?
সাক্ষাতে দেখলেই বুঝবেন।
সেই দিনটা কবে?
প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনায় সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তবেই না চাক্ষুস দর্শন। আমার কিছু প্রশ্ন আছে। তার আগে আপনার আর কোনও প্রশ্ন?
আমার মা নেই। বাবা বলেছেন, আমার পছন্দই ওর পছন্দ। জেঠতুতো দাদা বউদি আর ক'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে যারা আমার পাত্রী দেখতে চাইবে। অথচ বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, তৃতীয় ব্যক্তি অবাঞ্ছিত অনভিপ্রেত। কেন, জানতে পারি কি?
কারণ, কোনও দাদা বউদি চাইবেন না যে, আপনার স্ত্রীটি বউদির তুলনায় সুন্দরী হোক। কোনও বিবাহিত বন্ধুও চাইবে না ওদের স্ত্রী সৌন্দর্যে হেরে যাক। যদি তেমন হয়ও ঈর্ষা লোলুপতা ইত্যাদি ভবিষ্যতে বন্ধুতে চিড় ধরাতে পারে।
আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই। স্পন্দন জানতে চাইল, আপনার প্রশ্নগুলি কি?

আপনার বাড়িতে মোট ক'জন এবং কে কে?
আমি হলাম জ্যেষ্ঠপুত্র। স্পন্দন গড়গড়িয়ে বলে গেল, আরও দু'ভাই তারপর এক বোন আছে। আগেই বলেছি, মা নেই। পাঁচ বছর হল মারা গেছে। সেই থেকে সর্বক্ষণের জন্য কজন কাজের লোক আছে। ভাইরা চাকরি করছে। বোন কলেজে পড়ছে। বাবাকে নিয়ে সাকুল্যে এখন আমরা ছ'জন প্রাণী। বাবা এ্যাডভোকেট।
ধরুন আপনার সঙ্গে যার বিয়ে হল সে চাকরি করছে বা করতে চাইলে আপনার সম্মতি থাকবে?
আমি চাকরিরতা মেয়ে চাইছি না। কেননা, আমার যথেষ্ট স্বচ্ছলতা আছে। তবু যদি তেমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় তো পরে ছেড়ে দিতে যুক্তি দিয়ে বোঝাব যে, একজন গৃহবধূর চাইতে চাকরিরতা মহিলার ব্যক্তিগত খরচ অনেক বেশি। যোগ বিয়োগে জমার ঘরে তেমন কোনও অংক থাকে না। তাছাড়া, আমার ব্যাপারটা অন্যরকম। মা-র অবর্তমানে রান্নাবান্না ঘর গৃহস্থালি আর সংসারের দায়দায়িত্ব আমার স্ত্রীকেই তো নিতে হবে। এটা কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।
অর্থাৎ কিনা আপনার স্ত্রীকে উনান ওভেনে তেতে পুড়ে কালিঝুলি ধুলো মেখে সংসারধর্ম করতে হবে?
নয় কেন? অবাক স্পন্দন বলল, সংসারধর্ম তাহলে কি অন্য কিছু?
মাফ করবেন। আলোচনায় তাহলে এখানেই ইতি টানুন। কেন জানেন? আপনার চাই আটপৌরে শাড়ি। আমি যে বেনারসি।
ওপার থেকে দুম করে রিসিভার রাখার শ্রুতিকটু প্রকট শব্দ ভেসে এলো। হতাশ স্পন্দন নির্বাক স্তব্ধ।

অন্যমুখি

মাসে অন্তত একবার কালীঘাটে পূজা দিতে আসাটা হৃদিব্রতর অনেক দিনের পুরনো অভ্যেস। সর্বকনিষ্ঠা বোনের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ততা আর নানা প্রতিকূলতায় সেই আসাটা এবার তিনমাস অন্তে হয়ে গেছে। এসেছেও অনেক বেলা করে। কেননা, পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে মুক্তি-স্নানে আজ প্রথম বাবুঘাটে গিয়েছিল। সেখানে স্নান সূর্যপ্রণাম আর জনক জননীকে উদ্দেশ করে ভাবাবেগের নিরুচ্চার কিছু প্রাণের কথায় অনেকটা সময় ব্যয় হয়েছে।

হৃদিব্রত এখন জোয়াল-ভারমুক্ত ফুরফুরে মেজাজে। হয়ত সেজন্যই এই ক'মাসে চালু হওয়া নানা নিয়মকানুনে মন্দিরে প্রবেশ-পূজায় দীর্ঘসময় লাগলেও বিন্দুমাত্র কষ্ট ক্লান্তি মালুম হয়নি। বরং অন্যবারের তুলনায় আজ অনেক বেশি তৃপ্তি শান্তি আনন্দ বোধ করছিল। সেই অনুভূতিতেই সম্ভবত সুপ্ত বাসনামতে স্থির করল, খড়মজোড়া আজই কিনবে।

হৃদিব্রত অনেকটা সময় ব্যয় করে আগ্রহ উৎসাহ আশা নিয়ে একাধিক দোকানে ঘুরল। কিন্তু কিছুতেই সঠিক মাপের খড়ম খুঁজে পেল না। একসময় নিরাশ হতাশ হয়ে সর্বশেষ দোকানে বিস্ময় প্রকাশ করল, আমার শ্রীচরণ দু'খানি কি এতটাই বেখাপ্পা আকারের! তা নাহলে কোনও দোকানে পাচ্ছি না কেন?

এই জোড়া দেখুন তো। আনুমানিক অষ্টাদশ বর্ষীয় রোগা যুবকটি খড়মজোড়ার ধুলো ঝেড়ে এগিয়ে দিল। তারপর জানাল, অনেক খুঁজে পেয়েছি। এর চাইতে আর বড় নেই।

এই জোড়াও অনেক ছোট হবে। হৃদিব্রত স্পর্শ না করে বলল, আমি জানতাম হবে না। তবু ভাই তুমি খামোকা এতটা কষ্ট করলে।

হন্নে হয়ে ঘুরেও না-পাওয়ার কষ্টটাতো আপনারই বেশি। দোকানের পিছন দরজায় দাঁড়িয়ে নজরে না পড়া পড়ন্ত যৌবনের সুশ্রী মেয়েটি বলল। এগিয়ে এসে মিষ্টি হেসে বোঝাল, আসলে নানা ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনে যে কোনও সাইজের একজোড়া হলেইতো চলে। আজকালতো কেউই আর পরবে বলে খড়ম কিনতে আসে না। সবাই হাওয়াই চপ্পলে অভ্যস্ত। সেজন্য হাওয়াই একটা না হয়ে নিত্যনতুন কোম্পানীর হচ্ছে। যদি অর্ডার দেন তো এনে দেওয়া যেতে পারে।

ন্নাহ্, তেমন কিছু জরুরি না। হৃদিব্রত নিরাসক্ত জবাব দিল।

ব্যতিক্রম আপনি হঠাৎ খড়ম পরতে চাইছেন কেন? কৌতূহলী মেয়েটি আচমকা প্রশ্ন করল।

আসলে খড়ম-পরা পায়ে হাঁটার শব্দটা আমার অদ্ভুত রকমের শ্রুতিমধুর লাগে। হৃদিব্রত কপট গাম্ভীর্যে বলল, তাছাড়া বয়স হচ্ছে তো। এখন থেকেই ধাপে ধাপে অন্যমুখি জীবনে যাওয়ার চেষ্টা চালানো দরকার।

কি এমন বয়স হয়েছে আপনার। শরীর স্বাস্থ্য চুল দেখেতো হ্যান্ডসাম ইয়াং লাগছে।

বয়স কি শুধু বছরেই বাড়ে? হৃদিব্রত মলিন হাসল, নানা ঝড়ঝাপটা দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাদগ্ধ তিক্ত অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষেরই ভেতরটা আগাম শুকিয়ে বুড়িয়ে যায়। বাইরের দেখায় সেসব টের পাওয়া যায় না।

বোধহয় তাই। কোথায় যেন একাত্মবোধ করল মেয়েটি। ম্লানমুখে বেপরোয়া প্রশ্ন জুড়ল, আর আপনার অন্যমুখি জীবনে যাওয়ার ব্যাপারটা কিরকম?

এই যেমন, প্রথমে নিরামিষাশী হব। সবরকম নেশা বর্জন করব। তারপর গেরুয়া পোশাক পরব। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর চিমটে কমন্ডলু ইত্যাদি নেবেন না? .মেয়েটি ফিচেল হাসল, আমাদের দোকানে আছে কিন্তু।

বললাম তো, ধাপে ধাপে। হৃদিব্রত প্রতিক্রিয়াহীন সপ্রতিভ বলল, এক্ষুণি অতদূর ভাবছি না। জানেনতো, অনেকে শ্মশানে সংসার পাতে। আবার এমন অনেক মানুষ আছে যারা সংসারে থেকেও অল্পবিস্তর সন্ন্যাসী-মনস্ক।

আপনিতো দারুণ ইন্টারেস্টিং। মেয়েটি নির্ভেজাল আন্তরিক বলল, খদ্দের না থাকলে ভীষণ বোর ফিল করি। হাতে সময় থাকলে বসুন না কিছুক্ষণ। আরও কিছু ভাল ভাল কথা শুনি।

আপনাকেও কিন্তু আমার রহস্যময়ী লাগছে। হৃদিব্রত বেঞ্চিতে বসে খোলা মনে বলল, এখন আমার হাতে অফুরন্ত সময়। কেন জানেন? এতদিন আমার অনেক দায়িত্ব ছিল। সম্প্রতি সবার ছোট বোনের বিয়ে দেওয়ার পর আমি এখন মুক্ত পুরুষ। আর সেজন্যই বোধহয় ইদানীং অনেক অনেক কথা বলছি। বলুন, কি শুনতে চান আপনি?

আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি কি পুজো দিয়ে চা জলখাবার কিছু খেয়েছেন?

ন্নাহ্। ডালা থেকে একপিস সন্দেশ-প্রসাদ আর একগেলাস জল খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেছি মাত্র। ভেবেছিলাম খড়ম কিনে মোড়ের দোকানে চা জলখাবার খাব।

তার বদলে এখানে না হয় গরীবের চা রুটি তরকারিই চলুক। মেয়েটি সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে যুবকটিকে বলল, তুই যা পিন্টু। দু'জনের জন্য পাঠাতে বলিস। যুবকটি চলে যাওয়ার পর পরিচয় জানাল, আমার ভাই। ভাল নাম শুভেচ্ছা। বি-ইর ছাত্র। ওর বড় দু'বোন ঈষা আর পুষ্যা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে।

আপনি?

আমার নাম শ্রবণা। সবে গ্র্যাজুয়েট হয়েছি, এমন সময় হঠাৎ মা মারা গেলেন। ব্যস্, মাতৃরূপে গৃহকর্ম ব্রতে নিপুণা হতে গিয়ে আর পড়াশুনো হল না।

ব্রত আমার তরফেও কম না। আমি হৃদিব্রত। বাবা পুণ্যব্রত তিনি-

একমিনিট। শ্রবণা থামিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছার আনা চা জলখাবার এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন। খেতে খেতে বলুন শুনি।

বাবা ছিলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। হৃদিব্রত সংক্ষিপ্তে শোনাল, তো তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে অকালে মারা গেলেন। প্রাইভেট প্রাক্‌টিশনার ডাক্তারদের তো আর পেনশন গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি থাকে না। তাছাড়া, বাবা তখন সঞ্চিত টাকায় সবে নতুন বাড়ি বানিয়েছেন। সেই দুঃসময়ে হলেওবা আমি বিখ্যাত বিস্কুট কারখানায় উচ্চপদে। বাকি তিন ভাই দু'বোন তখনও স্কুল কলেজে পড়ছে। সুতরাং—

বুঝেছি। শ্রবণা কথা কেড়ে নিয়ে বলল, সুতরাং হৃদিব্রত নামের যুবা-পুরুষটি পিতৃরূপে দায় দায়িত্ব কর্তব্য-ব্রতে কঠিন জীবন সংগ্রাম শুরু করল। তারপর?

সেই আমি আজ সংগ্রামে সফল উত্তীর্ণ। হৃদিব্রত সগর্বে জানাল, তিন ভাইয়ের স্ত্রী পুত্র কন্যাদি নিয়ে স্বচ্ছল একান্নবর্তী পরিবারের আমি এখন চিরকুমার অধীশ্বর। বাস করি, সকলের শীর্ষে

দ্বিতল বাড়ির ছাদে তৈরি বিলাসবিহীন ঘরে। আমার বিশ্বাস, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। যা কিছু করেন করেছেন, সবই ইচ্ছাময়ী শক্তিদায়িনী মা কালী।
মা কালীর ওপর আপনার অগাধ বিশ্বাসভক্তি। তাই না?
অবশ্যই। সেজন্যই তো বিপদ আপদ সুখ দুঃখে এখানে ছুটে আসি। এই পথ দিয়েই তো যাতায়াত করি। কিন্তু এই দোকানে আপনাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।
দু'মাস আগেও ক্যান্সার রোগী বাবাই বসতেন। শ্রবণার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হল, এখন তিনি শেষ সময়ের শয্যায়। বিজ্ঞাপন সংস্থায় কমিশনভিত্তিক শুধুমাত্র আমার রোজগারেতো সংসারের খরচ চালানো সম্ভব না। তাই, ভাই বোন সবাই মিলে দোকানটা চালু রেখেছি। এই যেমন আমি এলাম তো শুভেচ্ছা পড়তে চলে গেল।
অর্থাৎ কিনা আপনিও আমারই মত সংসার-সংগ্রামী একজন।
আপনার তবু মাথার ওপর মা বেঁচে ছিলেন। শ্রবণা দু'জনের তফাৎটা বোঝাল, বাবা চলে গেলে অসহ্য কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন বুঝি। কিন্তু, আমরা যে অভিভাবক শূন্য হয়ে যাব। মাথার ওপর আর কেউই থাকবে না ভাবলে ভীষণ ভয় হয়।
জানিনা, মা কালীর ওপর আপনার বিশ্বাসভক্তি আছে কিনা। থাকলে দেখবেন, তিনিই সব ভয়বিপদ সমস্যা মুক্ত করবেন।
মাকে তো আমিও ডাকি। শ্রবণা বিষাদ বিষণ্ণ বলল, তবু মাঝে মাঝে অবিশ্বাস উঁকি মারে। যখন দেখি, অনিন্দ্য সুন্দরী বোন দু'জনের নিরাপত্তার অভাব। বাবার এই সামান্য সম্পত্তির ওপরও প্রোমোটারদের ঘৃণ্য-নজর। দারিদ্র্য-হেতু ভাইটি আমার কলেজে পদে পদে অপদস্থ হয়। সাত্ত্বিক বাবা আমার তীব্র যন্ত্রণায় রাতদিন ছটফট করেন। তখন কিন্তু মন্দিরের মা-র চোখ তিনটিকে পাথরেরই মনে হয়।
তবু বলব, বিশ্বাস হারাবেন না। হৃদিব্রত ভরসা দিয়ে বলল, যথা সময়ে দেখবেন তিনি ঠিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সেটা হবে আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত।
মা কি আমার ঘরে টাকা পৌঁছে দেবেন? শ্রবণা বাস্তব অবস্থা জানাল, জানেন বাবা হঠাৎ মারা গেলে ওঁকে দাহ করার টাকাটা পর্যন্ত এখন আমার হাতে নেই।
ঘটলও তাই। হৃদিব্রত ফের কোনও অভয়বাণী শোনানোর আগে ভেতর-ঘর থেকে বুকফাটা সম্মিলিত মরা-কান্না ভেসে এলো। শ্রবণা বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেল। সম্মিলিত কান্নার শব্দ আরও উচ্চকিত হল। একাধিক কণ্ঠে কান্না-জড়ানো বিলাপী শব্দ বাক্য সংলাপ শুনে হৃদিব্রত রীতিমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
হৃদিব্রত লক্ষ্য করল, নানা কৌতূহলী পথচারী দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে। পাশের গলি দিয়ে পাড়া প্রতিবেশীরা আসতে শুরু করেছে। হঠাৎ ভেতর দরজা দিয়ে মস্তান গোছের একজন এসে বলল, বিক্রি বাট্টা বন্ধ্। অন্য দোকান দেখুন মোশাই। ঝাঁপ ফেলে ডেড বডির হিল্লেয় যেতে হবে। জলদি ফুটুন।
হৃদিব্রত দোকানের বাইরে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত ভাবল, সবকিছুই তো ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা নির্ভর। এই জন্যই হয়ত খড়মজোড়া পাওয়া যায়নি। এরপর কাল বিলম্ব না করে ঝটিতি ভেতর দরজার দিকে দ্বিধা সঙ্কোচহীন নির্ভীক পা বাড়াল।

পরবের দিন

উঠানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে জারুল গাছের নিচে বসে আছে লোকটা। ফজরের আঁধার থাকতে পদিরহাটি গাঁও থেকে এসেছে। চোখমুখ ধোয়ার তর সয়নি। ঘোলাটে ঘুমচোখে পুঁজের মতো পিঁচুটি। কোণ থেকে জলও গড়াচ্ছে।

প্যাংলা মানুষটা মিনমিনে হাবাগবা। বদন ভরা মেচেতা। কিরকিরে খড়ি ওঠা উদোম গা। খোঁচাখোঁচা গোঁফ দাড়ি। মাথায় শনের মতো চুল। কাঁধে ঝুলছে ন্যাতপেতে গামছা। পরনে আধছেঁড়া ময়লা ডোরাকাটা সবুজ লুঙ্গি। ঝুঁকে বসার ধরনে কুঁজ আছে মনে হয়। আদতে তা নয়।

কানে গুঁজে রাখা বিড়ির পোড়ামুখে ফুঁ দেয় লোকটা। ওপর নিচ দাঁতে চেপে ধরে। তারপর ফস্ করে ম্যাচিস্ কাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরায়। ফুঁক ফুঁক ফোকে। ধোঁয়া গিলতে গিয়ে খুক খুক কাশে। একদলা গয়ের উঠে আসে। শ্বাসটান ধরে।

দক্ষিণ পূর্ব উত্তর তিন ভিটেয় থাকে রহমতের তিন বিবি। কাল তেসরা বিবিকে নিয়ে দক্ষিণ ভিটেঘরে শুয়েছে রহমত। কাশির আওয়াজ শুনে বিছানা থেকে হাঁক পাড়ে, কে ওখানে?

তিনবার জবাব না-পেয়ে ক্ষান্ত দেয় রহমত। কাশিটা কানে গেছে হাশেমেরও। হাশেম পয়লা বিবির পেটের। পশ্চিমের ভিটেঘর থেকে বাপজানের গলাটাও টের পেয়েছে সে। ঘর ছেড়ে দাওয়ায় এসে বসে হাশেম। জারুল গাছের দিকে নজর পড়তে তাজ্জব। এতো মনুচাচা!

লোকটার আসল নাম মইনুদ্দিন মিএগ্রা। সবাই ডাকে মনুমিএগ্রা বলে। সেই সুবাদে অনেকের কাছে মনুচাচা। মানুষটা একটা আলসের ডিম। আগে ক্ষেতমজুরের কাজকাম করত। এখন ইচ্ছে করে বসে থাকে। বাহানা দেখায়, কোমর পড়ে গেছে যে। গতরে কুলোয় না আর। লেদাড়ু না-হয় ভারি কাজ করতে পারে না। বসে বসেই তো হরেক কাজের হিকমতের অধিকারী। ভাল জাল বোনার কেরামতি জানে। হাটের ওস্তাগরদের কাজে স্তিরি করার হাত আছে। টুটাফুটা ভাঙাচোরা ঝালাইয়ের কেরদানি জানে। অথচ, কিচ্ছুটি করবে না।

গাঁওয়ের ঘরে ঘরে ঘোরে মেয়ে হারিণা। বিক্রি করে দাম দেয়ার চুক্তিতে এটা ওটা খরিদ করে। যেমন, লাউ শজনা লেবু পেয়ারা পেঁপে কলা। আগান বাগান খাসজমিতে পড়ে থাকা আম তাল নারকেল কদবেল কুড়ায়। জল জলাভূমি চষে শাপলা কচুরলতি হালেঞ্চা কলমি ডুমুর নিমফুল আনে। আরও কত কী যে। চাঙারি সাজিয়ে দিনের পয়লা ট্রেন ধরে বিবি আকলাশি। আকড়া নঙ্গী বজবজ বাজারে বেচতে যায়।

বেটিবিবির গতর খাটানো রোজগারে খায় মনুমিএগ্রা। এর তার কাছে যেটুকু ফুট ফাই ফরমায়েশ খাটে তো নিজের নেশার তাগিদে। কোনদিন কিছু কামাল তো ধেনো কিনবে। সুযোগ পেলে ছোটমাপের এটাসেটা সটকান দোষও আছে মনুমিএগ্রার।

মনুমিএগ্রার সামনে মাটির ওপর এনামেলের একখানা তোবড়ানো তাগারি। এত সাতসকালে আসার মতলবটা মালুম হয় হাশেমের।

আজ ইদোজ্জোহা। কোরবানির দিন। ফি বছরের কেতায় এবারও অরফ্যান্‌গঞ্জ থেকে ডাকে জবরদস্ত দুম্বা খরিদ করেছে রহমত। ভ্যান গাড়িতে না চাপিয়ে হাঁটিয়ে এনেছে হাশেম। এতে সকলের নজর কাড়া যায়। পথে দাম নিয়ে মানুষজনের সওয়াল জবাবের মজাটাই আলাদা। এবার ডবল জবাই হবে। ঘরে বিয়োন শেষ গাইটা যে বাজা সেটা এদ্দিনে মালুম হয়েছে। পোষা প্রাণী কোরবানিতে খোদার খাতায় বড় করে নাম ওঠে। রামদাসহাটির অন্য কে আর এত ক্ষমতা

ধরে। এই ইজ্জতি-অহংকারের খবরটা আগেভাগে পড়শির পাঁচকানে চাউর করেছে রহমত।
কোরবানির তিনভাগের মাত্র এক অংশ গোস্ত পাওনা রহমত-পরিবারের। এক ভাগ ভেট যাবে রিস্তেদারদের ঘরে। বাকিটা গরিব গুরবো ফকিরদের মধ্যে দান খয়রাত হবে। জবাই প্রাণীর ছিলকাটাও ফকিরদেরই প্রাপ্য। ছিলকাটা বিক্রি করে রহমত নিজে। অগ্রে আসা পাঁচজনের মধ্যে টাকাটা ভাগ করে দেয়। এই টাকার জন্য সকলের আগে দাবির লাইন লাগিয়েছে মনুমিঞা।
মনুমিঞার হা-পিত্যেশ বসে থাকাটা বেকার যায় না। ভাল পরিমাণ গোস্তের সঙ্গে খয়রাত পাওয়া টাকাটাও বড় কম না। কিসমত দেখে মনুমিঞা মানে, খোদা তাহলে আছেন। মনখুশ আনন্দ মনুমিঞার। টাকাটার কথা গোপন রাখতে হবে আকলাশির কাছে। তাহলেই দিন সাতেক মজায় ধেনো গেলা যাবে।
এমনিতেতো রোজ নসিবে ফ্যানভাত নয়তো পান্তাভাত। সঙ্গে বড়জোর পেঁয়াজ লংকা আলুসেদ্ধ ডাল ছ্যাঁচড়া কিছু একটা। আজ দিনের পয়লা ট্রেন ধরে বাজারে যায়নি আকলাশি। গোসল সেরে রসুই ঘরে ঢুকেছে। শিক কাবাব সেঁ মোই নাস্তা সেরে রান্না ধরেছে। পাকা হাতে চুনো মাছের ঝাল চচ্চরি নামিয়েছে তোফা। তারিফ করার মতো গোস্ত রেঁধেছে জব্বর ঝাল মশলা দিয়ে। খয়রাত পাওয়া বারো আনা গোস্তই চর্বিতে জ্বাল পেড়ে শিকেয় ঝুলিয়ে রেখেছে। মেটে হাঁড়িতে রাখা এ গোস্ত যত পুরনো হবে ততই সোয়াদ। কাঠের চুলায় চরানো ভাতের চনমনে খুশবু ভাসছে বাতাসে। গ্যাঁজলা গড়াচ্ছে হাঁড়ির সরা ঠেলে। ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে অল্প। এমন সময় নিঃশব্দে চৌকাঠে এসে দাঁড়ায় মনুমিঞা।
আকলাশিকে দেখতে আজ খুবসুরতি লাগছে। আদুর গায়ে আঁচল জড়ানো বুকে ঝুলছে ফুলটুস্‌কি বাহারি ফল দু'টি। হাঁটু অব্দি উঠে আসা ডুরে কাটা শাড়ি। বেআব্রু পাটুকুশ বড়ই নজরদারি। পিঠের ওপর এলানো এক থোপনা ভিজে চুল। গহনা বলতে শুধু কয়েকগাছা কাচের চুড়ি। তাতেই নজর কাড়ছে আকলাশি।
ন্যাতা ধরে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফ্যান গালে আকলাশি। দগদগে আঁচের দিকে নজর ফেলে মনুমিঞা, আবার এট্টু চা হবেনি?
না। হেইতো নাস্তার সঙ্গি খালা। অন্যদিনের খাণ্ডাল আকলাশি আজ বড় মধুমুখি, এ্যাখুন চা খালি ভাত খাতি পারবানি। মনুমিঞাকে গা ঘেঁষতে দেখে তফাত্‌ সরতে বলে, হারিণা এ্যাখুন ডাগর হইচে। দেখতি পালি কি ভাববে। দোষারোপ করে, হারিণা তো আর দরকচা নাই। যাওনা কেনে একদিন জাহুরের দোকানে। কফিনতক্‌ ম্যাদামারাই থাকবানি?
তুইই তো মনুর গার্জেন। মগজও বলতি পারি। অনুগত তোয়াজ করে মনুমিঞা, তুই যা না একদিন।
ই কতা বলতি সরম লাগলুনি! আকলাশি কপট চোটপাট করে ওঠে, বাপ হয়েচো কোন্‌ কামে?
তোর কাছে সরম কিসের? মনুমিঞার স্বর আরও অনুগত, এ্যাতকাল তুইই তো চালায়ে নিলি হারিণার মা। বাকি দিনগুলা আর ভাবনা করতি বলিস না।
সাকুল্যে সাতটা বিয়োন দিয়েছিল আকলাশি। অভাব অনটনে সবক'টিরে ধরে রাখতে পারেনি। মুরগির বাচ্চার মতো বাদছাদ গিয়ে টিকেছে এই একটি হারিণা। তা তখন সবে গুটি ধরেছে গাছে। কারবালার করিম ওস্তাগরের বেটা জাহুরের জন্য শাদির কথা পাড়ে কানখুলির তৈমুরআলী। দাস্তবমিতে গোটা পরিবার গোরে যেতে এতিম হয়ে পড়ে জাহুর। পাঁচ ক্লাস পড়ায় ছাড়ন দিতে হয়। ঘুড়ি তৈরির কাজে তালিম নিয়েছে ধানক্ষেতির ওসমানের কারবারে। পরে বিচালিঘাটের বাজারে একফালি ঘুড়ির দোকান করে দিয়েছে ওসমান।

হরিণাকে দেখেই মনে ধরে ধরম বাপ ওসমানের। শাদি করে জাহুর। খরচাপাতি সব ওসমানের। ব্যান্ড বাজিতে মাতিয়ে হরিণাকে নিয়ে যায়। কিন্তু, ফকিরের নসিবে মওকা মিললেও দিকদারি কম না। বছর ঘুরতেও জাহুরের মন ছুঁতে পারল না হারিণা। পরের ব্যাটার দোষ দেখে না আকলাশি। ভাইবোনের মতো শোবার জন্য তো আর কেউ শাদি করে না। বাপের ঘরে রেখে গেছে জাহুর। তারপর আর এ ভিটে মারায়নি। না-দেয় খোরপোশ। তালাকও দেয়নি।
ঘরে ঢোকে হারিণা। কাঁকে এ্যালমনিয়মের আধভাঙা তোবড়ানো বর্তন। হাতে ধরা পানি ভরা ঠিলি। ভেজা কাপড়ে বাপকে দেখে সরমে মরে। মনুমিঞাকে তাড়া মারে আকলাশি, বেলা তো কম হলুনি। ঝাও দিকিন গোসল সার। মুকের কি ছিরি কইরেচো! কোল আঁচলের খুঁট থেকে চকচকে আধুলি বের করে একখানা। হাতে দিয়ে বলে, চটজলদি তেঁতুলতলা থিকি কাইম্যে আসো এগ্যে।
গাছের নিচে পাথরের চাঁইয়ে বসেছে মনুমিঞা। হাত-আরশিতে গাল সাফসুফ সুরত দেখে ফিচ করে হেসে ফেলে। পয়লা এই মনে হয়, আজ পরবের দিন। ট্যাঁকে গোঁজা গোপন টাকায় হাত পড়ে। ঠা ঠা রোদ্দুরে এক পাট গেলা হয়ে যায়। শরীরটা চনমন করে ওঠে। মেজাজটা হয়ে যায় শরিফ। মশগুল মনে আকলাশির জন্য আতর কিনে ফেলে এক শিশি। হারিণার জন্য নেয় সুরমা আর চুড়ি।
কুলুঙ্গিতে যত্নে ধরে রাখা সুবাস-সাবানের টুকরোটা নেয় মনুমিঞা। গোসলখানা বলতে ডোবা ঘাটের তিন দিক ঘেরা নারকেল সুপারি কলাপাতার ঘোরটোপ। ডোবার পাশে ঝোপ জঙ্গলটাই পায়খানা। সেসব সেরে দুপুরের খ্যাঁটন মারল গাণ্ডেপিণ্ডে।
হাবাগবাদেরও তো শরীর মন বলে কিছু থাকে। মিয়নো বিকেল গড়িয়ে সাঁঝ নামে। কোন কিছুই ঠিকঠাক লাগছে না মনুমিঞার। দাওয়ায় ঝ্যাতলা পেতে একবুক খেদ নিয়ে একানে শুয়ে আছে। আকলাশিরা আসছে না এখনো। দুপুরে বায়োস্কোপ দেখতে গেছে। হ্যান্ডেলে একগণ্ডা আরশিঅলা ঝকমকে রিকশা চালিয়ে এসেছিল ইদ্রীস। তাতেই চড়িয়ে নিয়ে গেছে মা বেটিকে। ব্যাটারি-হর্নের শব্দটা এখনো যেন কানে খটখটাচ্ছে।
ইদ্রীসকে এই সেদিনও জানত না মনুমিঞা। আকলাশির কাছে শোনা কথা, সে নাকি দূর সম্পর্কের খালাতো বোন লাগে। আগে থাকত বিহারের মুঙ্গেরে। শাদি করে বালবাচ্চা হয়নি। হালে বিবিকে তালাক দিয়েছে। চলে এসেছে কসাই পাড়ার এক গাঁওয়ালি দোস্তের ডেরাতে। পেট চালায় রিকশা চালিয়ে।
আকলাশির আসলে এরকমই নিরেস আদত। নিজের খসমকে পারতপক্ষে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। সবতাতেই কেমন যেন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। দাবড়ানি ধাতানিতে দাবিয়ে রাখতে ভালবাসে। অথচ, অন্য কোনও জোয়ান মরদ কাছে পেলে বেসরম আদিখ্যেতার অন্ত থাকে না। এর আগেও আসত এরকম আলটপকা কুটুম একজন। নাম ইউনুস। থাকত বিরজুনালার বস্তিতে। সে ছিল আবার পাখি ধরার ওস্তাদ। রকমারি পাখির ডাক জানা শিস্ ছিল ঠোঁটে। নিষেধ—পাখি খাঁচায় ধরে বিক্রি বাট্টার দিনক'টা শুধু ডেরায় থাকত। তখন টাকার জোরে বড় বেশি মাখামাখি করত আকলাশির সঙ্গে। সরকার বাহাদুরের নজরদারিতে ধুলো দিয়ে গহীন জঙ্গলে পাখি ধরতে যেত ইউনুস। সেবার সুন্দরবন থেকে বড় দাও মেরে আসে। কিন্তু, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় কিলখানার কাছে। তারপর আর কোন পাত্তা নেই।
সাঁঝ গড়িয়ে রাতের আঁধার নামে। মাবেটিতে ঘরে ঢোকে তো বোবা ঝাঁজ দেখায় মনুমিঞা। রেগেমেগে গায়ে ফতুয়া চরায়। বেখেয়াল ঘর ছাড়ে। বাস গুমটির গাছতলায় ঝুপড়িতে গিয়ে

বসে। বিড়ির বদলে সিগ্রেট কেনে এক প্যাকেট। ভালমন্দ চাটের সঙ্গে বেদম ধেনো গেলে। তারপর বেহুদা বাসে উঠে বসে। আবার আচমকা নেমে পড়ে বিচালিঘাটে। খেয়াঘাটের জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। ওপারে কোম্পানির বাগানটা ঠাহর করতে পারে না। আঁধার-ছাওয়া জাহাজ লঞ্চ গাদাবোট দেখে। ছল ছলাৎ শব্দ শুনে ইচ্ছে ধরে, জলে ঝাঁপ মারে। কিন্তু, ডর লাগে মরতে।
হারিণার আজ বায়োস্কোপ দেখা হয়নি। বেমক্কা দেখা হয়েছিল জাহুরের সঙ্গে। ঝোঁক বুঝে ছেড়ে দিয়েছিল আক্লাশি। ঠাণ্ডা পানি পেস্তা বাদাম আর পান খেয়েছে হারিণা। ভটভটি খাটো জাহাজ চড়ে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে গেছে। পানির ধারে ঝোপের আড়ালে বসেছে জাহুরের গা ঘেঁষে। কত গল্পগাছা দু'জনে। বুকে ধরে কিছু ফস্টিনস্টিও করেছে জাহুর। মায়ের হাতে বেটিকে ফিরিয়ে দিয়ে ওয়াদা করেছে, শিগগিরি একদিন বিবিকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে আসবে।
আহ্লাদে রঙিলা খোয়াব দেখছে হারিণা। পাশের কুঠোরিতে কিছুতেই ঘুম আসছে না মনুমিঞার। উসখুস এপাশ ওপাশ কাতরাতে গিয়ে আচমকা ধন্দ লাগে। কেরোসিন কুপির রোগা আলোয় যেন ভেলকি দেখতে পায়। দরজা ভেজিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে আক্লাশি। আহা, যেন চাঁদবদনী। ঠারে ঠুরে হেসে গোস্ত বিরিয়ানির খাঞ্চাটা মেঝেয় রাখে আক্লাশি। পানি ভরা বদনাটা হাতে ধরে সোহাগী ডাক পাড়ে, খাইবা আসো মিঞা।
এক লহমা বদন ফিরিয়ে নেয় মনুমিঞা। দোলাচল বেজার থাকে। মিনমিনে করে, মুই খ্যে আইচি। ভুখ নাই।
মিঞার দেকচি গোস্‌সা হইচে। আক্লাশি মশকরা করে, তুমি মিঞা বেআক্কেলে বোঁদা। আজ না পরবের দিন?
পরব তো তোদের। তাই না এ্যাত রঙঢঙ। খোঁচা মারা উস্‌কানিতে তড়পায় মনুমিঞা।
না মিঞা, না। তুমার জন্যিও খুশ খবরি আছে। জাহুর-হারিণার বৃত্তান্ত শোনায় আক্লাশি। বয়ান শুনে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে মনুমিঞা। তিরিক্ষি মেজাজে আক্লাশির চুল টেনে ধরে, তা এতক্ষুণে বলতি সময় হলো!
আহ্ লাগে। হাত ছাড়িয়ে খিল খিল হাসে আক্লাশি, বলব কখুন? ঘরে ফিরতি না ফিরতি মেজাজ করি বেইর‍্যে গেলা। তা অবিশ্যি গোঁয়ার হওয়া ভাল। দাপট না-থাকলি কী মরদ মনি হয়।
দু'জনের মাঝ দেয়ালে বুঝি ধস্ নামে। কোহরার মতো আব্রুটা সরে যায়। মিঞা বিবিতে খাবার খায় একই খাঞ্চা থেকে। কাচ্চি সড়কের মোড় থেকে দু'খিলি পান এনেছে আক্লাশি। তার একটা পুরে দেয় খসমের মুখে। বাঁশ বাখারির চৌকিতে গা ঘেঁষে বসে দু'জনে। মোড়ানো কাগজ খুলে লুঙ্গি ফতুয়া দেখায় আক্লাশি। ভুল ভাঙায় মনুমিঞার, ইর কোনডাই ইদ্রীসের দেয়া না। বছরভর গচ্ছিত ট্যাকায় কিনা। বিরিয়ানি দিয়েচে তুমার জামাই। পসন্দ হইচে কিনা?
হতভম্ব মাথা নাড়ে অনুগত মনুমিঞা।
তাহলি ঝট করি ফরতো। নিজেই পরিয়ে দিয়ে ডাগর চোখ করে আক্লাশি, আহ্ কী সোন্দর মাইনেচে মুর মিঞাকে। আজ তুমার সঙ্গি শুতি দিবা মিঞা?
কাঠচুলার আঁচ লাগে মনুমিঞার গায়ে। রহমতের হাতে জবাইয়ের ছোরার মতো ঝিলিক মারে চোখে। উবে যায় ধেনোর বিটকেল গন্ধ। আতরের খুশবু আসে নাকে। বিবাদ ভুলে মনে মনে রফায় আসে মনুমিঞা। আওরত তো আবাদি জিরাতি। যখন যেভাবে পছন্দ যাওয়াতে বাধা থাকার কথা না। থাক না কেনে ডাকাবুকো ইদ্রীস। দবদবা ইউনুস। নিজের ভাগটা হাতছাড়া করা মতিমানের কাজ না। খোদা তো পয়লাতে কমজোরি করেই পাঠায়েন। তারপর তাকত দেন। আক্লাশিকে এবার হিম্মত দেখাবে মনুমিঞা।

স্বদেশ বিদেশ দেবালয়

জন্মভূমি পৈতৃক ভিটে পরম পবিত্রস্থান। চল্লিশ বছর পর রত্নেশ্বর সেখানে যাবেন। গতকাল শিয়ালদহ স্টেশনে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে আজ সকালের প্রথম বনগাঁ লোকাল ট্রেন ধরেছেন। সারা শরীর জুড়ে অদ্ভুত এক চাপা উত্তেজনা। শির শির হিমেল হাওয়া ভাল লাগছে। ডাক যোগে পাসপোর্ট পাওয়ার পর চোখের সামনে বিস্মৃত-প্রায় শৈশব কৈশোর সুস্পষ্ট ভেসে উঠেছিল। সুমুখ-চিত্রে ছিল, ছেড়ে আসা বসতবাড়ি, স্কুল ক্রীড়াক্ষেত্র, গাছপালা, ধানখেত, খাল, বিল, নদী, আকাশ ইত্যাদি। তারপর পক্ষকাল ভিসার জন্য অনেক হ্যাপা গেছে। এখন যুদ্ধ জয়ের মতো অনন্দময় রত্নেশ্বর।

কিছুক্ষণ আগে জবাকুসুম সূর্য উদয় হয়েছে। দু'ধারের সবুজ শস্যখেতে নরম হলুদ রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে। রত্নেশ্বরের স্মৃতিতে ভেসে আসছে বেশ কিছুকাল আগে একবার বনগাঁ সীমান্তে আসার ঘটনা।

নিঃসঙ্গ উদাসী রত্নেশ্বর যশোর রোড ধরে হাঁটছিলেন। অনেকটা পথ। দু'ধারে বিশাল শিশু আর কৃষ্ণচূড়া গাছে তখন অজস্র ফুলের সমারোহ। ইতস্তত বাঁশ-বাখারির বেঞ্চি পাতা চায়ের দোকান। সীমান্তে পৌঁছে দেখেছিলেন, একটি উন্মুক্ত লোহার ফটক। আনুমানিক পঞ্চাশ ফুট দূরত্বের দ্বিতীয় ফটকটি ছিল বন্ধ। দুই ফটকের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল সীমারেখা-স্বরূপ শালবল্লার প্রতিবন্ধকতা। রত্নেশ্বরকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি মনে হওয়ার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন পাহারাদার। শাসন-কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে ধমকেছিল, কোন কুমতলবে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকছেন?

আজ্ঞে কোনও অসৎ উদ্দেশে আসিনি। রত্নেশ্বর নির্ভীক উত্তর দিলেন।

তবে?

ছুটির দিনে একবারটি ওপারে আমার জন্মভূমিকে দেখতে এসেছি। রত্নেশ্বর সরল স্বীকারোক্তি করলেন।

বোকা বানাতে চাইছেন? অবিশ্বাসে রক্তচোখ দেখিয়ে সে বলল, আরে মশাই ত্রিশ বছর ধরে আমি বর্ডারে চাকরি করছি। ধোঁকা দেওয়া অত সহজ হবে না।

রত্নেশ্বর নতুন করে জবাব দিয়ে অযথা বিপদ ডেকে আনতে চাননি। ক্ষুণ্ণমনে বাড়ি ফিরে এসেছেন। সেই থেকে মনে বাসনা ধরে রেখেছেন, আইন নিয়মনীতি মোতাবেক একবার বাংলাদেশে যাবেনই। আজ এতকাল পরে সেই বাসনা পূরণে যাত্রা শুরু।

বনগাঁয় ট্রেন থেকে নেমে রত্নেশ্বর অটো রিকশায় বসলেন। চলন্ত অটো রিকশায় বসে অপলক চোখ দু'ধারের দৃশ্যপটে। রাস্তার দু'ধারে এখন বিস্তর বাড়ি ঘরদোর। লোকালয় জনপদ। লরি বাইক প্রাইভেটকার। মনুষজনের কোলাহল কর্মব্যস্ততা। বহু বছর পরে হলেও সেই লোহার ফটক আর অফিসঘর চিনতে রত্নেশ্বরের অসুবিধা হল না। অটো রিকশা থেকে নেমে অফিসঘরের দিকে এগিয়ে যেতে সারিবদ্ধ মালভর্তি বহু ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। নিরিবিলি নির্জনতার পরিবর্তে অনেক দোকান পাট, মানুষজনের ভিড় আর ব্যস্ততা লক্ষ্য করলেন।

প্রথম ফটক পেরিয়ে অফিসঘরের পর পর দুটি কাউন্টারে রত্নেশ্বর যথাক্রমে পাসপোর্ট আর সঙ্গে

আনা সামগ্রী পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন। ছাড় পেয়ে বুক ভরা মুক্তির নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করে পুলকিত হলেন।

বাংলাদেশের অফিসঘরে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রত্নেশ্বর এখন যথেষ্ট রোমাঞ্চিত। এবার একদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। অপরদিকে গন্তব্যস্থল একটি বিশাল বাড়ি। সেখানে গেলেন। পাসপোর্ট সহ প্রয়োজনীয় ফর্ম জমা দিলেন। কিছুক্ষণ পর পাসপোর্টটি ফেরত পেলেন। অতঃপর রিকশায় বেনাপোল। এখান থেকে বাসে ঢাকায় যেতে হবে।

সময় এখন সাড়ে এগারোটা। সোহাগ ট্রান্সপোর্টের বাস ছাড়বে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। যদিও পাশেই ওদের বিশ্রামাগার আছে, কিন্তু এতটা সময় কাটবে কেমন করে? চিন্তিত রত্নেশ্বর সাতপাঁচ ভাবছেন, এমন সময় মুশকিল আসান বুদ্ধিদীপ্ত একজন তরুণ এসে কাছে দাঁড়াল। আন্তরিক জিগ্যেস করল, কলকাতা থেকে আসছেন?

হ্যাঁ, আপনি?

আমিও। পার্ক সার্কাসে থাকি। ঢাকায় শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি।

একা?

আজ্ঞে না। ব্যাটা আর বিবিকে বিশ্রামাগারে রেখে এসেছি।

কিন্তু আমি যে একা। রত্নেশ্বর নিজের সমস্যার কথা জানালেন, সঙ্গের মালপত্তর যদিও এমন কিছু না, কিন্তু এগুলি নিয়ে ঘোরাফেরাও সমস্যা।

সমস্যা বলছেন কী? চলেন, আমার বিবির হেফাজতে ওগুলি রেখে আসি। তারপর কোথাও গিয়ে চা খেতে খেতে গল্প করি।

রত্নেশ্বর খুশি হলেন।

তারপর আলাপ পরিচয় আড্ডা গল্পে সময় পেরিয়ে গেল অতিদ্রুত। বাসে বিস্তর দূরত্বের সিটে বসতে যাওয়ার আগে রত্নেশ্বর কৃতজ্ঞতা জানালেন, আমার সব কিছুই তো শুনলেন। ঢাকায় পৌঁছে একটু সাহায্য করবেন রহিম ভাই।

অবশ্যই। রহিম সপ্রতিভ হাসল, আমরা তো এক দেশেরই লোক। এদেশে আমিও আপনার মতো বিদেশি একজন।

এখন যশোর রোড ধরে দুরন্ত গতিতে বাস ছুটছে। নির্বাক নিঃসঙ্গতা কাটাতে রত্নেশ্বর পাশের সিটের যাত্রীকে জিগ্যেস করলেন, আপনি কদ্দুর যাবেন?

সদরঘাট হয়ে বেতকা গ্রামে।

বিক্রমপুরের বেতকা?

আজ্ঞে। আপনি?

জন্মভিটা দেখতে যাচ্ছি। রত্নেশ্বর সতর্কতার সঙ্গে গন্তব্যস্থলের নাম উল্লেখ না করে জানতে চাইলেন, সদরঘাটের কোন হোটেলে ওঠা যায় বলুন তো।

শাঁখারিটোলার আর্যবোর্ডিং। পুরনো আমলের হলেও খাবার দাবার খুবই ভাল।

যশোর টাউনে এসে বাস স্বল্প সময় দাঁড়াল। তারপর হাইওয়ে ধরে পদ্মাপাড়ের ফেরিঘাটে এসে নিঃশ্বাস ছাড়ল। ফেরি এলে তাতে চড়ে ওপারে যেতে এখনও অনেক সময় প্রতীক্ষা করতে হবে।

এখন চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। কাজেই পদ্মার দৃশ্য সৌন্দর্য সঠিক বোঝার উপায় নেই। তবু, অনেকের মতো একঘেয়েমি কাটাতে রত্নেশ্বরেও বাস থেকে নামলেন। অনেকটা পথ এগিয়ে গেলেন।
পদ্মাপাড়ে ত্রিপল খাটানো হ্যাজাক জ্বালানো একাধিক হোটেল রেস্তোরাঁ। একটির সুমুখে লোলুপ দৃষ্টিতে রত্নেশ্বর থমকে দাঁড়ালেন। ডিসে সাজানো ইলিশ মাছের দিকে তাকিয়ে খিদে চাগাড় দিয়ে উঠল। সারাদিনে আহার বলতে সঙ্গে আনা পাউরুটি আর কলা। ভাত খাওয়ার ইচ্ছে হলেও পরিবেশ ও অপরিচ্ছন্নতা দেখে নিজেকে নিবৃত্ত করলেন। চা বিস্কুট খেয়ে ফের বাসে ফিরে এলেন। রহিম পরিবারকে দেখতে পেলেন। চুপচাপ একা বসে থেকে অবসন্ন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙতে অবাক হয়ে দেখলেন, পদ্মা পেরিয়ে ভোরের রোদ্দুরে বাস ছুটছে। দু'ধারে নানান ঢঙের বর্ণবৈচিত্র্যময় ঘরবাড়ি। কারখানা, স্কুল, অফিস।
গাবতলিতে বাস থেকে নেমে রত্নেশ্বর এবার চোস্টারে উঠলেন। গুলিস্তানে পৌঁছে রিকশায় চড়লেন। রহিমের দেওয়া বর্ণনামতো আর্যবোর্ডিং-এ নামলেন। হোটেলটা পুরনো আমলের। অযত্নে দৃষ্টিকটু। অফিস ঘরের পাশে ঠাকুরঘরটিতে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি ও চিত্র। খাবার ঘর নয়তো যেন কর্মচঞ্চল কারখানা। কাঁসার থালা গেলাসে খাওয়ার ব্যবস্থা। খাদ্য তালিকায় শুধুমাত্র আলুভাজা ডাল আর ইলিশ মাছ। মাত্র ষোলো টাকায় ভরপেট খাওয়া।
রত্নেশ্বর ঝটিতি স্নানাহার সেরে সদরঘাট উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। বুড়িগঙ্গার পাড়ে পৌঁছে মাঝিকে বললেন, ওপারে যাওয়া আসায় কত নিবা?
সাত টাকা চাইতে পাঁচ টাকায় রফা হল। রত্নেশ্বর দূর থেকে নবাব বাড়ি আর ব্যস্ত বন্দরে মাল খালাস বোঝাই দেখলেন। ফিরে এসে ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশন শহিদমিনার মুজিবর রহমানের বাড়ি দেখে হোটেলে এলেন।
রত্নেশ্বর আজ সাত সকালে হোটেল থেকে ঝোলা কাঁধে বেরিয়েছিলেন। পবিত্র জন্মভিটেয় যাবেন। প্রথমে বাস তারপর নদী পেরিয়ে কোটারে চড়েছেন। গ্রামের খোয়া ফেলা রাস্তায় এগিয়ে চলেছেন দুলকি চালে। প্রায় এক ঘণ্টার পথ পার হতে দূরে গাছগাছালির ফাঁকে একটি মঠের চূড়া উঁকি মারতে দেখে নিজের মনকেই প্রশ্ন করলেন, সোমারঙ-এর জোড়া মঠ কি? জমাট উচ্ছ্বাস ভাবাবেগে আপ্লুত ভাবলেন, তাহলে তো জন্মভিটা গ্রামের কাছাকাছি এসেই গেছেন। অনুমান যাচাই করতে পাশের যাত্রীটিকে জিগ্গেস করলেন, চাঁদপুর এসে গেছি কি?
চাঁদপুর তো আর এট্টুখানি গাঁ না। কত্তা কোথায় যাইবেন?
পালপাড়া।
তাই কন। এক স্টপ পরেই নামবেন। ফের রিকশা বা পায়ে হাইট্যা যাইতে হইব।
সেইমতে রত্নেশ্বর বটতলা স্টপে নামলেন। কিন্তু কোথায় রিকশা! চারদিক শুনশান। জনমানবহীন। প্রকৃতি আদৌ রমণীয় নয়। শ্মশান নিস্তব্ধতায় গা ছমছম রত্নেশ্বর রিকশার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। ঝোলায় শুকনো খাবার যখন আছে পায়ে হেঁটে 'পথ চলাতেই আনন্দ' শ্রেয় মেনে নিলেন।
গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছেন রত্নেশ্বর। দু'ধারে শুধুই জলাজমি আর জলাশয়। রোদ্দুরে

ঝাঁঝ নেই কোনও। বাতাসের চরিত্র দুর্বোধ্য। অজানা পাখি উড়ে গেল কয়েকটি। এক জায়গায় ভাঙা রাস্তার ওপর দিয়ে প্রবলবেগে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছিল। পার হতে জুতো প্যান্ট ভিজে একশা। এবার দূরের জোড়ামঠ আরও সুস্পষ্ট।
দীর্ঘক্ষণ হাঁটার পর ছিপ হাতে একটি গ্রাম্য বালককে সামনে পেয়ে রত্নেশ্বর জিগ্যেস করলেন, পালপাড়া আর কতদূর?
পালপাড়াতেইতো খাড়াইয়া আছেন। শীর্ণ বালকটি জানতে চাইল, কই থিকা আইছেন?
কলকাতা থেকে।
কাদের বাড়ি যাইবেন?
তাতো জানি না।
শুনে বালকটি খিল খিল করে হেসে উঠল। বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে রত্নেশ্বর জিগ্যেস করলেন, তোর বাবার নাম কিরে?
কালীপদ পাল। বালকটি হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল। চোখমুখে ভয় প্রকট হয়ে উঠল।
তোদের বাড়িতেই তো যাব। বিস্তীর্ণ জলাশয় অতিক্রম করে কিনারা খুঁজে পাওয়ার মতো আনন্দে রত্নেশ্বর বললেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল তাড়াতাড়ি।
নিমেষে সব ভয়-মেঘ উধাও। উচ্ছল চঞ্চল হয়ে উঠল বালকটি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটতে শুরু করল। চিৎকার করে ডাক ছাড়ল, দাদারে দ্যাখ কে আইছে।
ডাক শুনে সামনে পানের বরোজ থেকে ছুটে যে যুবকটি বের হল তার শরীর স্বাস্থ্য যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সুমুখে এসে বিস্ময়ে হতবাক তাকিয়ে রইল।
কলকাতা থেকে এসেছি। রত্নেশ্বর ওর জিজ্ঞাসু অপলক চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের বাড়িতে যাব।
এবার দাদা ভাই দু'জনেই খুশি ঝলমল। আনন্দ উচ্ছল। যেন কোনও দামি সম্মানিত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ওরা দু'জনে এখন নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে যথার্থ পথপ্রদর্শক। পথ বলতে বিভিন্ন জনের বাড়ির উঠান বাগান গোয়াল রান্নাঘর পুকুরপাড় ইত্যাদির ওপর আর ধারঘেঁষা সহজ সিধা রাস্তা।
বাবা বাড়ি আছে তো? রত্নেশ্বর এক সময় শূন্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।
না। বালক ভাইটি জানাল, পিসি বাড়িতে গ্যাছে।
তাতে কী। যুবক দাদাটি অভয় দিল, আর সক্কলেইতো আছে। আপনার কুনো অসুবিধা হইব না।
গাঁয়ে দ্রুত পৌঁছে যাওয়ার পদ্ধতিই আলাদা। অতিথি আগমন বার্তা যে কালীপদর ভিটেয় আগেই পৌঁছে গেছে রত্নেশ্বরের বুঝতে অসুবিধা হল না দাওয়ায় পাটি পাতা দেখে। প্রতীক্ষারতা প্রৌঢ়া বিধবা মহিলাকে যুবক দাদাটি পরিচয় করাল, আমার জ্যাঠাইমা। পিছনে দাঁড়ানো ঘোমটায় মুখ ঢাকা মহিলাকে দেখিয়ে বালক ভাইটি বলল, আমার মা।
প্রৌঢ়া বললেন, কালীপদ নাই তো কি হইছে। বসেন। জলপান সারেন।
হাতমুখ ধোয়ার জল আর গামছা এল। তারপর রেকাবিতে নাড়ু মোয়া মুড়ি চিড়া আর এক বাটি দুধ।

প্রৌঢ়া ঝটিতি আপনজন হয়ে বলে ফেললেন, নাও খাও।
ক্ষুধার্ত রত্নেশ্বর নিঃসঙ্কোচে খাওয়া শুরু করলেন। তবু চারদিকে ঘেরা চার জোড়া চোখ যে অতিথির দিকে তাকিয়ে আছে অনুমানে যথেষ্ট সময় নিয়ে খাচ্ছিলেন। সুমুখে উঠানে এক হাঁটু কাদা জল আর বাস্তুভিটার পাশ দিয়ে বহমান জলস্রোতের দিকে তাকাচ্ছিলেন।
দ্যাখছো কি? প্রৌঢ়া অভিযোগ জানালেন, তোমাগো ফারাক্কা আর কতকাল আমাগো ভাসাইব কও দেখি।
রত্নেশ্বর মনে মনে ভাবলেন, সেই ছোটবেলায় তখন নৌকা ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন তবু হেঁটে যাওয়া যায়। সাত পাঁচ ভেবে অবশ্য বললেন অন্যরকম, হাসিনার সঙ্গে তো চুক্তি হয়েছে। আর কষ্ট থাকবে না।
বিশ্বাস নাই। প্রৌঢ়া দীর্ঘশ্বাস ওড়ালেন।
রত্নেশ্বর নিজের বাপ ঠাকুর্দার পরিচয় জানাতে প্রৌঢ়া চিনলেন। খাওয়া শেষ করে পিতৃপুরুষের ভিটে দেখতে যাওয়ার অনুমতি চাইতে বললেন, ওই ভিটাটুকুই যা আছে। যাবা তো নিশ্চয়। তাড়াতাড়ি ফিরবা। যাবা আর আসবা।
কেন? দুই পথপ্রদর্শককে নিয়ে রওনা হতে উদ্যত রত্নেশ্বর থমকে দাঁড়ালেন।
অ্যাতকাল পরে দ্যাশে আইছেন জ্ঞাতি-ভাত খাইয়া যাইবেন না? এই প্রথম ঘোমটার আড়াল থেকে কণ্ঠস্বর শুনে রত্নেশ্বর অভিভূত হলেন। অপ্রত্যাশিত হৃদয়গত আহ্বান আমন্ত্রণে নির্ধারিত সূচী নিমেষে বদলে গেল। বললেন, অবশ্যই আসব।
চারদিকে আম, জাম, কাঁঠাল, গাব, চালতা, বাঁশগাছ ইত্যাদি কিছুই নেই এখন। নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ দ্বীপের মতো বেঁচে আছে শুধু ভিটেটুকু। অযত্নে অপরিচ্ছন্নতায় অব্যবহারে তিলে তিলে ক্ষয়ে ঝরে ভেঙে বিলুপ্তির পথে। মৃত্যুশয্যায় শীর্ণ কঙ্কালসার দীর্ঘায়ু রোগীর মতো।
দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে রত্নেশ্বরের চোখ ছল ছল করে উঠলেও ঐতিহাসিক মন্দির মসজিদ গির্জা দেখার মতো অনুভূতি হল। অদ্ভুত এক তৃপ্তি আনন্দে বুক ভরে উঠল।
এরপর এক হাঁটু কাদা জল ভেঙে তারপর প্রবল বেগের জলস্রোতের ওপর সাঁকো পার হলেন রত্নেশ্বর। ব্রজযোগিনী বাজার আর হাইস্কুল দেখতে যাচ্ছেন রত্নেশ্বর। এখন নামেই বাজার আর স্কুলের দৈন্যদশা রত্নেশ্বরকে ব্যথিত করল। ফিরতি পথে বাজারের এক ছাউনির নিচে সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে চা খেতে বসলেন। দোকানির শরীর স্বাস্থ্য পোশাক চুল চোয়ালে চূড়ান্ত দারিদ্র্য সুস্পষ্ট।
বাজারের এই হাল কেন? টুকটাক কথার মধ্যে রত্নেশ্বর এক সময় জিগ্যেস করলেন।
আজ্ঞে টাঙিবাড়ির উন্নতির জন্য। দোকানি জানাল, সিখানে এখন পাকা বাড়ি হাসপাতাল লোহার পোল বিদ্যুৎ বাতি। আধা শহর। দোকানি যেন আর থামতে চায় না। কৌতূহলে কলকাতা সম্পর্কে হাজারো প্রশ্নে রত্নেশ্বরকে বিব্রত করে তোলে।
চায়ের দাম কত হল? দ্রুত বেহিসেবি সময় পেরিয়ে যেতে রত্নেশ্বর আচমকা উঠে দাঁড়ালেন।
বলেন কি কত্তা? অবাক দোকানি দাঁতে জিব কেটে বলল, বাপ দাদাদের ভিটা দ্যাখতে আইছেন আর আমি আপনার থন পয়সা লইব?
ধন্যবাদ সূচক আনত হেসে রত্নেশ্বর ফের চলতে শুরু করলেন। পথে এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে বালক

ভাইটি পরিচয় করাল, আমাদের স্যার। কোনও বাক্যালাপে রত্নেশ্বর সময় খরচ না করে নমস্কার বিনিময় করেই এগিয়ে চললেন। যুবক দাদাটি জানাল, উঁনার আত্মীয়স্বজনেরা সক্কলে কইলকাতায় থাকেন। বাপঠাকুর্দার ভিটায় মরতে চান বইল্যা ইহানে একাই আছেন।
রত্নেশ্বর দেখলেন, টিনের চালের পূজা মণ্ডপটি এখনও তেমনি আছে। জিজ্ঞাসায় জানলেন, এখন আর মূর্তি পূজা হয় না। কোনওরকমে ঘটপূজা হয়। মণ্ডপে বসে ক'জন জটলা করছিল। আকর্ষণীয় চেহারা পোশাকে অচেনা রত্নেশ্বরকে সঙ্গে দেখে একজন ফিসফিসিয়ে বালক ভাইটিকে জিগ্যেস করল, তগো কি হয়রে?
আত্মীয়। যুবক দাদাটি সগর্বে জবাব দিল, ইন্ডিয়ায় থাকেন।
সম্ভ্রম সঙ্কোচ হীনম্মন্যতায় ওরা কুঁকড়ে গিয়ে মুখে আর রা কাড়ল না।
দুপুরে লোভনীয় নানান পদের খাবারের মধ্যে ইলিশ আর কই মাছ অবশ্যই ছিল। ফিরতি পথে সোমারঙ গ্রাম ঘুরে জোড়ামঠ দেখে টাঙিবাড়ি হয়ে ঢাকায় ফিরতে হবে। হাতে সময় সংক্ষিপ্ত। বিশ্রাম আরাম আয়াশে সময় না কাটিয়ে বিদায় চাইতে প্রৌঢ়া বললেন, এক রাত্তির থাকি গেলে কালীপদর সঙ্গে দেখা হইতো।
ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব নয় জানাতে রত্নেশ্বর কোনও বাধা পেলেন না।
সময় এখন পড়ন্ত বিকেল। বৈরাগী আকাশ জুড়ে ইতস্তত নির্জীব মেঘ। বাতাস নিরুত্তেজ। মাথার ওপর ঘরফেরা পাখিদের ব্যস্ততা। বিষণ্ণ রত্নেশ্বর টাঙিবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনলেন। আসন্ন বিচ্ছেদ বিদায় পর্বে ভ্রাতৃদ্বয়ের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, সারাদিন একসঙ্গে কাটালাম। কিন্তু তোদের নাম তো জানলাম না রে।
আমি অতীশ।
আমার নাম দীপঙ্কর।
খুউব ভাল। বিশ্ববিখ্যাত নাম তোদের।
সামান্য সংখ্যক যাত্রী নিয়ে একটি বাস এসে দাঁড়াল। রত্নেশ্বর জানলার ধারের সিটে বসলেন। সারাদিনের ছায়াসঙ্গী দু'জনও পাশে বসল।
অতীশদীপঙ্কর সম্পর্কে কিছু জানিস? রত্নেশ্বর জিগ্যেস করলেন। লজ্জাবনত নিরুত্তর ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তিনি এই গাঁয়েরই ছেলে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। বটতলা স্টপ আসার আগে অতীশ, দীপঙ্কর টিপ টিপ করে রত্নেশ্বরকে প্রণাম করল। বাস থেকে নামার আগে একে একে বলল, আবার আসবেন।
রত্নেশ্বর এক চিলতে ম্লান হাসলেন। কোনও জবাব দিলেন না। অলস গতিতে বাস চলতে শুরু করল। রত্নেশ্বর ঝুঁকে পিছন ফিরে তাকালেন। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে আবছা অন্ধকারে ঢাকা জন্মভিটে কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র বার্ধক্যের পবিত্র তীর্থভূমি। আত্মমগ্ন হয়ে ভাবলেন, দেশ ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময়টাও ছিল এমনই অন্ধকার। মন জুড়ে ছিল অশুভ আশঙ্কা উদ্বেগ ভীতি। স্মরণে ছিল না, মা যে শিখিয়েছিলেন, কোথাও যাওয়ার আগে গুরুজনদের তো বটেই দেবালয়েও প্রণাম করে যেতে হয়। সেই অসম্পূর্ণ কাজটি করতে আজ কোনওমতেই ভুল হল না। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, কোথায় যাচ্ছেন তিনি।

স্বপ্ন সদন

অনেকক্ষণ হল ধৈর্য ধরে বাড়ি তৈরি করা দেখছিল জোজো। এখনো গ্রিল লাগানো হয়নি। রঙের কাজ বাকি। ঝুল বারান্দায় লাইট ওয়াল পিকচার বেতের চেয়ারের ব্যবস্থা দরকার। দরজায় পেলমেট পর্দাও লাগাতে হবে। এখনো আরও কত কিছু যে বাকি। গাঢ় নিঃশ্বাস উড়িয়ে জোজো অসন্তোষ প্রকাশ করল, সেই কবে থেকে শুরু করেছো! বাড়িটা তৈরি হতে এত বেশি সময় লাগছে কেন বাপি?

সময়তো একটু লাগবেই। হাতের কাজ বন্ধ করে তুহিন মাথা তুলে তাকাল। একটু জিরিয়ে নিতে আবার একটা সিগারেট ধরাল। তারপর দশ বছরের কচি মন থেকে হতাশা হটাতে সরস কথা বলল, মাল মশলা যোগাড় করতেই তো কতদিন কেটে গেল। লেবার প্রব্লেমটা দেখছো তো। ছুটির দিন ছাড়া সময় পাচ্ছি কোথায়। দোতলা বাড়ি বানানো কি সোজা ব্যাপার?

তাও তো ঢাকা পড়ে থাকবে বলে ভেতরের কোন ঘরই করছো না। জোজো বাড়িটার অনেক খুঁটিনাটি ত্রুটি উল্লেখ করে অভিযোগ জানাল, কিন্তু কল বাথরুম পায়খানা ছাড়া মানুষ থাকতে পারে?

হো হো শব্দ করে হেসে ফেলল তুহিন। নিজের ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে গেল। বজবজের পৈত্রিক ভিটেতেও ওসব ছিল না। পুকুর জঙ্গল আর পাকা সড়কের পাশে কলের জলই ভরসা ছিল।

একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে তুহিন বলল, দারুণ প্রশ্ন তুলেছো জোজো। ছোটবেলায় আমিও ঠিক এরকম কথাই বলেছিলাম বাবাকে।

তাহলে দাদুবাড়িতেও প্রথম ওসব ছিল না! জোজোর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তাহলে তোমাদের চলত কেমন করে?

মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে তুহিন বলল, পরে ওসব হল।

আশ্চর্যরকম গম্ভীর হয়ে গেল তুহিন। পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে ভাবল, তাইবা চলল কোথায়? কতরকম মডিফিকেশন সত্ত্বেও স্নেহাতো কিছুতেই বাড়িটা মেনে নিতে পারল না।

মডার্ন ফ্ল্যাটের সুন্দর টাইলস্ বসানো ফ্লোরে বসে তুহিন কাজ করছে। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো কাগজ পিসবোর্ড সেলভেন পেপার। ডেনড্রাইট গামপেস্ট ময়দার আঠা। স্টেপলার কাঁচি ব্লেড। রঙিন কাপড় রং তুলি। জুতোর বাক্স দেশলাই-খোল সিগারেট প্যাকেট।

সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল তুহিন। ছেড়ে আসা পৈত্রিক বাড়ি নিয়ে নস্টালজিয়া এড়াতে কাজে মন দিতে চাইল, ভেব না জোজো। আজকেই তোমার বাড়িটা কমপ্লিট করে ফেলব। গল্প করে সময় নষ্ট করা চলবে না।

নিশ্চিত মনে জোজো বুদ্ধিমান ছেলের মতো খেলতে চলে গেল।

আজকাল স্কুলের পরীক্ষায় সৃজনশীল কাজের জন্য ভাল নম্বর ধরা থাকে। ইতিপূর্বে তুহিনকে

মাটির আম কলা কমলালেবু বানাতে হয়েছে। নকশা আঁকা মাটির ফুলদানিও বানিয়েছে একবার। একবারতো মাটির টবও বানাতে হয়েছিল। তাতে আবার রঙিন কাগজের ফুল পাতাঅলা গাছ থাকার নির্দেশ ছিল। এবার এই দোতলা বাড়ির মডেলটা জোজোর নামে জমা পড়বে।
ক'জন ছাত্র আর নিজেদের হাতে এসব তৈরি করে? টিচাররা জেনে বুঝেও কেন যে এই অসাধু পদ্ধতিটা চালু রেখেছেন তা তুহিনের মগজে আসে না। বরং ব্যাপারটাকে গার্জেনদের ওপর হয়রানি হুজ্জুতি মনে হয়। নয়তো কী?
আজ রবিবার। সকালে টিভি-তে মহাভারত দেখার পর বাড়ি তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছে তুহিন। লাঞ্চ টী টাইমে যেটুকু অফ পেয়েছে। তাছাড়া একে নাগাড়ে গলদঘর্ম কাজ চলছে এই বিকেল পর্যন্ত।
চোখের ওপর বেশ চাপ পড়ছে তুহিনের। ঘাড় কোমরে ব্যথা হচ্ছে। দুপুর থেকেই মাথাটা ভার হতে শুরু করেছিল। বজবজের বাড়ির প্রসঙ্গ এসে পড়ায় সেটা বেশ বাড়ছে। এখনতো রীতিমতো মাথাধরা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। কিছুতেই ঠিকঠাক মন বসাতে পারছে না কাজে। ঘুরেফিরে কেবলি বজবজের বাড়িটার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে।
রেলস্টেশন থেকে প্রথমে কিছুটা পাকা সড়ক। তারপর ইট ফেলা গ্রাম্য সরু পথ। বেশ খানিকটা জঙ্গল জলাজমি পেরিয়ে গেলে মরা খাল। সাঁকোর ওপারে কয়েক ঘর বসতি। দু'বিঘার ডাঙা জমিটা। পুকুর ঘিরে নারকেল সুপারি গাছের সারি। হাজার রকমের গাছ-গাছালি। পুকুরে মাছ গোয়ালে থাকবে গরু। ওপার বাংলার ভিটেমাটি থেকে শিকড় তোলা একজন শিক্ষকের এরকম স্বপ্ন থাকবে সেটাই তো স্বাভাবিক।
তখন দিনেও শুনশান শ্মশান-নিস্তব্ধতা ছিল। সূর্য ডুবে সন্ধ্যা নামল তো যেন নিমেষে গভীর রাত। পুকুর পাড়ে ঝোপ জঙ্গলে জোনাকি জ্বলত। ঝিঁঝির ঝিনঝিনানি ছিল। ধারে কাছেই শেয়ালের ডাক শোনা যেত। ডাকাতির ভয় থেকেও ওই ডাকটা বেশি ভয়ঙ্কর ছিল। পরে অবশ্য সেসব ছিল না। ধারেকাছে অনেক বাড়ি বসতি হয়েছিল। ইলেকট্রিক এসেছে শাল খুঁটির মাথায় চেপে। চওড়া কাঠের সেতু হয়েছে খালের দু'পাড় জুড়ে। এপারে বসেছে জলের কল। আদর্শ পাঠশালা গতরে বেড়ে নাম হয়েছে আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
প্রধান শিক্ষক তীর্থঙ্কর গাঙ্গুলি তখন গঙ্গোপাধ্যায়। তড়িৎ তমোনাশ তমাল তিমির তন্ময় তুহিন— ছয় ছেলে তাঁর। একটিই মেয়ে, তনিমা। তখনকার দিনে সাত নয় এগার সন্তান কোন ব্যাপারই ছিল না।
সমস্যাটা শুরু হয়েছিল বাস্তু হারিয়ে এপারে চলে আসার পর। শিক্ষকদের এমন কিছু মাইনে মিলত না সেসময়। প্রাইভেট টিউশনিও করতেন না নিয়ম নীতিনিষ্ঠ তীর্থঙ্কর। ভাগ্নে ভাগ্নি বোনের মুখ চেয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন সরমার দুই দাদা। বার্মাসেলের ডিপোয় ভাল চাকরি দিতে চেয়েছিলেন রেবতীমোহন। সন্তোষমোহন চেয়েছিলেন তীর্থঙ্কর স্কুল ছেড়ে ভাল রোজগারের দেয়া চাকরিটা নিক বাটা জুতা কারখানায়।
ঢাকা ইউনিভার্সিটির গোল্ড মেডেলিস্ট তীর্থঙ্কর পায়ে ঠেলেছিলেন সেই সাধা ধন। তাতে বেজায় চটেছিলেন সরমা। মা-র পক্ষ নিয়েছিল ছেলে মেয়েরাও। শেষ পর্যন্ত কোন চাপের কাছেই মাথা

নুইয়ে হার মানেননি তীর্থঙ্কর। ওঁর মতে, টাকাটাই বড় কথা নয়। বৃত্তিটাও সম্মানজনক সমাজসেবামূলক হওয়া চাই। হৃদয়মনের সঙ্গে যোগ না হলে সেই বৃত্তিকে ভালবাসা যায় না। আর ভালবাসতে না পারলে বৃত্তিটা একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

তা শিক্ষকতা করেই কমতো করেননি তীর্থঙ্কর। ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়েছেন। মাথা গোঁজার ঠাঁইও করেছেন একটা।

বাড়িটা পাকা হলেও টালির ছাদের। পাশাপাশি পাঁচখানা লাইন ঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। উঠানের একদিকে বাঁশ বাখারি খড়ের রান্নাঘর। অন্যদিকে গোয়াল ঘর। সুমুখটায় বনতুলসীর বেড়া।

ছেলেমেয়েরা যতদিন ছোট ছিল তখন ছিল একরকম। লেখাপড়া শিখে বড় হতে বাড়িটা যে অপছন্দ তা জানাতে দ্বিধা করত না। আজীবন গরিব শিক্ষকের অভাবী সংসারের হাঁড়ি ধরে দুঃখ কষ্ট পাওয়ার জন্য সরমার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। দাদাদের দেয়া চাকরি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য শোনাতেন গঞ্জনা। ছেলেরা একে একে প্রতিষ্ঠিত হতে সরমার নাক বাঁকানো কটু মন্তব্য বাড়ল বই কমল না। শেষের দিকে তো স্বামীর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতেন না।

সবার আগে বজবজের বাড়ি ছাড়ল তড়িৎ তমোনাশ। আমেরিকায় চাকরি করতে গিয়ে মেম বিয়ে করে আর ফেরেনি তড়িৎ। একইভাবে বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত তমোনাশ। যতবার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতায় এসেছে, উঠেছে বালিগঞ্জের শ্বশুর বাড়িতে। এক আধ দিন বজবজে এসে একা ঘুরে গেছে তমোনাশ। তনিমার বিয়েতে তড়িৎ তমোনাশরা কেউই আসেনি।

তখন অভিজাতদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বসতি নিউ আলিপুর। নিউ আলিপুরের মেয়ের সঙ্গে তমালের প্রেম ভালবাসার বিয়ে হল। বিয়েটা হয়েছিল কলকাতায় ঘর ভাড়া করে। দু'বার বউ নিয়ে বজবজে এসেছিল বটে। আবার আসতে বলায় লীনা নাক উঁচিয়ে বলেছিল, বড্ড দূরে থাকেন আপনারা। তাছাড়া, এই ঝোপজঙ্গল শেয়াল-ডাক আমার একদম ভাল্লাগে না। এখানকার জমি বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় চলে আসতে পারেন না?

না পারি না। প্রস্তাবটা সকলের মনে ধরলেও তীব্র প্রতিবাদ করে রিটায়ার্ড তীর্থঙ্কর বলেছিলেন, মনের কাছেই আসল দূরত্ব বউমা। মন টানলে দূরত্ব থাকে না। তাছাড়া, আমি তো কাউকেই এখানে এসে কষ্ট পেতে বলছি না। আমাকে আমার মতোই থাকতে দাও।

লীনাতো ভাল কথাই বলেছে। বিস্ময় প্রকাশ করে ভাববাচ্যে বাতাসে কথা ছুড়লেন সরমা, এত চটবার কি আছে বুঝি না। ছেলেরা কেউই তো আর বজবজে কাজ করে না। তবে আর কীসের জন্য এই জঙ্গলাজমির কুঁড়ে ঘর আঁকড়ে থাকা!

সেসব বস্তুবাদি সুখ ভোগমনা মানুষের মগজে ঢুকবার না। তীর্থঙ্করও ভাববাচ্যে বাঁকা জবাব দিলেন, আমি তো কাউকেই ধরে রাখতে চাইনি, চাইছি না। উপযুক্ত ছেলেদের মা-র মন চাইলে সেও কুঁড়ে ঘর ছেড়ে ছেলেদের বিলাসী ছাদের তলায় যেতে পারে।

সরমা অবশ্য স্বামীকে ছেড়ে আসেননি। তমালের হাত ধরে লীনাও আর কোনদিন বজবজে শ্বশুরের ভিটে মাড়ায়নি। ঘরজামাই হলেও খোঁজখবর নিতে তমালের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতেও কসুর করেনি।

তিমির তন্ময় যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ছোটবেলা থেকেই বন্ধুর মতো বড় হয়ে ওঠায় দু'জনে দারুণ

বোঝাপড়া মিলমিশ। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কলকাতায় একই অফিসে চাকরি জুটিয়েছে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্কুটার কিনেছে একটা। বিয়ের ভাবনা মাথায় রেখে পুরনো রান্নাঘর, উড়িয়ে দিয়েছে। সেই জায়গাটাতে আধুনিক ব্যবস্থায় ছোট্ট দোতলা বাড়ি বানিয়েছে। মনের মতো ঘর সাজিয়েছে। তারপর একই দিনে দু'জনে বিয়ে করেছে।
তিমির তন্ময়ের বউদের মধ্যেও মিলমিশ বোঝাপড়ার অভাব ছিল না। না ছিল দেওর শ্বশুর শাশুড়ির কোন অযত্ন। বালি উত্তরপাড়া ছেড়ে এসে বজবজ মানিয়ে নিতে সময় লাগল না।
কিন্তু তীর্থঙ্কর গাঙ্গুলির ঠিকুজিতে বোধহয় কোন সুখ লেখা ছিল না। তিন মাসের ব্যবধানে একই বছরে তিমির তন্ময়ের দু'টি ছেলে হওয়ার পর থেকেই শুরু হল ভাবনা। দেশকালের দ্রুত পরিবর্তন হলেও বাটা বজবজ অঞ্চলে তেমন কোন উন্নতিই নজরে পড়ে না। কলেজ হাসপাতাল বলতে ছোটো কলকাতা। ছোটদের জন্য তেমন কোন ভাল স্কুলই নেই তো কোথায় মিলবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল।
বালিগঞ্জের সাউথ পয়েন্ট স্কুলের খুবই নামডাক। কিন্তু, ওরা আবার মফস্বলের ছেলেমেয়েদের অ্যাডমিশান দিতে রাজি না। কারণটার যৌক্তিকতা তিমির তন্ময়রাও বুঝতে পারে। সত্যিই তো, বজবজ থেকে বালিগঞ্জের দূরত্ব তো নেহাত কম না। স্কুল আর বাড়ি কোনটাই স্টেশনের গা ঘেঁষা না। ফোর প্লাস বয়সের ছেলেদের পক্ষে রোজ যাতায়াত খুবই কষ্টকর। অতটা ধকল সামলে ঠিকঠাক পড়াশুনো করা কি সহজ কথা? তাছাড়া, ওরা তো আবার বাবা মায়েদের ইণ্টারভ্যু নেয়। কোন পরিবেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসতে চাইছে সেদিকটাও বিচার করে।
নিউ আলিপুর তখন ভরাট জমজমাট। সেখানে ঠাঁই খুঁজে পাওয়া দায়। বাধ্য হয়ে অভিজাতদের নজর পড়েছে যোধপুর পার্কের ফাঁকা জমির দিকে। নিত্য নতুন বাড়ি গড়ে উঠছে সেখানে। নজর কাড়ার মতো দারুণ দারুণ ডিজাইনের সব বাড়ি। সেখান থেকে সাউথ পয়েন্ট স্কুল আর কতটুকু পথ? ভবিষ্যতে স্কুলের পিক আপ বাসও আসবে। না এলেও বা, যাতায়াতের সুবিধা আছে অনেক।
সব দিক দেখেশুনে বুঝে তিমির তন্ময়রা পছন্দ মতো বাসা দেখে উঠে এলো যোধপুর পার্কে। তালা ঝুলল বজবজে তৈরি নিজস্ব ফ্লাটবাড়িতে। বাবা মা মারা যেতে সেটা হয়ে দাঁড়াল শহরের একঘেয়েমি কোলাহল থেকে ক'দিনের ছুটি কাটানোর আস্তানা বিশেষ।
জোজোর স্কুলের পরীক্ষার জন্য বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ করে তুহিন আত্মতৃপ্তি বোধ করল। শেষ পর্যন্ত দেখতে যে এতটা সুন্দর হবে তা ভাবতে পারেনি। শুধুমাত্র নামি আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হলেই হয় না। অঢেল সামর্থ্য আর অক্লান্ত পরিশ্রমই সার্থক সৃষ্টির মূল পাথেয় না। উন্নত মানের সৃষ্টির জন্য চাই আধুনিক চিন্তাধারার প্রগতিশীল পরিকল্পনা। মনন আর সুনির্দিষ্ট নিশানা।
সল্টলেকের অত্যাধুনিক এই ওনারশিপ ফ্লাটটা তুহিন নিজেই পছন্দ করে কিনেছিল। কিন্তু, নিজে একজন আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়েও পছন্দমতো বাড়ি তৈরি করতে না-পারার অতৃপ্তি বুকে ধরা ছিল। বুকের ভেতর ধিকি ধিকি আগুন জ্বলার কষ্টবোধ হত। এতদিন পর স্বীয় স্বপ্নের সেই বাড়ির মডেলটা তৈরি করতে পেরে আনন্দ হবে না! তুহিনের বুকের ভেতরকার অতৃপ্তির আগুনটা উবে গেল। মনের কোণে গোপন আশা জন্মাল, এই মডেলটা নিশ্চিত আর সকলের চেয়ে সেরা বিবেচিত হবে। সার্থক সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে স্নেহার কাছে জানতে চাইল, কেমন লাগছে জোজোর বাড়িটা?

ভাল। নিরাসক্ত জবাব দিল স্নেহা।
শুধুমাত্র ভাল বলছো! যেন হোঁচট খেল তুহিন। মনক্ষুণ্ণ হলেও সহজ হবার চেষ্টা করল, দারুণ ভাল অথবা ফ্যানটাসটিক—কিছু একটা বলা উচিত ছিল।
তেমন হলে তবেই তো বলব? হেসে ফেলে জবাব দিল স্নেহা।
তুমি বোধহয় মডেল দেখে ঠিক বুঝতে পারছো না। চিড় ধরা গোপন আশা বুকে ধরে স্থির বিশ্বাসে তুহিন বোঝাল, এই চেহারার সত্যিকার বাড়ি তৈরি হলে বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে তুমি। তখন চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ত না।
তাই বুঝি। কৌতুক করে সোচ্চার হাসল স্নেহা। তারপর যথেষ্ট সিরিয়াস হয়ে গেল, দূরের সেকটরগুলি ঘুরে দেখেছো কখনও? হালের তৈরি বাড়িগুলির ডিজাইন দেখলে বুঝতে, তুমি কত পিছিয়ে আছ।
ধ্যেৎ। অবজ্ঞা সূচক বিকৃত ভঙ্গি করল তুহিন। আহত রাগে ফেটে পড়ে বলল, ওগুলির মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা কোথায়? দেশের সব কোণেই তো বেড়াতে গিয়েছো। দেখলেই বোঝা যায় কোনটা মন্দির মসজিদ আর গির্জা। তেমনি বিভিন্ন রাজ্যের আর্কিটেক্টেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তুমি যে বাড়িগুলির কথা বলছো সেগুলি আসলে দেশ বিদেশের ধার করা মাত্র। কিন্তু, জোজোর বাড়িটা সম্পূর্ণ আমার কল্পনা। বিন্দুমাত্র অনুকরণ না।
বিতর্ক এড়াতে স্নেহা চুপ করে গেলেও মডেলটা দেখে জোজো আদপেই খুশি হতে পারল না। বাড়িটার হাজার ত্রুতি বিচ্যুতি ধরল। ওর স্বপ্নের বাড়িটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেই কল্পিত বাড়িটার বর্ণনা করে শোনাল। অথচ আশ্চর্য! তুহিন বিন্দুমাত্র হতাশ মনক্ষুণ্ণ হল না। এতটুকু রাগ করল না। নির্বাক নিস্তব্ধ একা আত্মমগ্ন বসে রইল। তারপর গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেল। অনেকদিন পর বাবার ঝাপসা মুখটা সুস্পষ্ট হয়ে কাছে এলো। আর, চোখের সামনে বজবজের বেচে দেওয়া বাড়িটা ভেসে উঠল। এক চরম সত্য উপলব্ধি করল তুহিন। তাই দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে নিরুচ্চার বলল, তোমার স্বপ্নের বাড়িটা তোমার ছেলেরও পছন্দ হবে না জোজো। তখন যেন রাগ করে দুঃখকষ্ট পেও না।

মন্দমধুর

দরজার বাইরে থেকে গলার স্বর শুনে বীজেশ বুঝতে পারলেন, সুমৌলি এসেছে। অবাক ও ঈষৎ চিন্তিত হয়ে ভাবলেন, এখানে টানা পনেরো দিন কাটিয়ে এই তো পরশু শ্বশুর বাড়িতে ফিরে গেল। আজ যে আসবে এমন খবর তো অফিসে রওনা হওয়ার সময় পর্যন্ত জানা ছিল না। তবে কী ফের কোন অশান্তি পাকিয়ে এসেছে?

একরাশ বিরক্তি নিয়ে বীজেশ জোরে কলিং বেলের বোতাম টিপলেন। পরিচারিকা মন্দিরা এসে দরজা খুলে দিল। বীজেশ জুতো খুলে ভেতরে ঢুকতে অতিথি-ঘরে দ্বৈত ক্ষোভ উত্তপ্ত আলোচনা স্তব্ধ হল। এক ঝলক চোরা দৃষ্টি ফেলে বীজেশ খাটের ওপর মা মেয়েকে পা মুড়িয়ে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখলেন। সুমৌলির পরনে আটপৌরে শাড়ি। ওর ছোট ভি আই পি স্যুটকেশটা খাটের নিচে। অর্থাৎ কিনা, থাকবে বলে প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

অসন্তুষ্ট বীজেশ সুমৌলিকে দেখেও অতিথি-ঘরে ঢুকলেন না। ব্রীফকেসটা সোফায় রেখে ক্লান্ত পায়ে সোজা দোতলায় উঠে গেলেন। অফিসের পোশাক ছেড়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে রাতের পোশাক পরলেন। তারপর ব্যতিক্রম আচরণ করলেন। অন্যদিন নিচে ড্রইং রুমে টিভিতে চোখ রেখে চা জলখাবার খাওয়া অভ্যেস। অনেকটা সময় জার্নাল ম্যাগাজিন পড়ে অথবা সুরতার সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়ে থাকেন। পরিবর্তে আজ টেরাসের দোলনায় বসে একটা সিগারেটে আগুন ধরালেন। মৃদু দোল খেতে খেতে ধোঁয়া উড়িয়ে উন্মনা হলেন।

রুচিশীল কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান সুদর্শন সোমক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ওর বাবা নির্বিরোধী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। একমাত্র দিদির বিয়ে হয়েছে সুপাত্রে। যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়ে সন্তোষজনক তথ্যের ভিত্তিতেই সুমৌলিকে দ্বিধাহীন এই বিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আশ্চর্য, সামান্য মতবিরোধ হলেই সুমৌলি ফোনে সুরতাকে অভিযোগ জানায়। তুচ্ছ খিটিমিটি হলেই এখানে চলে আসা অভ্যেস। এখনও এক বছর পূর্ণ হয়নি বিয়ে হয়েছে। এরই মধ্যে তিনবার এরকম লোটাকম্বল নিয়ে আসা হয়ে গেছে। আজকের অনুমান সত্যি হলে হিসেবটা ত্রৈমাসিক হয়ে যাবে। একমাত্র সন্তান, সেইসঙ্গে অবুঝ গর্ভধারিণীর প্রশ্রয় আর ইন্ধন থাকলে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক জেনেও বীজেশ বিরূপ মন্তব্য নির্ভীক বিরোধিতা করতে ছাড়েন না। সেই নিয়ে সুরতার সঙ্গে কম অশান্তি হয় না। আজও অশান্তির আশঙ্কায় বীজেশ এখন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

আবহাওয়াটা যে ঝড়ের পূর্বাভাষ তা বুঝতে সুরতার সময় লাগল না। বীজেশকে চা জলখাবার মন্দিরাই দিয়ে থাকে। অনায়াসেই ওকে দিয়ে ওপরে পাঠানো যেত। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশে সুরতা স্বয়ং সঙ্গে নিয়ে টেরাসে এলেন। বীজেশের সামনে ফাইবার টুলে রেখে অপর একটায় নিজে বসলেন।

সুমিকে দেখেই বুঝি নিচে নামলে না? সুরতা নরম স্বরে অনুযোগ জানালেন, জানি এখানে ওর আসা তোমার পছন্দ না। কিন্তু—

কোনও কিন্তু না। বীজেশের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের কারণ উঠে আসে, বাপের বাড়িতে মেয়ে এলে অপছন্দ হবে কেন? বরং খুশি হওয়ারই কথা। তোমাকে হাজারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, সামান্য মতবিরোধ খিটিমিটিতে হুটহাট এভাবে ওর চলে আসা আর আমাদের প্রশ্রয় পাওয়া ঘোরতর অন্যায়। এতে ওদের দু'জনের দাম্পত্যজীবন সুখশান্তির তো হবেই না। বিচ্ছেদের দিকে

টার্ন নিতে পারে।
এবার কিন্তু আমিই ওকে চলে আসতে বলেছি।
কিন্তু, কেন? বীজেশ উত্তেজিত প্রশ্ন করলেন।
তা নাহলে সুমি খুন হয়ে যেতে পারত। সুরতা আত্মপক্ষ সমর্থনে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, রাগলে ওর শাশুড়ির মাথা ঠিক থাকে না। এমন সব অস্বাভাবিক আচরণ করেন, যা দেখলে যে কেউ ভয় পাবে। সুমিও আজ ভয় পেয়েছিল। সেক্ষেত্রে আমি ওকে নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে বলব না?
আজকের রাগের কারণ? বীজেশ শান্ত প্রশ্ন করলেন।
পরশু ওদের ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় নাকি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। সুরতা শ্লেষ বিদ্রূপের সঙ্গে ঠোঁট বাঁকালেন, সেই অপরাধে সুমির সঙ্গে কথা বলা বন্ধ।
সোমক কিন্তু বার বার বলেছিল, বিকেলে রোজই ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে দেখে মা বেলাবেলি ফিরতে বলেছে। আমিও ওদেরকে ছেড়ে দিতেই বলেছিলাম। তবু তুমি রাতের খাবার না খাইয়ে ছাড়লে না। সেই তো জলবৃষ্টিতে আটকে পড়ে ঝামেলা হল?
মানলাম। কিন্তু সুমি তো আজ ওঁর মান ভাঙাতে গিয়েছিল। সহজ হয়ে গেলেই পারতেন। উল্টাসিধা হাজার কথা শোনানোর কি দরকার ছিল। আমার নামেও দু'চারকথা বলতে ছাড়েননি। তাই সুমিও চুপচাপ থাকতে পারেনি। যোগ্য জবাব দিয়েছে। তাতেই আগুনে ঘি পড়েছে। ব্যস্, তারপর মাথায় রক্ত। অস্বাভাবিক আচরণ। যা নয় তাই বলেছে সুমিকে।
সোমক সে সময় বাড়িতে ছিল?
সে জন্যই তো সুমির বেশি দুঃখ হয়েছে। মা-ন্যাওটা আনস্মার্ট ছেলে। হাঁদারামের মতো চুপচাপ দু'জনের ঝগড়া শুনেছে। টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করেনি। অফিস যাওয়ার সময় সুমিকে বলে গেছে, তুমি যেন রেগেমেগে বাপের বাড়ি চলে যেও না। মা-র রাগ কমলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এই হঠাৎ বেখাপ্পা রেগে যাওয়াটা এক ধরনের রোগ। এর কোন চিকিৎসা নেই।
তবু সুমি তোমার কথায় চলে এসেছে! বীজেশ নির্ভীক তিরস্কার করলেন, ঠিক করেনি। তুমিও ওকে চলে আসতে বলে বুদ্ধির পরিচয় দাওনি। এবার যদি সোমক ওকে নিতে না আসে? আমার মনে হয়, কালকেই ওর ফিরে যাওয়া উচিত।
আশ্চর্য মানুষ তো তুমি! সুরতা অভিযোগ জানালেন, তুমি ওদের পক্ষ নিয়ে পরামর্শ দিচ্ছ কেন? মেয়েদেরকে চিরকাল তোমার খাটো করে দাবিয়ে রাখা অভ্যেস। সুমি আমার কোনও দিক থেকে খাটো না। একালের মেয়ে। আমাকে যা পেরেছো ওর বেলায় তা হবে না। এবার সোমক এলে আমি একটা হেস্তনেস্ত করে তবে সুমিকে ছাড়ব।
বীজেশ স্পষ্টত বুঝতে পারলেন, ইদানীং পত্র-পত্রিকা আর সভাসমিতিতে নারীর প্রাপ্য যোগ্য সম্মান অধিকার নিয়ে আলোচনা মতে সুরতার ভাষণ শুরু হবে। সবশেষে নারীর সবচাইতে বড় শক্তি কান্না জুড়ে দিতে পারে। তাই আর কোনও জবাব দিলেন না। সুরতার কাছে জানতে চাইলেন, সুমি কি নিচে টিভি দেখছে?
না। বোধহয় শুয়ে আছে।
তুমি গিয়ে ওকে একবার পাঠিয়ে দাও। বল, আমি ডাকছি।
সুমৌলি এলো ম্লান বিষণ্ণ চোখমুখে।
আয় বোস মা। বীজেশের কণ্ঠস্বর নির্ভেজাল স্নেহময়।
সুমৌলি বসল যেন পাথরপ্রতিমা।

যদি ভেবে থাকিস, বাবা তোকে আর ভালবাসে না—সেটা ভুল হবে। বীজেশ যথেষ্ট আন্তরিকভাবে বোঝালেন, নতুন পরিবেশ মন মানসিকতার মানুষজনকে মানিয়ে নিতে সব বিবাহিত মেয়েরই কম-বেশি সময় লাগে। চাকরিক্ষেত্রেও তাই হয়। যে যত তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে পারে ততটা তার এফিসিয়েন্সি বা ক্রেডিট। বিবাহিত জীবনে সুখশান্তি মুখ্যত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুষ্ঠ বোঝাপড়ার ওপর নির্ভরশীল। সোমক তো কোন দোষ করেনি।
ওর বিরুদ্ধে আমার তো তেমন কোনও অভিযোগ নেই। সুমৌলি অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, ওর দিদি সুধন্বা পর্যন্ত বলে, আমার মা-কে আমি তো চিনি। তুমি কিছুতেই ওর সঙ্গে শান্তিতে ঘর করতে পারবে না। সোমের উচিত, কোনও ফ্ল্যাটে চলে যাওয়া। তোমাদের জামাইকেও বলেছে।
সোমক কি বলে?
দিদিকে বলেছে, আমরা চলে গেলে বাবা মা-কে কে দেখবে? আমাকে বুঝিয়েছে, দিদির এসব বুদ্ধি দেওয়ার পিছনে ঋত্বিকদার মদত আছে। ঋত্বিকদা মহা ধড়িবাজ। চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় অফিস যাতায়াতে কষ্ট হয়। আমরা বাড়ি ছাড়লে মা বাবাকে দেখভালের নামে এ বাড়িতে পাকাপাকি উঠে আসবে। বাড়িটা মা-র নামে। আমাদের ওপর বিরূপ মা-র মন ভিজিয়ে বাড়িটা নিশ্চিত দিদির নামে হাতিয়ে নেবে।
তাহলে তো সোমককে যথেষ্ট দূরদর্শী বুদ্ধিমান বলতে হবে। অথচ, তোর মা যে হাঁদারাম বলছিল ওকে? বীজেশ তির্যক তাকিয়ে সুমৌলির ঠোঁটে এক চিলতে হাসি দেখতে পেলেন।
মা কিন্তু আমার শাশুড়িকেও যতটা খারাপ ভাবে ততটা নন! সুমৌলি রীতিমতো বীজেশকে অবাক করে বলল, এমনিতে দারুণ ভাল মনের মানুষ। আমাকেও যথেষ্ট ভালবাসেন। একটাই দোষ, রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তখন আমারও মেজাজ ঠিক থাকে না। আবার ভীষণ ভয়ও হয়।
আসলে তোর শ্বশুরমশায় অন্য জগতের মানুষ। ছেলেমেয়েকে মানুষ করা, সংসার পরিচালনার সবরকম ঝক্কি ঝামেলা সামলাচ্ছেন তোর শাশুড়ি। ফলে উনি একনায়কতন্ত্রী হয়ে উঠেছেন। সংসার কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠভাবে চলে না। রাজনৈতিক দলে একজন নেতা বা নেত্রী, সংঘ সমিতিতে সভাপতি বা সম্পাদক, খেলার মাঠে ক্যাপ্টেনের মতো সংসারেও একজন গার্জেনের আনুগত্য মেনে নিলেই সবকিছু ঠিকঠাক চলে। না মানলেই ছন্নছাড়া অথবা অশান্তি দেখা দেয়। তোকেও সেই আনুগত্য মেনে নিতে হবে। তাছাড়া, সোমকের দিকটাও তো তোর চিন্তা করা দরকার।
আমার মতামতকেও ওর কী মর্যাদা দেওয়া উচিত না?
অবশ্যই।
এই কথাটাই এবার এলে মা ওকে বোঝাতে চায়। সুমৌলি হঠাৎই যেন সেই বহু আলোচিত নারীর সম্মান আর অধিকারের দাবিতে মুখরা হয়ে ওঠে, মেয়েদের কী আত্মসম্মানবোধ থাকতে নেই? আমরা চিরকাল পুরুষের ইচ্ছা-নির্ভর হয়ে থাকব! সোম চায়, ওর সবরকম নির্দেশ যেন মেনে চলি। এতো প্রভুত্ব করা ছাড়া আর কিছু না।
বীজেশের মনে হল, এতক্ষণ বোঝানোর সব চেষ্টা বিফলে গেল। কাজেই বিবাহিত জীবন আর লিভ টুগেদারের জীবনধারা যে সম্পূর্ণ আলাদা, সে সম্পর্কে কোনও যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণে গেলেন না। চূড়ান্ত হতাশ হয়ে আলোচনায় ইতি টানলেন, অনেক রাত হল। জানিনা, তোর মা আবার সাতপাঁচ কি সব ভাবছে। তুই বরং এবার নিচে যা মা।

ঋত্বিকের পৈত্রিক বাড়ি চুঁচুড়ার ঘড়ি মোড়ে। নদী পার হলে নৈহাটি। সেখানে এক বোনের বিয়ে হয়েছে। অপর বোনের শ্বশুরবাড়ি শেওড়াফুলিতে। পৈত্রিক বাড়িতে এখন বাবা মা তিন দাদা বউদি আর ওদের সন্তানাদি নিয়ে তেরজনের একান্নবর্তী পরিবার। শক্ত সমর্থ গৃহকর্তা বাবার সম্রাট-মেজাজ। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংসার পরিচালনায় অধীশ্বরের হাজার নিয়মকানুন। সেসবের মধ্যে অন্যতম, বিবাহিতা মেয়ে বউমারা কেউই সামাজিক অনুষ্ঠান আর অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া বাপের বাড়িতে রাত কাটাবে না। বাবা মা-র আগে সবাইকে সকালের শয্যা ছাড়তে হবে। রাতে শোওয়ার ঘরের কপাট বন্ধ হবে গৃহকর্তার পরে। বউমারা সাংসারিক কাজ করবে নির্ধারিত রুটিনমতো ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতসব অদ্ভুত অদ্ভুত নিয়ম মেনে চলতে সুধন্বার অসহ্য লাগত। শৃঙ্খলিত জীবন মনে হতো। তাই একমাত্র সন্তান বুম্বাকে নিয়ে ঋত্বিক সুধন্বা রেল স্টেশনের কাছে ভাড়াবাড়িতে চলে এসেছে। সুধন্বা এখন মুক্ত বিহঙ্গ। অবাধ স্বাধীনতায় খুশি ঝলমল। অনেক সহজ হয়ে গেছে, লিলুয়ায় বাপের বাড়িতে যাতায়াত রাত্রিবাস।

সুধন্বা এখন যখন খুশি লিলুয়ায় যায় আসে। আজও বুম্বাকে নিয়ে গিয়েছিল। রাত্রে ফিরে এলো ম্লান বিষণ্ণ। ফের সুমৌলির হাওড়ায় যাওয়ার ঘটনাটা জানিয়ে বলল, সোম বড্ড ভেঙে পড়েছে। ওর চোখমুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যাচ্ছিল না। ভীষণ অসহায় দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছিল।

চাঙ্গা করে তুলতে ফের কিছু বুদ্ধিটুদ্ধি দিয়েছো নিশ্চয়ই? ঋত্বিক উত্তরের সুযোগ না দিয়ে ফের বলল, আগের মতো আবারও বলছি, ও বাড়িতে তোমার এত বেশি না যাওয়াই ভাল। বিয়ের পর বাপের বাড়ির ব্যাপারে অযথা নাক গলালে সেখানকার সমস্যা অশান্তি বাড়ে বৈ কমে না। এমন একটা সময় আসবে, যখন কেউ তোমাকে সুনজরে দেখবে না। আমার তো মনে হয়, তুমি ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা অপ্রিয় হয়ে উঠেছো।

ওখানকার কেউ কী তোমাকে কিছু বলেছে? সুধন্বা জানতে চাইল।

বলতে হবে কেন? ঋত্বিক দ্বিধাহীন বলল, সুমৌলিকে তুমি মা-র বদমেজাজের কথা অতিরঞ্জিত করে ভয় দেখিয়েছো। বলেছো, অমন শাশুড়ির সঙ্গে সে কোনদিনই সুখশান্তিতে বাস করতে পারবে না। সোমকে বলেছো, মেরুদন্ডহীন বলেই সে এখনও ও বাড়িতে আছে। নইলে দিল্লীর অফিসে বদলি নিয়ে চলে যেত। এসব প্ররোচনা মা যেমন করেই হোক জেনে আমার সামনেই তোমাকে বলেছেন, তুই ঘর ভাঙাতে চাইছিস নাকি?

হ্যাঁ, ওদেরকে এসব আমি বলেছি। সুধন্বা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, ওদের মঙ্গল সুখশান্তির জন্যই বলেছি। নিজের স্বার্থের জন্য তো বলিনি।

যদি নিঃস্বার্থেই হবে,তবে মা অমন কথা বলার পরেও কেন যাও? ঋত্বিকের চোয়াল শক্ত হল, সেই থেকে আমি তো আর যাই না।

কি স্বার্থ দেখছ তুমি? উত্তেজনায় সুধন্বার কণ্ঠস্বর কম্পিত উচ্চকিত হল।

স্বার্থ না বলে মতলব বলাই ভাল। ঋত্বিক লাগামছুট নির্ভীক বেআব্রু বলল, কিন্তু তোমার গোপন ইচ্ছা কোনওদিন সফল হওয়ার নয়। কেন জান? প্রথমত সোমকে আমার মতো নির্বোধ দুর্বল চিত্তের মানুষ মনে হয় না। বাবা অন্ত প্রাণ সে জানে যে, ওরা দু'জনে আলাদা হয়ে গেলে তিনি দারুণ আঘাত পাবেন। সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে বেশিদিন বাঁচবেন না। সুতরাং, সুমৌলি চিরদিনের জন্য সোমকে ছেড়ে থাকলেও, সে কিন্তু বাবা মা-কে ফেলে বাড়ি ছেড়ে যাবে না। দ্বিতীয়ত যদিও বা যায় আমি কিন্তু তোমার পরিকল্পনা মতো এই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে লিলুয়ায় গিয়ে

থাকব না। যে নিজের বাবা মাকে ছেড়ে এসেছে তার পক্ষে নীতিহীন লোভ লালসায় শ্বশুরের বিকল্প পুত্রের ভূমিকা পালন করা অসম্ভব।
তাহলে তো তোমার দাদাদেরকেও বুদ্ধিমান আর সবল চিত্তের বলতে হয়। সুধন্বা কটাক্ষ করে বলল, জানিনা দিনের পর দিন বিনা প্রতিবাদে যথেচ্ছ আপমান লাঞ্ছনা অবিচার সহ্য করার মধ্যে তুমি বুদ্ধি বোধ বলিষ্ঠতা কোথায় খুঁজে পেলে!
ঋত্বিক স্পষ্টত বুঝতে পারল, সুধন্বা কোন্ কোন্ প্রসঙ্গে ঘাই দিতে চাইছে। ঘটনা সত্যি যে, বড় বউদি বিয়ের আগে চাকরি করত। বিয়ের পর সেই চাকরি ছাড়ার আদৌ কোনও ইচ্ছে ছিল না। বড়দা দু'বছরের আগে সন্তান চায়নি। তবু বাবা মা অতিশীঘ্র নাতিনাতনির মুখ দেখতে চাওয়ায় বড় বউদিকে বিয়ের বছরেই প্রথম সন্তান ধারণ করতে হয়েছে। কাজেই রোমান্টিকতার তেমন সুযোগই পায়নি। চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে বাবার যুক্তিমতো। বাবার মতে, চাকরি সংসার সন্তান একসঙ্গে দেখাশোনা ঠিকঠাক হয় না। বিদেশে সম্ভব, যেহেতু ওরা গভর্নেস রাখতে পারে। মেজবউদির বাড়ি থেকে প্রতিদিন ফোন আসত। অধিকাংশই ছিল, অহেতুক উদ্বেগের। যেমন, একদিনের ছুটি নিয়ে তিনদিন ঝি আসেনি তো চলছে কেমন করে? নাতিটির সর্দিটা কমছে না তো হোমিওপ্যাথির ভরসায় থাকা ঠিক হচ্ছে না। রাত দশটায় জামাই বাড়িতে না-ফেরার কি কারণ থাকতে পারে। ঝড়বৃষ্টিতে নাতির স্কুলে না যাওয়াই ভাল। মেয়ের শরীর ম্যাজম্যাজ করছে তো স্নানের দরকার নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি খোঁজ আর পরামর্শ বাবার অপছন্দ। ব্যস, স্পষ্টবাদী বাবার অপছন্দে ওসব বিলকুল বন্ধ। আর ছোট বউদি? একে একমাত্র সন্তান, তারপর বাপের বাড়ি চন্দননগরে। রোজ বিকেলে যুগলে স্কুটারে এসে হাজির হতেন। থাকতেন রাত আটটা অব্দি। প্রথম দিকে অস্বাভাবিক মনে না হলেও তিনশো পঁয়ষট্টি দিন! একান্নবর্তী পরিবার। নানারকম প্রাইভেসি থাকতেই পারে। নাতি নাতনিদের পড়াশুনো থাকে। তাছাড়া, শত অসুবিধা সত্ত্বেও কোনও একজনকে তো সঙ্গ দিতেই হয়। সুতরাং, বাস্তববাদী বাবা সমস্যাটা ছোট বউদিকে বলতে দ্বিধা করেননি। এসবই সবার মতে, বাবার দোষ।
এসব ঘটনা অবশ্য সুধন্বার শোনা কথা। কেউ না কেউ বলেছে। তাতেই ওর মনে হয়েছে, বিনা প্রতিবাদে এসব জুলুম মেনে নেওয়া অন্যায় অপরাধ হয়েছে। ঋত্বিকের মনে হল, অন্যায় অপরাধ যদি কেউ করে থাকে তবে সে নিজে। মনে মনে ভাবলেও সুধন্বার মন্তব্যে আর কোনও জবাব দিল না। কারণ সে জানে, এরপর সুধন্বার ঠোঁটে লাগাম থাকবে না। সংযম শালীনতা ছাড়িয়ে যাবে। গলার আওয়াজ ক্রমশ বাড়বে। রাত এখন অনেক। পাড়া নিস্তব্ধ হলেও প্রতিবেশীদের কান কৌতূহলে সজাগ আছে।

হাই সোম। করিডোরে মুখোমুখি হতে অ্যাকাউন্টস সেকশনের সোনালি অবাক হয়ে বলল, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার! অসুখ বিসুখ কিছু?
না তো।
বিব্রত সোমক সপ্রতিভ বলল, ছুটিতে ছিলে। অনেকদিন পর দেখছ তাই হয়তো মনে হচ্ছে। কোনও অসুখ হয়নি তো। আই এ্যাম কোয়াইট ওকে।
মেয়েদের থার্ড আই কিন্তু খুব স্ট্রং হয়। সোনালি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, তাহলে নিশ্চিত কোন প্রব্লেমে টেনশনে আছো। অ্যাম আই রং?
কম বেশি সমস্যা কার না থাকে? কপট হাসিমুখে সোমক বলল, আমারও আছে। বাট আই অ্যাম টেনশন ফ্রি ম্যান।

আপত্তি না থাকলে অক্লেশে আমাকে বলতে পার। হয়তো সাহায্যে আসতেও পারি।
প্রব্লেমটা এমন যে তোমার দ্বারা সলভ্ সম্ভব নয়। সুতরাং খামোকা বলে কী হবে?
তবু চেষ্টা করে দেখতে পারি। সোনালি ভাবাবেগে আপ্লুত হল, আফটার অল আমি তো তোমার ওয়েল উইশারদের একজন। নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে অভ্যস্ত তুমি অফিসে কোন মেয়েকে পাত্তা না দিলেও, আমি কিন্তু মনেপ্রাণে তোমাকে চাইতাম। এখনো ভালবাসি। মিসেসের সঙ্গে গোলমাল কিছু অথবা ভুল বোঝাবুঝি? সোনালি ফিচেল হেসে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসু তাকালো।
এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। অপ্রস্তুত সোমক দৃষ্টি অন্যমুখি করল।
তাহলে আমার ফ্ল্যাটে আসবে একদিন?
তোমার ফ্ল্যাট! অবাক সোমক কৌতূহলী প্রশ্ন জুড়ল, সালকিয়ায় তোমাদের অমন বিশাল বাড়ি থাকতে ফ্ল্যাটে?
সে তো পিতৃপুরুষের শরিকি সম্পত্তি। বিষয় আশয় সম্পত্তি মানেই অশান্তি। বাবার ভাগে যেটুকু ছিল তার বাটোয়ারা নিয়ে দাদাদের মধ্যে দারুণ সংঘাত। অথচ আশ্চর্য, হার্ট অ্যাটাকে পঙ্গু বিধবা মা-র দায়দায়িত্ব নিতে সবাই নারাজ। আমি তাই ফ্ল্যাট কিনে মাকে নিয়ে চলে এসেছি। তোমাদের বাড়ির দু'স্টপ আগে বাস থেকে নেমে গঙ্গার দিকে। 'বন্ধন' বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। আমি তিনতলায় থাকি। আসবে একদিন?
যাব। নিশ্চয়ই যাব।
এত সহজে রাজি হতে দেখে মনে হচ্ছে না, তুমি যাবে।
বিশ্বাস কর, আমি যাব। তোমাকে আমার দরকার আছে।
এতই যদি দরকার তো বল, কবে যাবে?
ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। এমনও হতে পারে, হয়ত অফিস ফিরতি পথে আজই গিয়ে হাজির হলাম। অফিসের কাজের ওপর নির্ভর করছে।
আজই চেষ্টা করে দেখ। আমি নাহয় বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখব। একসঙ্গেই ফেরা যাবে। ওকে?
ওক্কে।
সোমককে প্রায় প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ের পরেও কাজ করতে হয়। আজ তেমন কোনও কাজ ছিল না। তবু বাড়িতে ফেরার আকর্ষণ বোধ করল না। সুমৌলি না থাকায় অফিস থেকে ফিরলে পরিচারিকা পার্বতী হাত বাড়িয়ে ব্রীফকেসটা নেয়। জুতো মোজা অফিসের পোশাক গুছিয়ে রাখে। চা জলখাবার দেয়। রাতের বিছানা সাজিয়ে জলের গেলাস রেখে যায়। আবার সকালের চা নিয়ে এসে ঘুম ভাঙায়। স্ত্রী থাকতে পরিচারিকার কাছ থেকে এসব যত্নআত্তি পেতে অসহ্য লাগে। দীর্ঘশ্বাসে কোথায় পাব তারে আর্ত হাহাকার ওঠে।
আজ একুশ দিন হল, সেই যে সুমৌলি চলে গেছে তারপর আজ অব্দি দু'জনের মধ্যে কোনও ফোনাফুনি হয়নি। দু'বাড়ির মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এ বাড়ির সবাই যেন এক একটি নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো। ঘরগুলিকে আগেকার তুলনায় অনেক বড় বড় মনে হয়। শোওয়ার ঘরের সর্বত্র সুমৌলি-স্মৃতি ছড়ানো। বিছানায় এখনো ওর শরীরের গন্ধ। বালিশে সিঁদুরের চিহ্ন। রাত্রে একা শুয়ে নিজেকে সোমকের অসহায় দুঃখীজন মনে হয়। অনেক রাত অব্দি বিনিদ্র কেটে যায়। দুর্বল হয়ে পড়ে মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস ওড়ায়। পরমুহূর্তেই মনকে শক্ত করে। ভাবে, এবার চাই

শক্ত মনে মোকাবিলা। কিছুতেই আর অন্যবারের মতো অসঙ্গত প্রশ্রয়ে ওকে ফিরিয়ে আনতে যাওয়া নয়। দেখা যাক, ভালবাসার টানে নিজে থেকে ফিরে আসে কি না আসে।
সোমক অফিস ছাড়ল নির্ধারিত ছুটির এক ঘন্টা পরে। রাস্তায় নেমে দূর থেকে অবাক লক্ষ্য করল, সোনালি এখনও বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতীক্ষা-নজর এদিকে। সোমকের অদ্ভুত একধরনের আনন্দ হল।
সেই ছুটির পর থেকে এভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে! সংযত হেসে সোমক বলল, আচ্ছা মানুষ তো তুমি। অসীম তোমার ধৈর্য।
কেন জান?
কেন?
ওই যে তখন বললে, আমাকে তোমার নাকি দরকার আছে।
তেমন কিছু জরুরি না।
তা জানব কেমন করে? তাছাড়া, দরকারটা জানার জন্য কৌতূহল তো থাকবেই।
আজকেই যেতে হবে?
সেটা আমি বলব কোন্ অধিকারে? সোনালি দুষ্টুমিষ্টি হাসল, দ্বিধা সঙ্কোচ ভয় থাকলে না যাওয়াই বোধহয় ভাল।
সোমক নিরুত্তর। সোনালির চোখ দু'টির ওপর নিজের দৃষ্টি ফেলল। যেন চর্যাপদের হরিণীকে দেখতে পেল।

গঙ্গার কাছাকাছি শুনশান পরিবেশে সোনালির ফ্ল্যাটটা আকারে ছোট হলেও অত্যাধুনিক। সীমিত ক্ষমতায় সোনালি সাজিয়েছেও শৌখিন শৈল্পিক রুচিসম্মত। ঘরে ঢুকেই কাচের জানলার কপাটগুলি খুলে দিতে এখন ঘরময় গঙ্গার জল ছুঁয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস। প্রতিটি জানলার ফ্রেমে নদী নৌকা গাছগাছালি বসতবাড়ি ইত্যাদি নিয়ে এক একটি দৃশ্য।
তোমার মা কোথায়? সোমক জানতে চাইল।
পাশের ঘরে। পাঁচ বছর হল বিছানাতেই সব কিছু। সর্বক্ষণের জন্য কাজের মাসি আছে একজন। তেমন দরকার না থাকলে আমি ফিরে এসে ওকে ছেড়ে দিই। ভাবি, ওরও তো সংসার আছে।
তোমার মা-র কাছে যাব আমি?
এখন নয়। কাজের মাসি চলে যাওয়ার আগে মাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাচ্ছে। তুমিও তো ফ্রেশ হবে। আগে যাও। তারপর আমি ঢুকব।
অ্যাটাচ বাথরুমে ঢুকে সোমক আবারও অবাক। মেঝে থেকে স্কার্টিং অব্দি গোলাপী ডিজাইন মার্বেল বসানো। একদিকের দেয়াল জুড়ে টাইলস্-এ ফুটে উঠেছে পাহাড়ি ঝর্ণার দৃশ্য। অন্য দেয়ালে মানুষ সমান আয়না। দেয়াল অভ্যন্তরের কাচের তাকে সাজানো ভেনাসের মূর্তি শৌখিন প্রসাধনদ্রব্য। ফুলদানিতে নকল ফুল। পকেট ক্যাসেট রেকর্ডার। সফ্ট ড্রিংকস-এর বোতল গেলাস। কমোটের সুমুখের দেয়ালে ঝুলছে ছোট ফ্যানও।
সোমকের মনে পড়ে গেল, সুমৌলির আব্দার ছিল একটা ভাল বাথরুম বানিয়ে দেওয়ার জন্য। সোমক কথা দিয়েছিল, স্বপ্নের বাথরুম গড়ে দেব। তাতে বাথটব গিজারও থাকবে। থাকবে অবর্ণনীয় ব্যতিক্রম অনেক কিছু।
সোমক এখন গঙ্গামুখি এক চিলতে ব্যালকনিতে ফাইবার টুলে বসে আলো আঁধারি বাইরের দৃশ্য দেখছে। সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। সোনালি বাথরুমে। কাজের মাসি নিজ আবাসে।

সোনালি এলো অনেকক্ষণ পরে। অসাধারণ ট্রেতে একজোড়া শৌখিন চায়ের পেয়ালা আর স্ন্যাকস্ নিয়ে বসল দ্বিতীয় টুলে।
সোনালি এখন বর্ণময় পোশাক প্রসাধনে বিন্দুমাত্র মদালসা নয়। স্নান সেরে ছিমছাম সাদামাটা সেজেছে। চুলেতে শ্যাম্পু-সুবাস। সংলাপ দৃষ্টি হাসিতে রজনীগন্ধার স্নিগ্ধতা। তবু সোমক অভিভূত। সযত্ন লালিত সংযম-অর্গলগুলি ঈষৎ শিথিল হল।
তোমার ফ্ল্যাটটা কিন্তু দা-র-উ-ন। চায়ে চুমুক দিয়ে সোমক বলল, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছে দু'চারদিন থেকে যাই।
কিন্তু তা তো সম্ভব নয়।
কেন সম্ভবনয়? মা-কে তো এখনও দেখা দিইনি। কাজের মাসিকে যা হোক কিছু একটা পরিচয় দিলেই চলবে। না হয়তো ক'দিনের জন্য ছুটি দেবে।
আমার দিক থেকে তেমন কোনও অসুবিধা নেই যে ওকে ছুটিতে পাঠাতে হবে। তোমার পরিচয় গোপন রাখারও প্রয়োজন হবে না। তবু অসম্ভব কেন জান?
কেন?
আমি তেমনটি চাইছি না।
সোনালি কেন তেমনটি চাইছে না সোমক তা জানতে চাওয়ার মতো শক্তি খুঁজে পেল না। কিছুটা বিব্রত বিমর্ষ হয়ে ধন্দে পড়ল, তবে কি সোনালি বাগদত্তা?
তুমি না চাইলে থাকব না। সোমক সোচ্চার হেসে প্রসঙ্গ পাল্টালো, তারপর বল বিয়ে করছো কবে এবং কাকে?
বিয়ে করছি, আমি! সোনালি খিলখিল হেসে লুটোপুটি, কোথায় পেলে এমনতর খবর?
খবর পাইনি। কিন্তু করবে তো নিশ্চয়ই; এবং অনুমান, বিয়ের পরও মাকে নিয়ে এই ফ্ল্যাটেই থাকবে। ঠিক কিনা?
বিয়ে করে রুটিনমাফিক যুগলবন্দী দাম্পত্য জীবনের প্রতি এই মুহূর্তে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। বিয়ে করলে ভালবাসা থাকে না। দেখছি তো চারদিকে। সোনালি এক সময় আশ্চর্যরকম পাল্টে গিয়ে বলল, থাক ওসব কথা। আমাকে কি দরকার তাতো কিছুই বললে না।
সোমক সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বিবাহিত জীবনের টুকরো টুকরো কষ্ট-কথা শুনিয়ে গেল। সোনালি শান্ত নির্বাক। চোখ কান নিষ্পলক উৎকর্ণ। দীর্ঘক্ষণ।
তুমি কি ডিভোর্স নিয়ে ভাবছো কিছু? সোমক স্তব্ধ হতে সোনালি জিজ্ঞেস করল।
তাহলে তো হেরে যাওয়া হবে।
তবে কি ওকে নিয়ে আলাদা থাকবে?
সেটাও তো ওর জেদের কাছে হার মানাই হবে।
তাহলে?
আমি এখন স্নায়ু যুদ্ধরত। এই দুঃসময়ে দরকার তোমার সাহচর্য।
সেটা কিরকম?
আমি যে আর পারছি না। সুমৌলির অনুপস্থিতিতে ইন্দ্রিয় চঞ্চল সোমক স্বীয় তৃষিত ঠোঁট দংশন করে বলল, একমাত্র তুমিই আমাকে পদস্খলন থেকে বাঁচাতে পার।
সোনালি আশ্চর্য রকম নির্বাক গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবল, নিঃসঙ্গ সোমকের এইসময় অন্তত একজন প্রকৃত শুভার্থীর নিঃস্বার্থ-সঙ্গ প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরি। বিবাহ অথবা বিচ্ছেদ সবসময় শেষ পরিণতি নয়। ঘর তো অনেকেই ভাঙে। সে নাহয় ব্যতিক্রম হবে। সোমককে কিছুতেই নষ্ট হয়ে যেতে দেবে না। অন্ধকারে আলো ফেরাতে নিজে নাহয় সলতে হয়েই জ্বলবে।

প্রয়োজনের ঘর

অনিন্দ্য সুন্দরী সুতনুকা, যথার্থ কত নামে তোমাকে ডাকতাম তা মনে আছে?
কৃশকোটি মীন-নয়না সুনাসা সুনাভা সুকেশা তন্বী ...... আরও কত কী যে!
তুমি ছিলে নিবিড় নিতম্বা মদালসা হরিণ গতিময়ও বটে।
প্রথম সাক্ষাতের জায়গাটাকে কি বলব—ফ্যাশনেবল লেডি-কেয়ারি নাকি চাঁদবদনী হাট?
কি পোশাক ছিল না সেই ফ্যাশন প্যাশন পার্টিতে!
মিসেস আচারিয়া পরেছিলেন উজ্জ্বল বোম্বাই শাড়ি আর চোলি। ঘাড়ের কাছে হাত খোঁপা। গলায় ঝুলছিল লাপিস লাজুলির মালা।
মিসেস তেওয়ারীর অঙ্গে টেরিক্রেপের জাম্প-সুট। প্যাডেড কাঁধওলা জ্যাকেট। মিস্টার পি. পি. পাডুকনের মেয়ের নাম শিমপল হলেও পোশাকটা ছিল ফ্যানটাসটিক গ্লামারস। সাদা ঘের দেয়া ডেনিস স্কার্ট। ওপরে নীল রেশমি টপ। তাতে এমবসড্ এমব্রয়ডারি করা। পায়ে সাদা কোর্ট সু। পার্ম করা পিঠে ঢেউ খেলানো সোনালি চুল।
তোমার ক্লোজডদের মধ্যে রুকি সেজেছিল ঝিকমিক সালোয়ার কামিজ পোশাকে। কাঁধে ঝুলছিল কোঁচাদার টিসুর ওড়নি। পামেলা পরেছিল এথনিক রঙচঙা উজ্জ্বল লাং সোনালি লেহঙ্গা চোলি। সঙ্গে শিফন দো পাট্টা। হাত ভরা লাল সোনালি রেশমি চুড়ি। পায়ে লাল সোনালি রেশমি জুতো। ইশারা ইংগিতে চটুল চাউনির রমণী-সংখ্যা কি কম ছিল সেদিন?
তবু প্রথম দর্শনে একা তুমিই চিত্তহরিণী। তোমাকে ভাল লাগল। হৃদয় কাড়লে তুমি। তোমার পরনে ছিল নয়নসুখ ময়ূরকণ্ঠী মহীশূর ক্রেপের সরু সোনালি-পাড় শাড়ি। হাফ শ্লিভ ব্লাউজ হলেও বেআব্রু ছিল না পেট কোমর। এলো খোঁপায় গোঁজা ছোট্ট হলুদ ফুল চিনার। পাকা ধান-রঙ অঙ্গজুড়ে বাছাই করা মানানসই গয়নাগুচ্ছ। প্লাকড ভুরুর নিচে মৃগ নয়নে আইশ্যাডো। বিধুমুখি গালে ব্লাশারের আলতো ছোঁয়া। কমলাকোয়া ঠোঁটে লিপ-গ্লস। অনাবৃত মসৃণ হাতের আঙুলগুলি ম্যানিকিওর করা। কপালে আঁটা বিন্দি। পায়ে হাই হিল জুতো। আর ঠোঁটে ছিল দুর্বোধ্য ফ্লুওরোসেন্ট হাসি।
আমি জানতাম, আমার যেমন ক'জন বান্ধবী আছে তোমারও একাধিক বন্ধু থাকা সঙ্গত, স্বাভাবিক। কিন্তু ফাইনাল সেটেলমেন্টের আগে যাচাই করতে তো বেশ কয়েকটা বছর কেটে যায়। বিলকুল ভ্যাকেট পেতে গেলে নার্সিংহোম থেকেই এনগেইজড বুকিং দরকার।
সময়টা যদিও টপ কম্পিটিশনের, তো তাতে কী? তোমাকে পাওয়ার জন্য কোয়ালিফিকেশন কোয়ালিটিতে আমিও তো আপ টু দ্য মার্ক।
আগে তোমাদের ডাটা সম্পর্কে পাত্তা লাগানো দরকার মনে করলাম।
খুঁজে পেতে সময় লাগল না।
আলিপুরের বেলভেডিয়ায় সুদৃশ্য বাংলো টাইপের বাড়ি তোমাদের। চারদিকে মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলের ওপর তিন হাত উঁচু পলতা বাঁশের জাফরি বেড়ি। গ্রিলের সদর দরজার দু'ধারের স্তম্ভে গোল বাতি। ঝকমকে পেতলের নেমপ্লেটে লেখা, হারিণময় ডাট্ চৌধুরী।
নামী ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট হারিণময় বণিক সমিতির অন্যতম এক্সিকিউটিভও বটে।

একমাত্র সন্তান সুতনুকা তুমি মিশনারী স্কুল থেকে ফার্স্ট ল্যাংগুয়েজ ইংরেজিতে পাশ করে তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী।
কনজারভেটিভ টিপিক্যাল হাউস ওয়াইফের সঙ্গে হারিণময়ের সম্পর্কটা ছিল খাপছাড়া। কিন্তু সুতনুকা তুমি বাবার স্ট্যাটাস ম্যানার্সে প্রভাবিত বলেই ফ্রি মিক্সিং আর মিক্সড্ পার্টিতে উৎসাহী ছিলে। অভ্যস্ত ছিলে ক্লাবে ব্রেক ডান্স ডিসকোতে।
ক'জন বন্ধু মিলে উইক এন্ডে গোপালপুর অন-সীতে গিয়েছিলাম। সেখানে আবার তোমাকে দেখতে পেলাম। সম্পূর্ণ অন্যরূপে। সমুদ্রবেলায় বর্ণালি ছাতার তলায় বিকিনি পরা ম্যাট্রেসের ওপর আধশোয়া তুমি। চোখে রোদ-চশমা। লেমন জিনের গেলাস হাতে।
প্রেম ঈর্ষাহীন হয় কখনও! তোমার পুরুষ সঙ্গীটিকে ঈর্ষা করতে শুরু করলাম আমি।
আসলে তারুণ্য উচ্ছলতায় প্রেম প্রণয় ভাললাগা ভালবাসার তফাত্ খতিয়ে দেখতে শিখিনি তখনও। বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞানে ঝুঁকি নিতে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করার উন্মাদনা তখন ষোলআনা। ঘোর বা আচ্ছন্নতা থেকে জন্ম নিল দাবি। তোমাকে আমার চাই-ই চাই। তা সে যেকোনও মূল্যের বিনিময়েই হোক না কেন।
পাগলামি ছাড়া কিসের ভালবাসা?
ফর দ্য পোস্ট অব লাইফ পার্টনার আবেদন পত্রে লিখলাম:
আবেদনকারীর নাম—শ্রী বার্ণিক বসু।
পিতার নাম—ডঃ ডি. কে. বসু।
পিতার বৃত্তি—বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট। নিজস্ব নার্সিংহোম আছে।
পিতার ঠিকানা—বি বত্রিশ, বৈঠকখানা বাইলেন। কলকাতা-নয়।
(নিজস্ব বনেদি বাড়ি) ফোনঃ ২২৩৫-১৯০১।
মাতৃ পরিচয়—হাওড়ার কাসুন্দিয়া রোডের বিখ্যাত ব্যবসায়ী রায়চৌধুরী পরিবারের একমাত্র সন্তান। শ্রীমতি কণিকা বসু বর্তমানে গৃহবধূমাত্র হলেও পৈত্রিক বাড়ি ও কারখানার উত্তরাধিকারিণী।
আবেদনকারীর বয়স—ঊনত্রিশ বছর তিন মাস তের দিন।
উচ্চতা, স্বাস্থ্য—ছ'ফুট দু'ইঞ্চি। গুড ফিজিক (ডাক্তারি সার্টিফিকেট আবেদনের সঙ্গে যুক্ত)। ফেয়ার কমপ্লেকশন। স্মার্ট হ্যান্ডসাম ম্যানলি লুকিং। চার্মিং পার্সোন্যালিটির অধিকারী।
শিক্ষাগত যোগ্যতা—বি ই কলেজের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অন্তে পাঁচ বছর আমেরিকায় উচ্চতর শিক্ষালাভ।
বর্তমান বৃত্তি—বহুজাতিক সংস্থায় জোনাল একজিকিউটিভ। ফ্রি এয়ার কন্ডিশানড্ বাংলো, ফার্নিচার, গাড়ি, ফ্রিজ, ফোন, ল্যাপটপ ও অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হলেও পৈত্রিক বাড়িতেই বসবাসকারী।
অতিরিক্ত যোগ্যতা—আন্তঃ কলেজ টেনিস, রোয়িং এবং আন্তঃরাজ্য মোটর রেলিতে পুরস্কার বিজয়ী।
উল্লেখযোগ্য হবি—বই কালেকশন।
উল্লেখযোগ্য নেশা—ভ্রমণ। বইপড়া। খেলা দেখা।

সর্বাপেক্ষা প্রিয়—সঙ্গীত।
বর্তমানে কোন প্রেমিকা আছে কিনা—না।
ভাইবোন ক'জন এবং তাদের মধ্যে আবেদনকারীর স্থান—এক ভাই একবোন। বোন বিবাহিতা। আমেরিকায় অনাবাসী।
উপরোক্ত স্বীকৃতি/ঘোষণাপত্র সত্য। যদি ভবিষ্যতে কোনরূপ মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে বিবাহ খারিজ/বাতিল যোগ্য। রেজিঃ/সামাজিক উভয়মতে বিবাহে সম্মতি আছে। পাত্রী সম্পর্কে আমি সার্বিক যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়েই বিনা দ্বিধায় বিবাহ বন্ধনে আগ্রহী। যদি বিবাহ অন্তে বোঝাপড়ায় অসঙ্গতি দেখা যায় বা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ব্যর্থতা প্রকাশ পায় তার দায়ে ডিভোর্সে অসম্মতি নেই।
আশা করি, আমার আবেদনে সাড়া পাব। সাক্ষাৎকালে যাবতীয় জিজ্ঞাস্যর খোলামন জবাব দিতে প্রস্তুত রইলাম।
ধন্যবাদান্তে ইতি—
শ্রী বার্ণিক বসু।
ঝটিতি ইন্টারভ্যু-ফোন পেলাম। স্থান পার্কস্ট্রীটের 'কোয়ালিটি'। সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। পরস্পরকে কেমনভাবে চিনব তা তুমি বুঝিয়ে দিলে। যদিও আমার অচেনা ছিলে না।
সেই সন্ধ্যাটা ছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টির। সিঁড়ির মুখে তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম আমি। পরনে ছিল অফ হোয়াইট গোয়ালিয়র সাফারি। পায়ে আডিডাস ফ্লুওরোসেন্ট জুতো। হাতে দামি কোয়ার্টজ ঘড়ি। আঙুলের ফাঁকে পাঁচশ পঞ্চান্ন সিগারেট।
লাল মারুতি ড্রাইভ করে তুমি এলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে।
দারুণ সেজেছিলে তুমি। মিহি ঢাকাই জামদানি আকাশ-নীল শাড়ির সঙ্গে সোনার চুড়ি মুক্তমালায়। কানে কানবালা। আঙুলে মুক্তা-আংটি। ঘাড়ের কাছে কার্ল করা চুল। সারা শরীরে বিলিতি পারফিউমের সুবাস।
ওপরে টেবিল বুক করা ছিল। সিঁড়ি বেয়ে সেই টেবিলে দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। অনেক কথা হল। হাজার কৌতূহলী প্রশ্নের সপ্রতিভ জবাব দিলাম আমি। অনেকক্ষণ। অবশেষে এ্যাপয়েন্টলেটার হিসেবে পেলাম তোমার দেয়া লাল গোলাপ কুঁড়ি।
কাপে সুগার কিউর বদলে গেলাসে পড়ল আইস কিউবস্। পেগ আফটার পেগ। নেশা হচ্ছে না কিছুতেই। নেশা বলতে একটাই তখন—সেটা তুমি।
আমি বিল মেটাতে গেলাম। তুমি দিলে না। বললে, আজ তুমি আমার গেস্ট। অন্যদিন না হয় দেবে।
তারপর কতদিন কেটে গেল। একে অপরের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত।
বেশ কিছুকাল গোপন মেলামেশা চলল। গোপন প্রেম বড় মধুময় মনে হল।
পুরুষেরা ভাবালু কল্প-বিলাসী হয়। নিজেকে আমি ডানা মেলে উড়িয়ে দিতে ব্যস্ত। বাস্তবমুখি তুমি গভীরতায় বিশ্বাসী হয়ে স্থির আবদ্ধ হতে চাইলে।
তোমার গ্র্যাজুয়েশানের পর দু'জনের সম্পর্কটা আর গোপন রাখা হল না। কোন পক্ষের বাবা মা-র তরফে আপত্তির প্রশ্ন উঠল না। সামাজিক মতে মহা আড়ম্বরে আমাদের বিয়ে হল। হনিমুনে গেলাম। উচ্ছ্বাস আবেগ আড়ম্বরে একটি বছর জলবৎ তরল পার হয়ে গেল।

আমি কি তখন জানতাম যে, আড়ম্বরহীন প্রেমের গভীরতা বেশি! আসলে আমার ভালবাসা ছিল তোমার সৌন্দর্যময় দেহের প্রতি। তাই জৈব প্রণালীতে সেই সময় প্রাণ সৃষ্টি করতে চাইনি। অথচ, আমি ছাড়া তুমি ও আমার তোমার তরফের অভিভাবক শুভাকাঙ্ক্ষীরা একটি সন্তান চাইছিলেন। তোমরা মেয়েরা সবুর করতে পার না। ভাল লাগলেই ভালবেসে ফেল। ক'দিন যেতে না যেতেই বিয়ে করা চাই। বিয়ে হলেই সন্তান সংসার নিয়ে গিন্নিপনা। পতি পুরুষটির ওপর শর্তহীন প্রভুত্ব কায়েম করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও।

তুমিই বা ব্যতিক্রম হবে কেমন করে? পাল্টে যেতে থাকলে তুমি। আশ্চর্যরকম আবদ্ধতায় পেয়ে বসল তোমাকে। সর্বক্ষণ আমাকে সঙ্গে পেতে চাইতে। বাইরের জগতে একা ছাড়তে ভরসা পেতে না। মা-র সহচরী আর বাবার সেবিকা হয়ে উঠলে। কিচেন ঠাকুরঘর আর বাবার অবসর বিনোদনের দাবা খেলায় মেতে গেলে তুমি। তোমার মা-র মতো টিপিক্যাল হাউস ওয়াইফ হয়ে উঠলে।

এরকমটি আমি চাইনি। তোমাকে আভ্যাসিক বন্দী জীবন থেকে বাইরে আনতে চাইলাম। ইচ্ছাকৃত বদলি নিলাম অনেক দূরে। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে।

নদীর ধারে এয়ারকন্ডিশানড্ বাংলোটা পেয়েছিলাম কী দারুণ! পাকা সড়ক থেকে বাংলোর পথের দু'ধারে ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। গেট পেরিয়ে মোরামের পথের দু'ধারে বাহারি গাছের টব। কাটা ছাঁটা ঘাসের লন। আধানগ্ন-স্ট্যাচু। বাহারি কেয়ারিতে অনেক মরশুমি ফুল। ছাতা, বেতের চেয়ার টেবিল। নানা রঙের আলোয় ঝকমকে ফোয়ারা। বাংলোর কার্নিশে সার্চ লাইট। গেটে উর্দিপরা পাহারাদার। গাড়ি বারান্দায় এয়ারকন্ডিশানড্ টয়টো। মার্বেল সিঁড়ির দু'ধারে ব্রাসো পালিশ করা পিতলের টবে বনসাই ঝাউ। বাদামি বার্নিস পুরু দরজায় পিতলের কড়া নব্। দরজার কিছুটায় ঘসা কাচ বসানো।

মিউজিক—ডোর বেল বাজালে প্রথম জানান দিত এ্যালশেসিয়ান। সন্ত্রস্ত দারোয়ান আয়া বাবুর্চি হাউস কিপার।

ভেতরে ঢুকলে রিসেপসন লাউঞ্জ। মোজায়েক মেঝেতে নরম লোমশ কার্পেটে পা ফেললে শব্দহীন। রুম ফেশনারের সুবাস।

কি ছিল না সেই বাংলোয়? কনটেম্পোরারি পেন্টিং-এর সঙ্গে মিলিয়ে দামি পর্দা। রোজ উডের কারুকাজ করা পার্টিশান। ডিভান সোফাসেট তাকিয়া। দামি কাঠের ফার্নিচার। হুসেনের পেন্টিং। ঝাড় লণ্ঠন। বাঁকুড়ার ঘোড়া। মেটাল নটরাজ। ডোকরা ভাস্কর্যের ফুলদানি মার্বেল ছাইদানি। আধুনিক বেডরুম টয়লেট খেলনা ব্লক প্লে-রুম। ছোট্ট লাইব্রেরিতে রোজউডের বুক শেলফে বাংলা রচনাবলী। আগাথা ক্রিস্টি, সিডনি, সেলডেন, মিলস এ্যান্ড বুনস্-এর বই। এনসাইক্লোপিডিয়া সেট। প্রাইভেট বারে টেপডেক ভিডিও ভিসিপি আর বিলিতি মিউজিকে ক্যাসেটকরা শোকেস। তোমার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত ঘরটাতে ছিল পিয়ানো অর্গান এ্যাকোরিয়াম আর দোলনা। ছিল হট লাইন কানেকশান ইন্টারকম। আরও কত কী যে!

অথচ আশ্চর্য! কলকাতার পুরনো আমলের আমাদের পৈত্রিক বাড়িটা ছেড়ে তুমি কিছুতেই আমাকে সর্বক্ষণ সঙ্গ দিতে এলে না। সেকেলের মতে শ্বশুর শাশুড়িকে ছেড়ে আসা সঙ্গত মনে করলে না। বাবা মা তোমার আমার দিকটা একবার চিন্তা করলেন না। বরং তোমার আচরণে খুশিই হলেন। জানিনা, এটাকে স্বার্থপরতা বলা যায় কিনা।

আমি তো বিয়ের আগেকার নির্জন উচ্ছলতা ফিরে পেতে চেয়েছিলাম। প্রত্যেক পুরুষই তেমনটি আশা করে থাকে। স্বার্থ ঈর্ষা আমারও ছিল। গভীর ভালবাসায় ওসব থাকেই। ভালবাসার ঘোর আচ্ছন্নতা থেকে অধিকারের দাবি তুলে ধরতে তুমি সক্রেটিসকে কোট করে জবাব দিলে, আমাদের উচিত উচ্চ আদর্শের জন্ম দেয়া। যুগ্ম মননশীলতার যুগল চিন্তার ফসল ফলানো।
আমি বললাম, স্বামীর সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জনেই স্ত্রীর প্রকৃত ভালবাসার প্রকাশ। তোমার আবেগটা আমার দিকে নাহলে কিসের ভালবাসা?
তোমাদের ভালবাসা বিস্তৃত হলেও অগভীর। অসুস্থ। প্রেমের মৃত্যু চাই না আমি।
আবার কার কথা কোট করলে তুমি, জানিনা। কথাটা যে তোমার নয় সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। আমিও প্রেমের মৃত্যু চাইলাম না। ভাবলাম, অদর্শন অতিদর্শনেও তো প্রেম নষ্ট হয়। তারচেয়ে এই যে মাঝে মাঝে ক'দিনের জন্য এসে থেকে যাও মন্দ কি।
বাবার অসুখের সময় থেকে সেই যাওয়াটা কমতে কমতে একসময় বন্ধ হয়ে গেল। আমার অপরাধটা কোথায়? আমি চেয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে আমার বাবা মা ওঁদের ছেলের কাছে এসে থাকুন। সন্তান হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করায় সুযোগ পাব।
বাবা মা রাজি হলেন না। তুমিও ওঁদের সঙ্গে সহমত হলে। আমার জায়গাটা দখল করে বসলে তুমি। সন্তান হিসেবে ওঁদের হৃদয়ে আমার শূন্যতার পরিপূরক হয়ে উঠতে চাইলে।
প্রাইভেটে অনার্স পাশ করে এম.এ কমপ্লিট করলে। তারপর ডক্টরেট হলে। অদ্ভুত সাবজেক্টে। স্বাধীনতা আন্দোলনে পতিতাদের ভূমিকা। থিসিসটা বিজ্ঞাপনের ঢাকঢোল পিটিয়ে বই হয়ে বের হল। সমালোচকরা শংসায় সোচ্চার, মুখর।
আমার জন্মদিনে লোক মারফত ফুল মিষ্টি আর এক কপি বই পাঠিয়েছিলে তুমি। লোক মারফত কেন—আমি কি এতটাই ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য?
প্রচ্ছদের ভারি মলাট সরিয়ে অবাক বিস্মিত হলাম। আমার নামেই উৎসর্গ করেছো বইটা। একী ভালবাসা!
বইটা আমি আজও পড়িনি। পড়তে গিয়ে ওই উৎসর্গ পাতাতেই চোখ স্তব্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে চুপচাপ থাকি।
কত বছর হয়ে গেল বল? তুমি আমি কেউই বিচ্ছেদ চাইনি, অথচ বিযুক্ত আছি। বিয়েটা নাম মাত্র হয়ে রইল। ত্যজ্যপুত্র না হলেও জন্মসূত্রে এখনও বাবা মা-র সন্তান আমি। কলেজে অধ্যাপনা করে প্রকৃত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছো তুমি। হৃদরোগে অক্ষম বাবার চোখে ছানি। বৃত্তিতে অকর্মণ্য তিনি। বেশি বয়সের বাতবেদনায় মা আমার পঙ্গু।
তোমার অসাক্ষাতে কতবার সাহায্যের হাত বাড়াতে গেছি। বাবা মা ফিরিয়ে দিয়েছেন। সব অপরাধ নাকি একা আমার। সে অপরাধের ক্ষমা নেই। ক্ষমা করতে পার একমাত্র তুমি।
কিসের জন্য ক্ষমা চাইব? নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছো তুমি। একটার পর একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে বৃত্তি নিয়ে অপমান করতে চেয়েছো কাকে? মাথা নুইয়ে আমি যাইনি। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পর কি মনে হচ্ছে জান?
'তুম মুঝে ভুলভি যাও এ হক্ হ্যায় তুম্ কো,
মেরি বাৎ ঔর হ্যায় ম্যায়নে তো মুহব্বৎ কি হ্যায়।'

আমাকে ভুলে যাওয়ার অধিকার অবশ্যই তোমার আছে। তবু শেষ কথা শোন, তোমাকে সত্যিকারের ভালবেসেছি বলেই এখনও ভুলতে পারিনি।

শ্রী বার্ণিক বসু
সমীপে
সুপ্রিয়,
দুর্মর দুর্বিনেয় তোমাকে জিষ্ণু নামে কেন ডাকতাম তা দেখছি আজও বুঝতে শেখোনি। তাই তো আরও লেখাপড়া শিখে বৃত্তি নিয়ে আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যে তোমাকে অপমানিত করার ইচ্ছা খুঁজে পেয়েছো।
শাহীর লুধিয়ানভীর শের দিয়ে চিঠিটা শেষ করতে গেলে কেন? অনায়াসে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'প্রিয়তমাসু' কোট করতে পারতে।
'শেষ কথা কেউ জানে?
কথা যে ছড়িয়ে আছে হৃদয়ের সব গানে, সবখানে;
তারও পরে আছে বাঙময় নীরবতা।
এবং তুষারমৌলি পাহাড়ে কুয়াশা গিয়েছে টুটে;
এবং নীলাভ রৌদ্রকিরণে ঝরে প্রশান্ত ক্ষমা,
এবং পৃথিবী রৌদ্রকে ধরে প্রসন্ন করপুটে।
দ্যাখো, কোনোখানে কোন বিচ্ছেদ নেই;
আছে অনন্ত মিলনে অমেয় আনন্দ প্রিয়তমা।'
তুমি বলেছিলে, সত্যিকার ভালবাসায় প্রিয়ের দেয়া শত আঘাত অপমান ব্যথা সুখের ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। কথার আর উপলব্ধি অনুভবে তফাত দেখছি অনেক। আমার ধারণা, মিলনের ব্যক্তিকে অদেখার দূরত্বে রাখলে যে বিরহ জাগে তাতে ভালবাসার মনের প্রকাশ পাওয়া যায় জগত জুড়ে। তাই তো এখনও তুমি আমার সুপ্রিয়।
ভলতেয়ার বলেছিলেন, দু'টি সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিসম্পন্ন সৎ মানুষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হল বিবাহ। বিয়ের পরেই আমরা দু'জনে বুঝলাম, আমাদের বিয়েটা তেমন ছিল না।
তোমরা পুরুষরা চাও একই নারীকে পরস্পর বিরোধী নানা গুণের অধিকারিণী রূপে পেতে। তোমার বাইরের জগতে আমাকে চেয়েছিলে সার্বিক মডার্ন স্মার্ট হিসেবে। সেই আমাকে ঘরে ফিরে আশা করলে, নম্র বিনয়ী স্নিগ্ধ গৃহিণী রূপে। পূজার্চনার প্রাঙ্গনে ভাল লাগত পূজারিণীর বেশে। মদের আসরে ইয়ার দোস্ত আর রাতের শয্যায় বেলজ্জ বেশ্যার ভূমিকায় চাইতে আমাকে। তা হয় কখনও? একমাত্র অবাস্তব উপন্যাস আর রুপালি পর্দার নায়িকার পক্ষেই তা সম্ভব। আমার বাবা মা-র মধ্যেও এই নিয়ে বিরোধ ছিল। কিন্তু সাংসারিক জীবন ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের।
তুমি ছিলে আপোশ সমঝোতা বিরোধী। অধিকার ছিনিয়ে নিতে উৎসাহী। প্রভুত্ব কায়েম করায় বিশ্বাসী। নিজের ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য মানবিকতা বিসর্জন দিতে রাজি।
প্রথম দর্শনের দিনটা মনে আছে দেখছি। কি ছিলাম তখন আমি? সেই আমি বিয়ের পর নতুন জগত আবিষ্কার করেছি তোমার মা বাবার সান্নিধ্যে এসে। ওঁদের কাছে যথাযথ নারীর মর্যাদা

পেয়ে আমি অভিভূত। নারীর শিক্ষা প্রয়োজনের তাৎপর্য ওঁদের কাছ থেকেই বুঝতে শিখেছি। আত্মসম্মানবোধের জাগরণও ওঁদের প্রেরণাতেই।
ওঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাই তুমি তোমার বাবা মা-কে ছাড়তে পারলেও আমি পারিনি। ওঁদের কাছে তোমার বিকল্প হয়ে গেছি।
ঈর্ষহীন প্রেম ভালবাসা হয় কখনও? তোমার বাংলোয় যখন মাঝেমধ্যে ক'দিনের জন্য যেতাম, তখনই হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম যে, তোমার ঘরে নিত্য নতুন নারীর যাতায়াত আছে। বিবাহিত পুরুষের গোপন প্রেম আর একাধিক নারীর দেহসম্ভোগ আমার কাছে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। কিন্তু পামেলার গর্ভে তোমার সন্তান বাড়ছে জেনে ঈর্ষা হয়েছে বৈকি।
যেহেতু আমাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়নি, তাই সামাজিক বা আইনসিদ্ধমতে পামেলাকে তুমি বিয়ে করোনি। অথচ, সে তোমার স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছে ষোলআনা। তোমার ভাবী সন্তানের জননী। ঈর্ষা করব না!
সন্তান লাভের জন্যই তো শাস্ত্রকাররা স্ত্রীসঙ্গের বিধান দিয়েছেন। আমিও তো তাই সন্তান চেয়েছিলাম। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাসক্ত তুমি তখন সন্তান চাওনি।
আমার সব আশা তখন সাংসারিক সুখদুঃখে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমিষভোজ মদ পান আর নারীদেহই তোমার চির-ঈপ্সিত। নারী সম্ভোগকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করছো। ঘোর বা আচ্ছন্নতায় লজ্জা ঘৃণা ভয় ন্যায় অন্যায় বোধহীন হয়ে পড়ছো। তোমার ভালবাসা বাইরের সৌন্দর্যপ্রিয়তায়। আমি কিন্তু সুন্দরের জন্মই চেয়েছিলাম। সৃষ্টির চেয়ে সুন্দর হয় কিছু?
পামেলার গর্ভে তোমার পুত্রসন্তান হল। এবাড়ির সব কিছুর উত্তরসূরী এলো। সংবাদটা প্রথম আমিই, তোমার মা বাবাকে দিলাম। ওঁরা বিন্দুমাত্র খুশি হলেন না। নাতির মুখ দেখতে গেলেন না পর্যন্ত।
সেই সময় বেশ কয়েকবার এখানে এসেছিলে তুমি। অনেক অনুরোধেও ওঁদেরকে নিয়ে যেতে পারনি। কলকাতায় বদলি নিয়ে এ বাড়িতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে। আমার মুখ চেয়ে নৈতিকতার প্রশ্নে ওঁরা তোমাকে আমল দেননি। শ্রদ্ধা ভক্তিতে ওঁরা হয়ে গেলেন আমার প্রেয় সাধুসঙ্গ। প্রধান গুরু। পরমানন্দ প্রাপ্তি আর পারত্রিক সুখ ভোগী হয়ে উঠলাম আমি।
কলকাতায় বদলি নিয়ে সল্টলেকে এসে উঠলে তুমি। প্রায়ই ফোন করতে এখানে। কোন কোন দিন হয়ত ফোনটা আমিই ধরতাম। দু'জনের মধ্যে কোন কথা হতো না। যাঁদের কাছে ফোন করা রিসিভারটা ওঁদের হাতে দিয়ে দিতাম।
বাবা মা ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ধৈর্যশীল নিরপেক্ষ নিয়মনীতিনিষ্ঠ ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সৌজন্যমূলক কথাবার্তাটুকু শুধু বলতেন। ওপার থেকে তোমার কোন অনুরোধই ওঁদের মন, হৃদয়ের দৃঢ়তায় ফাটল ধরাতে পারত না।
একবার তোমাকে ফোনে বাবা বলছেন শুনলাম, একদিন আবেগ আতিশয্য অপচয়ে শরীর নষ্ট হবে। ক্লান্তি অবসাদ ব্যাধি আসবে। ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্য। কাম্য বিষয়ের উপভোগে কখনও কামের উপশম হয় না খোকা।
অন্য একদিন মা বলেছিলেন, সংসারে তোদের মতো পুরুষদের কোন স্ত্রীই সুখী করতে পারবে না। তুই চিরকাল নিজের ধারণা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই আবদ্ধ আছিস। অপরের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে চাস না।

কাজেই সমাধান কি করে সম্ভব? আমাদের একমাত্র শর্ত, তনু বউমার কাছে নিঃশর্ত মার্জনা চেয়ে নে। ভালবাসা তো ত্যাগের সাধন, বউমা তোকে এখনও ভালবাসে।

মা ঠিকই বলেছিলেন, জাগতিক বন্ধন ছিন্ন হলেও ভালবাসার বন্ধন তো রয়েই গেছে। স্থূল দৃষ্টিতে এই ভালবাসা দেখা যায় না। অনুদ্বিগ্ন অভিযোগবিহীনরাই ঐশ্বর্যবান হয়ে থাকে। আমার কোন অভিযোগ ছিল না। আমি তখন স্থিতপ্রজ্ঞ। দুঃখে উদ্বেগ, সুখে স্পৃহা নেই। আত্মীয়জনে সীমাবদ্ধ মায়ার পরিবর্তে সর্বভূতে দয়া দেখানোর দীক্ষা গ্রহণ করেছি। সময় সুযোগ পেলেই বেলুড়মঠ আর মাদার টেরিজার চ্যারিটি হোমে যাই।

তুমি তখন মার্জনা চাওয়া তো দূরের কথা, ফোন ধরলে সৌজন্যটুকু পর্যন্ত দেখাওনি।

তোমার ছেলে বড় হয়ে উঠল। অন্নপ্রাশন হোল। নার্সারিতে ভর্তি করে দিলে। সেই ছেলে একদিন নয় ক্লাসে উঠল।

এই পর্যন্ত তোমার ছেলে সৌজন্যর ফটো আমি দেখেছি। মা বাবাকে পাঠিয়েছো। সেই এ্যালবাম থেকে।

ততদিনে পামেলা তোমার কাছে জীর্ণবসন। তোমার আসল চেহারাটাও ওর কাছে ধরা পড়ে গেছে। সেই যে মা বলেছিলেন যে, তোদের মতো পুরুষকে কোন স্ত্রীই সুখী করতে পারবে না। পামেলাও পারছিল না বলে দু'জনে বনিবনা ছিল না। পামেলা মানসিক অসুখে ভুগছিল।

তারপর হঠাৎই একদিন সেই দুঃসংবাদটা এসেছিল। আকণ্ঠ পান করে সেই যে ঘুমিয়েছিল আর জাগেনি পামেলা।

মা আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন হয়ত। তাই মন্তব্য করেছিলেন, আপদ গেছে। মা-র তুলনায় বাবা আমার হৃদয়মনের উদারতা বেশি বুঝতেন। তাই দূরদর্শী ভবিষ্যতবাণী শোনালেন, তোমার বোধহয় আরও একটি দায়িত্বের বোঝা বাড়বে তনুমা।

এ বাড়ি থেকে কেউই তোমাদের শোক সময়ে উপস্থিতির প্রয়োজন বোধ করলেন না, হলেওবা আমি তোমার সমব্যথী, কিন্তু যাই কেমন করে! তাছাড়া, ওখানে আমার পরিচয় কি হতো? গোপনীয়তা প্রকাশ পেলে তোমার সুনাম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

সৌজন্যর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই চিন্তায় রইলাম। মাস অন্তে তুমি আরবদেশে বদলি কাজে যাওয়ার আগে সৌজন্যকে ওর দাদু দিদার কাছে রেখে গেলে। কার ভরসায় বলতে পার?

এই বাড়ি আর বংশের উত্তরসূরীর দায়িত্ব দ্বিধাহীন হাসি মুখেই গ্রহণ করলাম। এখান থেকেই সৌজন্য ভাল রেজাল্ট করে শিবপুর বি.ই কলেজের হোস্টেলে গেল।

আরব দেশ থেকে তুমি ফিরে আসার ঠিক দশদিন পর প্লেন ক্রাশে আমার নিজের মা বাবা একত্রে মারা গেলেন। ওঁদের দগ্ধ শরীর দু'টোকে বোম্বাই থেকে এখানে আনা হল না। আমার সম্মতি নিয়ে ওখানেই শেষকৃত্য করা হল।

ওঁদের মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ ফলাও করে প্রতিটি দৈনিক কাগজে বেরিয়েছিল। এখানকার বণিকসভার তরফে শোক পালনের খবরও ছিল। আমার ফটোসহ যে ইন্টারভ্যু ছাপা হয়েছিল তাতেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সমস্ত বিষয় আশয় নারীকল্যাণে উৎসর্গ করার বাসনা ঘোষণা করেছিলাম। এইসব সংবাদ নিশ্চিত তোমার নজর এড়িয়ে যায়নি। তবু বিন্দুমাত্র তোমার সৌজন্যমূলক আচরণ দেখতে পেলাম না। অথচ আশ্চর্য! ছেলের নাম রেখেছো সৌজন্য।

তোমার সৌজন্য এখন ওর পিসি প্রীতির কাছে আমেরিকায়। সম্ভবত জন্মভূমি এদেশে আর ফিরবে না।
সৌজন্য আমাকে মনে রেখেছে কিনা জানিনা। প্রীতি মাঝে মধ্যে বাবা মা-কে চিঠি ও ভেট পাঠায়। সেই সঙ্গে সৌজন্যর ফটো ও খবরাখবরও থাকে।
সল্টলেকে সুন্দর নিজের বাড়ি করেছো তুমি। গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে বাবা মা-কে নিতে এসেছিলে। আমাকে বাদ দিয়ে ওঁরা যাননি। ওঁদের বক্তব্য ছিল, লক্ষ্মী ছাড়া কিসের আবার বাড়ি! সেখানে না থাকে শান্তি, না থাকে শ্রী।
সম্ভবত পুরুষ শাসিত সমাজের ভ্রান্ত অহংবোধ তোমাকে মাথা নোয়াতে দেয়নি। তাহলে আজ এতবছর পর চিঠি লেখা কেন? কারণ, আজ তুমি নিঃস্ব নিঃসঙ্গ। যৌন অশুচিতায় অসৎ। বিশ্বস্ততায় অপরিচ্ছন্ন।
অথচ আমি? আমি তো বসুন্ধরা। দেহ আমার নিজস্ব। পুত্রহীনা আমি তোমাদের তথাকথিত ধর্মীয় ক্ষেত্রজ প্রথায় যেকোন পুরুষেরই সন্তান ধারণ করতে পারতাম। তোমাদের ধর্মসূত্রের কথা, বিবাহিতা পরোপভুক্তা হলেও মাস অন্তে শুচি বলে গণ্য। আমার নিজস্ব অভিমত, সতীত্বের চেয়ে নারীত্ব অনেক বিস্তৃত, বড়।
তবু আমি শুচি সতী বিশ্বস্ত আছি কেন জান? নিশ্চিত তোমার মুখ চেয়ে প্রতীক্ষায় নয়। কোন আশায় থাকব! আমি তো জানি, ক্ষেত্রটিতে ফসল ফলানোর মতো বীজ তুমি আর নও। কাজেই যে দু'টি সন্তান আমি পেয়েছি ওঁদের হারাতে চাই না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাচ্ছে আর ওঁরা ক্রমশ বাবা মা থেকে সন্তান হয়ে উঠছেন। মরার আগে নিশ্চিত শিশু হয়ে যাবেন একদিন। তখন আমি পরিপূর্ণ মা হয়ে উঠব। সন্তানের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতে গেলে নিজেকেও শ্রদ্ধার যোগ্য করা দরকার আমার।
তোমার শাহীর লুধিয়ানভীর শের কোট করে দোহাই তোমাকে—
'চলো একবার ফিরসে আজনবী বন যায়ে হাম দোনো।
না ম্যায় তুমসে কোই উম্মীদ্ রাখুঁ দিলনবাজীকী।
না তুম্ মেরে তরফ্ দেখো গলৎ আন্দাজ নজরোঁসে
না মেরে দিল্‌কী ধড়কন্ লড়খড়ায়ে মেরী বাতো সে।
না জাহির হো তুমহারী কশমকাশ কা রাজ নজরোঁসে।'
চলো আমরা আবার অপরিচিতর পর্যায়ে চলে যাই। তোমার কাছ থেকে কোন সমবেদনা প্রত্যাশা থাকবে না আমার। তুমিও ভুলচোখে কোনদিন আমার দিকে তাকাবে না। বিন্দুমাত্র বুক ধুকপুকানি দুর্বলতা ধরা পড়বে না আমার কথায়। হৃদয়ের কোন দ্বন্দ্বাভাস প্রকাশ পাবে না তোমার চোখে। সজাগ নিস্তব্ধতায় আলোর প্রকাশ। নির্বাক নীরবতায় মনের বিশ্রাম চাই আমার।
'জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে চলে যাবে।'

আলোছায়া

বিভাসের ফোন এসেছে, কথা বলছে। বন্যা কাছেই দাঁড়িয়ে। কথোপকথনে অনুমান করতে পারছে ওপারে কে। নিশ্চিত এলা হবে।

এলা বিভাসের কলেজ-বান্ধবী। তিরিশ বছর আগেকার। যোগাযোগ ছিল না। সম্প্রতি বিভাস ধানবাদ থেকে কলকাতার অফিসে বদলি হয়ে আসার পর বি বা দী বাগে ফের দেখা। এলার স্বামী সুকান্তও বিভাসের সতীর্থ ছিল। অকালে মারা গেছে। এলা ওর চাকরিটা পেয়েছে। বি বা দী বাগে।

বিভাস রিসিভারটা রাখল। কিছুটা চিন্তিত মনে হল।

কার ফোন? বন্যা ওর অনুমান সঠিক কিনা যাচাই করতে চাইল।

এলার। বিভাস নিস্পৃহ জবাব দিল।

আমারও তাই মনে হয়েছিল।

এলা প্রায়ই ফোন করত। ফোনেতেই বন্যার সঙ্গে আলাপ পরিচয়। সৌজন্যের খাতিরে বলতেই হতো আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে। সেই সাধারণ সৌজন্যমূলক আমন্ত্রণে এলা এ বাড়িতে প্রথম এলো। আপ্যায়ন আন্তরিকতায় বন্যার কোনও খামতি ছিল না। এলা অবিভূত। বলেছিল, এমন কাছে টেনে আপন করে নেয়া ব্যবহার আজ পর্যন্ত কোনও বন্ধুপত্নী বা পতির কাছ থেকে পাইনি। তোমার মনটা খুবই স্বচ্ছ উদার। রান্না অতুলনীয়। শান্তিনিকেতনী পরিবেশে তোমাদের এই ছোট্ট বাড়িটা যেন কবিতার মতো। বিভাস বলেছে কিনা জানিনা, জানতো আমি এককালে কবিতা লিখতাম। গান গাইতাম। আরও অনেক কিছু পারতাম।

ছেড়ে দিলেন কেন? বন্যার মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়েছিল স্বাভাবিকমতো। প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অন্যরকম। এলা দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে সুকান্তর মৃত্যুর পরবর্তী সময়কার জীবন সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শুনিয়েছিল। সবশেষে বলেছিল, খুব শিগ্‌গির আমার মেয়ের বিয়ে দেব। আগাম নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। যাবে কিন্তু।

নিশ্চয়ই যাব। বন্যা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে যুক্ত করেছিল, অবশ্য যদি আপনার বন্ধু নিয়ে যায়।

এ বাড়িতে এলা দ্বিতীয়বার এসেছিল ওর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে। সেবারও দুপুরের খাবার খেয়েছিল। অনেকটা সময় আনন্দ উচ্ছল খুশি ঝলমল কাটিয়েছিল। শীতের নরম রোদ্দুরে মরশুমি ফুলের বাগানে বসে দু'খানা রবীন্দ্রসঙ্গীতও গেয়ে শুনিয়েছিল।

গলা তো আপনার বেশ ভালই। বন্যা তারিফ করে বলেছিল, মেয়ের বিয়ের পর আপনি তো সব সমস্যামুক্ত হয়ে যাবেন। আবার গানের চর্চা শুরু করুন।

ইচ্ছা তো আছে। এলা ওর দ্বিতীয় ইচ্ছাটা জানিয়ে বলেছিল, নতুন করে কলমও ধরব ভাবছি। কিন্তু কতদূর কি পারব জানিনা। কেননা, আরও একটা দায়িত্ব যে আছে। সেটা হল সুকান্তর রুগ্ন মা—আমার শাশুড়ি ঠাকুরণ।

এলার মেয়ের বিয়েতে শেষ পর্যন্ত কারও যাওয়া সম্ভব হয়নি। কেননা, একই দিনে বিভাসের বড়দার ছোট মেয়ের বিয়ের দিন পড়েছিল। তবু, তৃতীয়বার এলা এ বাড়িতে এসেছিল। আক্ষেপ করে বলেছে, চেয়েছিলাম আমার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে পুরনো বন্ধুরা সবাই আবার একত্রিত হব। আশ্চর্য রকম হতাশ করেছে সবাই। কেনযে কেউ এলো না।

কাকে কাকে নেমন্তন্ন করেছিলে তুমি? বিভাস কৌতূহলী প্রশ্ন করল।
আমাদের আড্ডার প্রায় সবাইকে। এলা নামগুলি মুখস্থর মতো বলল, বিজয়েশ প্রবাল মনীশ দিব্যেন্দু নীরা কাকলি অতসী প্রভা সীমা এবং তোমাদেরকে।
এদের ঠিকানা জানলে কেমন করে? বিভাসের প্রশ্নে রীতিমতো বিস্ময়।
এরা প্রায় সবাই মোটামুটি বিখ্যাত এখন। নামেতেই যথেষ্ট। ঠিকানা ফোন নম্বর যোগাড় করা মোটেই অসাধ্য ব্যাপার কিছু না। প্রত্যেককে গিয়ে নেমন্তন্ন করতে পারিনি অবশ্য। যেখানে যেতে পারিনি ডাকে কার্ড পাঠিয়ে ফোনে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কেউই আসবে না বলেনি, অথচ—

বিভাস কথার রেশ ধরেই বলল, অথচ এলো না তাই তো! আমি জানলে তোমাকে বারণ করতাম। কেননা, আমি জানতাম ওরা কেউই আসবে না।
সেটা কেমন করে?
অভিজ্ঞতায়। যুগের পরিবর্তিত হাওয়ায় ওরা সকলেই এখন বৃত্তিগত বৃত্তবাসী। প্রয়োজন ভিত্তিক বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তুমি এখন ওদের কাছে কে?
এতটা ভেবে দেখিনি। সত্যিই বোধহয় আমি অহেতুক আশা করেছি। তাই দুঃখ পেতে হয়েছে। এতটাই বোকা আমি।
আসলে সরল সোজা সাদা মনের মানুষরা পদে পদে ঠকে, তাই অনেকে এদেরকে বোকা ভাবে। আমি সেই দলে নেই। তবে তুমিও শিগ্‌গির পাল্টে যাবে বলে মনে হচ্ছে।
কি যা তা বলছো। অবিশ্বাসী এলার ঠোঁটে তাচ্ছিল্য, এই বয়সে মানুষের মন মানসিকতা পাল্টায় নাকি। যেমন আছি তেমনটিই থাকব।
হয়তো থাকতে; যদি বৃত্তিহীনা গৃহবধূ তুমি সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে চাকরির জগতে না আসতে। ঠকে শিখে পাল্টাবে বৈকি।
চাকরিতেতো কম দিন হল না। পাল্টেছে কিছু?
না পাল্টালে আমার এখানে আসতে কী?
তাতে কি তোমার আপত্তি আছে? তাহলে আর আসব না।
ছিঃ, এমনটি ভাববেন না। আবহাওয়া অন্যদিকে মোড় নিতে দেখে বন্যা বলেছে, আপনার যখন মন চাইবে চলে আসবেন। কিন্তু ফোন করে জেনে আসবেন, আমরা আছি কিনা। নইলে অতদূর থেকে এসে ফিরে যেতে হলে কষ্ট পাবেন।
আসব। কিন্তু তার আগে আপনি ছেড়ে আমাকে তুমি বলতে হবে।

এই মুহূর্তে বন্যার মনে হচ্ছে, এলা বোধহয় এখনও উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু বদলায়নি। তাই বিভাসকে জিগ্যেস করল, তোমার বান্ধবী আজ আবার আসবে নাকি?
সেটাই জানতে চাইল। সঙ্কোচের সঙ্গে বিভাস বলল, ফোনে জানতে চাইল আজ ও এলে আমাদের কোনও অসুবিধা আছে কিনা।
কি বললে তুমি?

কাছে দাঁড়িয়ে সবইতো শুনলে। বিভাসের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি, আজ শনিবার তোমার বারের উপোস। সকলেই নিরামিষ খাই। তাছাড়া, সপ্তাহে একদিন বাজারে যাই। সেই দিনটা হলো রবিবার। এত কিছু জেনেও কেউ যদি বলে, নানা কারণে মনটা ঠিকঠাক নেই। নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে কিছুটা সময় কাটানোর ইচ্ছা হতে তোমাদের বাড়ির কথাই প্রথম মনে এলো। খাওয়াটা কোনও ব্যাপারই না। এতবার যাওয়ার পরেও পর পর ভাবছো কেন ? আমার জন্য আলাদা কিছু রাঁধতে হবে না।

তাই তুমি রাজি হয়ে গেলে। বন্যা অখুশি মনে বলল, টুম্পার পরীক্ষা সামনে সেটা ভাবা দরকার ছিল। বাড়িতে কেউ এলেই তার সঙ্গে ওর মেতে যাওয়া অভ্যেসটাতো তোমার অজানা নয়।

এর আগেও একবার আসতে চেয়েছিল। আমাদের যেন কি একটা অসুবিধা ছিল বলে আসতে পারেনি। এবারও আসতে বারণ করলে সেদিনের অসুবিধাটা আজ অবিশ্বাস করতে পারে। নিরামিষেওতো নানারকম রান্না হয়। আজ একটাও তেমন আইটেম নেই।

অত ভেবে লাভ নেই। বিভাস তুড়ি মেরে সব সমস্যা দ্বিধা খচখচানি উড়িয়ে লঘু কথা বলল, সেকেলে বিধবা হলে কত কষ্ট পেত। টুম্পার কোনও ডিসটার্ব হতে দেব না। খাওয়ার সময় ছাড়া বাকিটা ওকে নিয়ে বাগান আর ড্রইং রুমে কাটিয়ে দেয়া যাবে।

সময়টা এখন শীতের। মিষ্টি রোদ্দুর। প্রকৃতির লাবণ্যময়ী রূপ। বাগানে মরশুমি ফুলের মেলা। গান কবিতাপ্রেমীদের ভাল তো লাগবেই। এলার মতো মহিলারা বারবার আসতে চাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা খোঁজার অর্থ হয় না।

বাগানে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে এলা নানা দুঃখ কথা শোনাচ্ছিল। বিভাস আর বন্যা শ্রোতা হলেও একদম নীরব থাকছে না। এলার দুঃখটা সব চাইতে বেশি এককালের ঘনিষ্ঠ কলেজ বন্ধুদের আচরণ নিয়ে।

বিভাসের এসব শুনতে আদৌ ভাল লাগছে না। তাই একসময় ধৈর্য হারিয়ে বলল, আচ্ছা এলা তুমি হামেশা যাদের সম্পর্কে অভিযোগ জানাও তারাতো এককালে আমারও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবী ছিল। ছিল কিনা ?

তাই ওদের বিরুদ্ধে বলায় তুমি দুঃখ পাচ্ছ এই তো ? এলা উত্তর এড়িয়ে বিভাসের প্রশ্নের নাভিমূল খুঁজতে চাইল।

মোটেই না। আমি বোঝাতে চাইছি, অযাচিত ওদের কাছে পুরনো বন্ধুত্বের দাবিদার হতে যাও কেন ? আমি যাইনা বলেই দুঃখও পাই না। কফি হাউসের আড্ডার দিনগুলি নিয়ে গান কবিতা চলে। তাতে অন্যমাত্রার স্বাদ পাওয়া যায়। দিনগুলিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। ওদিকে গেলেও আমি কফি হাউসে ঢু মারি না। কেন জান ? নিজেকে আগন্তুক মনে হবে। পুরনো বন্ধুদের বাড়িতে যাওয়ার কথাও ভাবি না এই একই কারণে।

পাগলামি আমার ছিল, আছে, থাকবেও। এলা সগর্বে বলল, পাগলামি না থাকলে ভালবাসা থাকে না। ভালবাসা সে জন্যই যাতনাময়।

সে যাতনার পরিণাম আনন্দময়ও বটে। কথায় এলার কাছে হারতে অনিচ্ছুক বিভাস বলল, অতএব সদা থাক আনন্দে দ্বন্দ্বে ছন্দে।

এটা তো কবিগুরুর কথা।

তুমিও নিজের করে নাও না। কে করেছে মানা।
তোমরা দু'জনেই অনেক কঠিন কঠিন কথায় চলে যাচ্ছো। বন্যা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এসব আমার জন্য নয়। আমি বরং খেতে বসার ব্যবস্থা করি।
বিভাস, বউটা তুমি পেয়েছো বড় ভাল। বন্যা চলে যেতে এলা ফের পুরনো প্রসঙ্গ টানল, অন্য বন্ধুদের বউদের মতো সন্দেহ বাতিক গ্রস্ত নয়। ভাবতে অবাক লাগে, এই বয়সেও সন্দেহ! আসলে মেয়েদের এটা এক ধরনের রোগ।
ছেলেদের বুঝি রোগটা নেই? বিভাস ওর অভিজ্ঞতা শোনাল, তোমার কাছ থেকে পুরনো বন্ধুদের ফোন নম্বর আর ঠিকানা নিয়েছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই। তো একদিন ভাবলাম, সীমাকে দিয়েই ফোন শুরু করা যাক। এতবছর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কে কেমনতর স্বামীর ঘরসংসার করছে জানিনা। তো টুম্পাকে নম্বর আর নামটা দিয়ে ডায়াল করতে বলে বললাম, অন্য কেউ ধরলে বলবি ওঁনার এক বন্ধুর মেয়ে বলছি। আপনি চিনবেন না।
ভেরি ইন্টারেস্টিং। কৌতূহলে এলা বলল, তাড়াতাড়ি বল। সীমার সঙ্গে কি কথা হল?
সীমা বাড়িতেই ছিল না। টুম্পা রিসিভার রেখে জিগ্যেস করল, সীমা কে গো?
এককালে আমার গার্লফ্রেন্ড ছিল। টুম্পাকে আরও বিশ্লেষণ করে বোঝালাম, এখন অবশ্য ওম্যান। হয়তো ভাবছিস, তোকে দিয়ে কেন ডায়াল করালাম? করালাম এই জন্য যে, সবার মন তো আর তোর মা-বাবার মতো না। ওদের সংসারে আমার ফোন করা নিয়ে অশান্তি হোক তা চাইনি বলে।
কি দরকার তোমার চোরের মতো ফোন করার? টুম্পা রীতিমতো আমাকে শাসনের ঢঙে বলল, সত্যিকার ফ্রেন্ডই যদি হও সাহসের সঙ্গে নিজেই ফোন করবে। আমাকে নিয়ে এভাবে ডাকাবে না।
নিশ্চয়ই সাহসী পুরুষ হওনি আর কোনওদিন। এলা নিরুৎসাহিত হল।
করেছিলাম। ওর হাজব্যান্ড প্রথম রিসিভার ধরেছিল। সীমাকে দেয়ার আগে কতরকম যে প্রশ্ন! পরিচয় পেয়ে খুব একটা খুশি মনে হল না।
তারপর? এলা আবার নড়েচড়ে বসল।
সীমা তো রীতিমতো অপ্রস্তুত। আমতা আমতা করে দু'চারটা কথা বলার পর বিস্ময়কর ফিসফিসিয়ে কি বলল জান? বলল, দুপুরে ও যখন থাকবে না ফোন করো। এখন রাখছি।
ফোন করেছিলে আর কোনওদিন?
রক্ষে কর, আবার ফোন! ভাগ্যিস প্রথমটাতেই ঘা খেয়েছিলাম। নইলে হয়তো কঙ্কনা অতসী প্রভা সুরভি—ওদেরকেও করতাম।
ওদের সবার বাড়িতেই আমার যাওয়া আছে। সীমার বরটা সত্যিই বিদঘুটে মনের মানুষ। সীমা আমার কাছে অনেক দুঃখ করেছে। সুরভির তো আমার মতো অবস্থা—স্বামী মারা গেছে। বাকিদের মধ্যে অতসীর বরকে আমার সব চাইতে ভাল লাগে। দারুণ আমুদে, আড্ডাবাজ। মনেই হয় না একজন জেলাশাসক। অতসীকে ফোন করো একদিন।
কোনও দরকার নেই। অনেক শিক্ষা হয়েছে। তোমার মতো যে বা যারা আসতে চাইবে—অলওয়েজ ওয়েলকাম। অন্যথায়, এই বেশ ভাল আছি আমি।

দুপুরের আহারের পর তিনজনে মিলে আবার সেই বাগানেই। শীতের দুপুর মানেই যেন বিকেল। সূর্যের আলো ম্লান নিস্তেজ। ক্রমশ শীতের মাত্রা বাড়তে থাকে। ডিম-কুসুম সূর্যকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেখা যায় দূরের গাছেদের প্রাচীরে।
অপূ-র-ব সৌন্দর্য। নির্বাক অপলক দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে এলা বলল, বিভাস তুমি ভাগ্যবান। নিজের বাগানে বসে এমন সূর্যাস্ত দেখতে পায় ক'জন।
শুধু কি সূর্যাস্ত?
সর্বক্ষণের কাজের মেয়েটি ট্রে হাতে কাছে এসে দাঁড়ায়। বিভাস হাত বাড়িয়ে নিজের পেয়ালাটা নিল। তারপর চায়ের চুমুকে তৃপ্তির শব্দ ছড়িয়ে বলল, জবাকুসুম সূর্যোদয় হয় পূর্ব দিকের ঝিলের ওপার থেকে। সে এক দারুণ মনোরম দৃশ্য। সকালের চায়ের টেবিলে বসে দেখা যায়। গান কবিতার মানুষদের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগবে।
লোভ দেখিও না বিভাস। চায়ের পেয়ালা শূন্য করে এলা বলল, এখানকার সূর্যোদয় দেখতে হলে আমাকে যে টাইগারহিল নেতারহাটের মতো রাত থাকতে উঠে আসতে হবে। সেটা তো কোনওমতেই সম্ভব নয়।
সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য দেখতে ওসব জায়গায় তো আগের দিন রাতও কাটায় অনেকে। বিভাস সাতপাঁচ না ভেবে খোলা মনে আমন্ত্রণ জানাল, মন চায়তো একদিন চলে এসো।
বন্যা, তুমি কি বল? এলা দুষ্টুমি-দৃষ্টি ফেলে চাপা হাসল, বিভাস যে আমাকে এখানে রাত কাটাতে আসতে বলছে!
তাতে দোষের কি আছে। বন্যা প্রতিক্রিয়াহীন সাদা মনে সায় দিল, আমাদের এই জায়গাটা যদি সত্যিই তোমাকে টানে তো এসে থাকতেই পার। যে ক'দিন ইচ্ছে। তবে হ্যাঁ, টুম্পার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর।
দ্য বেস্ট টাইম। বন্যার সবুজ সংকেত পেয়ে বিভাস উচ্ছল হল, পরীক্ষা শেষে টুম্পা ওর মামা বাড়িতে বেড়াতে যাবে। ওর ঘরেই তুমি থাকতে পারবে। ওদিকটাতেই সিনিক বিউটি বেশি। পূর্বপশ্চিমের জানলা দিয়ে বিছানায় শুয়েই সূর্যের উদয় অস্ত দেখা যায়। চাঁদনি রাতের জ্যোৎস্নায় ঘরে আলোর বন্যা বয়ে যায়। ফ্যানটাসটিক। তুমি হয়তো এক ডজন কবিতাই লিখে ফেলতে পার।
তোমার কোনও অসুবিধাই হবে না। বন্যা অতি উৎসাহে প্রস্তাব রাখল, তুমি যে ক'দিন ছুটি নেবে বিভাস কিন্তু অফিস কামাই করবে না। শুধু আমরা দু'জনে সারাদিন দারুণ মজা আনন্দে কাটাব।
শুধু সারাদিন? এলার ঠোঁটের কোণে ফিচেল হাসি, রাতে কি হবে? শোবে না আমার সঙ্গে? তখন আমি একা?
অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে বন্যা রীতিমতো অপ্রস্তুত। অবাক হতভম্ব। কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে বিভাসের দিকে তাকাল।
স্যরি ম্যাডাম। সপ্রতিভ বিভাস চটজলদি জবাব দিল, সে গুড়ে বালি।
বিভাস তুমি এই বয়সেও—। বাকি কথা অব্যক্ত রেখে এলা ভুরু কুঞ্চিত করল।
আগডুম বাগডুম কি ভাবছো জানিনা। বিভাস কৈফিয়তের ঢঙে বলল, আসলে আমরা দু'জনেই বিচ্ছেদ বিচ্ছিন্নতা বিরোধী। তাই সেই প্রথম রাত থেকেই বিশেষ একটা অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছি। শুনবে সেটা কি?

বলার মতো হলে বলবে, নইলে না বলাই ভাল।
বন্যার চাহনির ইঙ্গিতে বলতে মানা। তবু, বিভাস নিষেধ মানল না।
বলে দেয়াই ভাল। বিভাস বেআব্রু বলল, প্রথম রাতের বাক্যালাপ আলোচনায় আমরা এক সময় একটা ঐকমত্যে পৌঁচেছিলাম। সেটি হল, খিটিমিটি মনোমালিন্য সব দম্পতির সংসারে কম বেশি থাকবেই। সাময়িক হলেও কথা বন্ধ আকছার ঘটে। অনভিপ্রেত সেসব দীর্ঘায়িত না হওয়ার সহজ সিধা পথ হল, কোনও অবস্থাতেই পৃথক বিছানায় না শোওয়া। এখানেই আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।
কিন্তু, সে তো প্রথম জীবনের কথা। এলা যুক্তিজাল বিস্তার করল, খিটিমিটি মনোমালিন্য কথা বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপার স্যাপার থাকলে তবেই। আমাকে বোকা বানাচ্ছো?
ফের সেই বোকা! বলেছি না সরল সোজা।
বেশ তাই না হয় হল। এবার এই সরল সোজাকে সহজ কথায় বোঝাও তো, আমি এখানে রাত কাটাতে এলে কি এমন কারণ থাকতে পারে যে বন্যা আমার সঙ্গে শুতে পারবে না।
বলতেই হবে?
নিশ্চয়ই। ধন্দে থেকে কি করে সিদ্ধান্ত নেব, তোমাদের এখানে রাত কাটাতে আসা উচিত হবে কি না। যা বলার জলদি বল। আমাকে এবার উঠতে হবে। নইলে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যাবে।
তাই তো, আমাকেও যে মন্দিরে যেতে হবে পূজা দিতে। বন্যা ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ততা দেখালো, তোমরা কথা বল। আমি ততক্ষণে তৈরি হই গিয়ে।
আসলে কি জানো? বন্যা চলে যেতে বিভাস বলল, এসব আলোচনা ওর ভাল লাগছিল না। তাই অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে গেল।
সেটা আমিও বুঝেছি। এবার ব্যস্ততা দেখালো এলাও, বন্যাকে বাদ দিয়ে শুধু আমরা দু'জনে আর বেশিক্ষণ এই নিভৃতে কাটানো বোধহয় ঠিক হবে না।
তাহলে শোন। বিভাস দ্বিধাহীন অতি সহজ করে বলল, এই বয়সে আমাদের ভাবনাটা একটু অন্যরকম। দু'জনেই ভাবি, অনিবার্য দুঃসহ কোনও একদিন তো একজনকে আগে চলে যেতেই হবে। তখন দিনের ব্যস্ততায় না হলেও রাতের শয্যায় অপরজনকে ভয়ঙ্কর বিষাদময় শূন্যতায় ছেয়ে থাকবে। অতএব, বাকি যতদিন যুগলবন্দী বেঁচে আছি অন্তত দিনের শেষের শয়নে একটি রাতও একলা থাকব না।
বুঝেছি, আর কিছু বলতে হবে না। এলা ভাবাবেগ-আপ্লুত আচমকা মৌন বিভাসকে বলল, চলো, বাসস্টপ অব্দি আমাকে এগিয়ে দেবে তো?
এলাকে বাসে তুলে দিতে এসেছে বিভাস। চলতি পথে দু'জনেই হেঁটেছে আশ্চর্যরকম নির্বাক। এখনও একদম চুপচাপ।
কি সিদ্ধান্ত নিলে? এলাকে বাসে ওঠার আগে বিভাস নিরুত্তাপ নিস্তেজ প্রশ্ন করল, আসবে নাকি এখানকার সূর্যোদয় দেখতে?
ভেবে দেখব। এলা হিমশীতল জবাব দিল।
বাস ছুটছে অতিদ্রুত। নিশ্চুপ বসে এলা যেন পাথরপ্রতিমা। দীর্ঘকাল পর এলার এখন এই ভিড়ঠাসা বাসটাকে ভয়ঙ্কর বিষাদময় নিজের শূন্য শয্যা মনে হচ্ছে।

জলছবি

মধুরিমা এবারকার এস এম এসে জানালেন, রাত সাড়ে দশটা হোতে চললো। আপনার ঘুমোবার সময় হলো। আজ এটাই শেষ। ভালো থাকুন।

এপার থেকে ধরণীধরের জবাব গেল, এতোক্ষণ নিরমল আনন্দ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। সদা আনন্দে থাকুন। শুভো রাত্রি।

নির্মল আনন্দই বটে, উভয়ের কাছে। তেষট্টি বয়সী ধরণীধর আর ষাট ছুঁই ছুঁই মধুরিমার কাছে এই লেখা চালাচালি যেন বিনোদনের একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখেলায় দু'জনেই কিছুটা সময় ক্লান্তিকর নিঃসঙ্গ একঘেয়েমি থেকে মুক্ত থাকেন। শরীরটা থাকে তাজা ঝরঝর ফুরফুরে। যেহেতু ফোনাফুনির চাইতে খরচ বিস্তর কম, তাই প্রায় প্রতিদিন এক বা একাধিকবার এই খেলা অভ্যাসে পৌঁছে গেছে। কিছু ঘোর বা নেশাও বলা যেতে পারে।

ধরণীধরের চাকরি জীবনের সিংহভাগ কেটেছে প্রবাসে। শেষপর্বে পাকাপাকি কলকাতায়। বাস করতেন, ভবানীপুরে পিতৃপুরুষের বহুবিভক্ত সাবেকি বাড়ির একাংশে। হৈ হট্টগোল ধুলা জঞ্জাল ইত্যাদি দূষণ দারুণ দুঃসহ লাগত। ইচ্ছা ছিল, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আর কলকাতায় থাকবেন না। নিরিবিলি মনোরম কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশে বাকি জীবন কাটাবেন। কিন্তু, সন্তান সন্ততি আর আত্মীয়স্বজনদের মায়ায় আবদ্ধ স্ত্রীর অনীহায় সম্ভব হয়নি। অকালে স্ত্রী মারা যেতে ধরণীধর স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন, কলকাতার অনতিদূরের এখানকার বৃদ্ধাবাসের কটেজে। 'শান্তিবন' নামে বৃদ্ধাবাস হলো অনেকটা হলিডে রিসর্টসের মতো।

'শান্তিবনে'র সামনের প্রশস্ত রাস্তাটা নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে সোজা শ্মশানের দিকে গেছে। শ্মশানের বিপরীত দিকে সুদৃশ্য কালী মন্দির। নিকটেই খেয়াঘাট স্নানঘাট পার্ক ইত্যাদি। পাকা সড়কের ধার ঘেঁষা প্রায় দেড় মাইল প্রাচীরের ওপারে বিখ্যাত জনসন জুতা প্রস্তুত কারখানা। বিশাল অঞ্চল জুড়ে সুদৃশ্য জনসননগর। বিদেশী এই কারখানা কেন্দ্রিক নগর গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার আগে।

ধরণীধরের সাথে মধুরিমার প্রথম সাক্ষাৎ জনসননগরের পোস্টঅফিসে। এলাকার সবচাইতে বড় পোস্টঅফিস। বিশেষ প্রয়োজনে গিয়েছিলেন ধরণীধর। ভিড়ের ভেতর থেকে এই বয়সেও যথেষ্ট সুশ্রী সুন্দরী মধুরিমা বললেন, আপনার কলমটা একবার দেবেন? হাতের ফর্মটা দেখিয়ে জানালেন, সামান্য একটা সই করবো।

ব্যাঙ্ক পোস্টঅফিস বুকিংকাউন্টার ইত্যাদিতে কেউ কলম চাইলে ধরণীধর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। গোপন বিরক্তিতে নির্বাক শব্দ আওড়ান, যত্তোসব। কেন যে এরা কলম আনেনা সঙ্গে!

কিছু মনে করবেন না। ধরণীধর অভ্যাসমতে খাপটি হাতে ধরে রেখে কলমটি দিলেন। বললেন, অনেকেই ফেরত দিতে ভুলে যায় কিনা, তাই—।

কিচ্ছুটি মনে করিনি। মধুরিমা সই সেরে কলমটি ফেরত দিয়ে স্নিগ্ধ হাসলেন। শ্রুতিমধুর স্বরে বললেন, কলম আমারও প্রিয়। ব্যাঙ্কে দু'বার খোয়া যেতে ঠেকে শিখে আমিও এখন সাবধানী হয়েছি।

ব্যস, ওই পর্যন্তই। তারপর যে যার দরকারের ব্যস্ত কাউন্টারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন।
ধরণীধর কিছুদিন আগেও জানতেন না যে, পোস্টঅফিসের মহিলাটির নাম মধুরিমা। বেহালা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। থাকেন 'শান্তিবন' ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে তালদিঘিতে। সেখানে এখন একটাও তালগাছ নেই। না আছে কোন পুকুর দিঘি ডোবা। জনবহুল জমজমাট জায়গাটাতে দিনকে দিন কংক্রিটের জঙ্গল বেড়েই চলেছে।
মধুরিমার বিয়ে হয়েছিল পুরাতন বালিগঞ্জে। সেখান থেকে বেহালায় পড়াতে আসা কারও পছন্দ ছিল না। ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ওর স্বামী উঁচু পদে চাকরি করতেন বিখ্যাত বহুজাতিক সংস্থায়। অফিসের কাজে হামেশা দেশ বিদেশে যেতে হতো। সংযমী জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বভাবতই মন মানসিকতা রুচির ফারাকে খিটিমিটি লেগেই থাকত দু'জনে।
মধুরিমা খুব বেশিদিন বনিবনাহীন অশান্তির সংসারে থাকতে পারেননি। মেয়ের বয়স তখন মাত্র তিন বছর। ওইটুকু মেয়েকে নিয়ে এখানে এই বাপের ভিটেয় চলে এসেছেন। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বামীর তরফে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সেই থেকে এখানেই আছেন মধুরিমা। সেদিনকার ছোট্ট তিনবছরের মেয়েটি এখন চার বছরের পুত্র সন্তানের জননী। থাকে স্বামীর চাকরিস্থল চেন্নাই-এ। শোনা কথা, ডিভোর্সী না হয়েও মধুরিমার স্বামী নাকি দ্বিতীয় বিয়ে করে মুম্বাই অফিসের চাকরিতে ছিল। পরের খবর সম্পূর্ণ অজানা।
একমাত্র সন্তান মধুরিমা এখন পৈত্রিক সাবেকি বিশাল বাড়িতে একা অধিশ্বরী। দোতলায় একা থাকেন। নিরাপত্তা-প্রয়োজনে নিচের তলায় সপরিবারে কাজের লোকদের থাকতে দিয়েছেন।
ধরণীধর এতকিছু জেনেছেন, অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বিতীয়বার মধুরিমার সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায়। পারিবারিক প্রয়োজনে ভবানীপুর যেতে হয়েছিল। ফিরতিপথে বাসের জন্য তারাতলার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। স্কুল থেকে নিজের গাড়িতে ফিরছিলেন মধুরিমা। ধরণীধরকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থামালেন। মুখ বাড়িয়ে অন্যমুখি ধরণীধরকে ডাকলেন, এই যে শুনছেন?
ধরণীধর দৃষ্টি ফেরাতে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই ডাকছি। চিনতে পারছেন কি আমাকে?
কেন চিনবো না? ধরণীধর ঈষৎ ঝুঁকে বললেন, সেই যে পোস্টঅফিসে কলমতো?
ঠিক চিনেছেন তাহলে। মধুরিমার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি।
না চেনার কি আছে। ধরণীধর কাব্য করে বললেন, সে কি ভোলা যায়।
ঠাট্টা ছাড়ুন। যাবেন তো উঠে আসুন আগে।
ধরণীধর সামনে ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিলেন, মধুরিমা পাশের দরজা খুলে দিলেন। সীট থেকে দু'বাণ্ডিল পরীক্ষার খাতা সরিয়ে বললেন, এখানে এসে বসুন। তাড়াতাড়ি। এখানে আবার ট্রাফিক সার্জেনের ঝামেলা আছে।
সেদিন নাতিদীর্ঘ পথ পাশাপাশি বসে দু'জনে। ওইটুকু সময়ে প্রশ্ন উত্তরে যতটা সম্ভব দু'জনের পরিচয় বিনিময়। হৃদয়খোলা নির্ভেজাল আলাপ আলোচনায় পরস্পরকে ভালো লাগালাগি। অনেকদিনকার চেনাজানার মতো হয়ে ওঠা।
তারপর আজ অব্দি ধরণীধরের সাথে তৃতীয়বার মধুরিমার সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়নি। তা সত্ত্বেও এস এম এস মাধ্যমে পরিচয় আরও দৃঢ় হয়েছে। ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। দু'জনে অনেকটা আপনজন

হয়ে উঠেছেন। আপনজনদের কাছেইতো ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা বেআব্রু বলা যায়। সেটা এখন বলেও থাকেন দু'জনে।
কাল বাংলা নববর্ষ। ধরণীধরের মন অতীত স্মৃতিচারণে বিষাদময় ভারাক্রান্ত। আশা করেছিলেন, মধুরিমার এস এম এস আসবে। আসেনি। চাপা অভিমানে নিজেও করেননি। ভেবেছেন, কতবারতো মধুরিমাকে এখানে আসতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। স্কুল আর খাতা দেখার ব্যস্ততা দেখিয়ে অক্ষমতা জানিয়েছেন। আজ পর্যন্ত একবারও তো বলেননি, আসুন না একদিন আমার বাড়িতে। রাতে ঘুমের আগে হঠাৎই ধরণীধরের খেয়ালি মন বলল, রোজ সকালে নদীর ধারে অনেকটা পথতো যাওয়াই হয় প্রাতঃভ্রমণে। কাল নাহয় কালীমন্দির অব্দি যাওয়া হবে। সুমুখের ঘাটে স্নান সেরে মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরবেন।
ধরণীধর রাতের সিদ্ধান্তমতে পাতলা অন্ধকারের ভোরে শয্যা ছাড়লেন। সর্বপ্রথম মোবাইলে মধুরিমাকে বার্তা পাঠালেন, নববর্ষের শুভো কামনা। 'এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়/ তোমারি হউক জয়।' তারপর মোবাইল অফ করে পলিপ্যাকে স্নানের পোশাক নিয়ে বের হলেন।
ধরণীধর ফিরে এসে দেখলেন, ইনবক্সে প্রত্যাশিত মধুরিমার শুভেচ্ছা-বার্তা এসে রয়েছে। লিখেছেন, আগামী দিনগুলি আপনি আরও আরও ভালো থাকুন। নববর্ষের প্রভাতে এই কামনা করছি। অতো ভোরে উঠেছেন ভাবতে অবাক লাগছে।
ধরণীধর সংক্ষিপ্তে সকালের স্নান পুজোর খবর জানিয়ে শেষাংশে লিখলেন, নববর্ষে পাওয়া প্রথম শুভেচ্ছা-বার্তাটা আমার হোক চেয়েছিলাম যে।
ওপার থেকে জবাব এলো, পরে পাঠালেও এটাই হতো প্রথম ও শেষ। কেননা, আজকাল বাংলা নববর্ষ আগের মতো ক'জন আর পালন করে।
ভাবাবেগে আপ্লুত ধরণীধর লিখলেন, আজকের দিনে প্রিয়জনরা এলে ভালো লাগবে। আজতো ছুটির দিন। আসবেন?
নারীদের ছুটি থাকে কখনো? মধুরিমার বার্তায় কষ্টকথা ফুটে ওঠে, আগে ভাবতাম বিবাহিত নারী-জীবন মানেতো রান্নাঘর আঁতুড়ঘর ঠাকুরঘর....... এইসব। এখন সেসব না থাকলেও ইস্‌কুল আছে। খাতা দেখা আছে। এখন খাতা দেখছি। আর মাত্র তিনদিন হাতে আছে। এখনও অনেক খাতা দেখতে বাকি। যাওয়ার উপায় আছে?
মধুরিমার খাতা দেখায় ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে ধরণীধর আর কোনও বার্তা পাঠালেন না। তিনদিন পার হয়ে যাওয়ার পরও না।
চতুর্থ পেরিয়ে পঞ্চমদিনের অলস দুপুরে ধরণীধরের সারা শরীরময় অদ্ভুত সাড়া জাগিয়ে মোবাইল বেজে উঠল। যদিচ এই সময় মধুরিমার এস এম এস আসে না। কেননা স্কুলে থাকেন। বিস্ময়ে অভিভূত ধরণীধর দেখলেন মধুরিমা জানতে চেয়েছেন, কি হয়েছে আপনার—চারদিন চুপচাপ? কোথাও গিয়েছিলেন নাকি বেড়াতে? অথবা অসুখ টসুক কিছু? চিন্তায় ইস্‌কুল থেকে খবর নিচ্ছি।
খুব দেখছি ভাবেন আমাকে নিয়ে! ধরণীধরের জবাবে অভিমান, মোবাইলতো চালুই ছিল। এতো যদি দরদতো চারদিন পরে কেন? অসুখ টসুক কিছু না। আসলে খাতা দেখায় ডিস্‌টারব হোক চাইনি তাই।

এভাবে ভাববেন না, প্লিজ। মধুরিমা নিজ দোষ স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন, স্বীকার করছি আরও আগে আমার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। এবার রাগ পরবেতো?
রাগতো আমার আপনার ওপর না। খাতার ওপর। সবসময় খাতা খাতা খাতা। এই খাতাই যতো নষ্টের গোড়া। আপনারও মাথা ব্যথা। কবে যে রেহাই পাবেন।
আমারও আর ভালো লাগে না। কি আর করা যাবে। প্রথাগত জীবনের বাইরে থাকতে গিয়ে কম বিতর্কিত সমালোচিত হতে হয়নি বিয়ের পরে। পরবর্তী জীবনে এখন কি দেখছি? কোন কিছুতেই সুখশান্তি নেই। কাল উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা শুরু। গার্ড দিতে হবে। সেই পরীক্ষার খাতাও আসবে। অর্থাৎ সেই গতানুগতিক জীবন। ছকের বাইরে যাওয়ার মতো সময় নেই। বেশ আছেন আপনি। আপনিও থাকবেন আগামী দিনে। তখন বুঝবেন। সাধে কি মাঝে মাঝে গুন গুন করি, 'মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ করো না মা।'
এখন আর না। রাগ করে এস এম এস বন্ধ করবেন না। ভালো থাকুন।
ধরণীধর ক'দিন ভালো ছিলেন না। ভবানীপুরের সম্পত্তি নিয়ে অংশীদারি কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল। আপোশ নিষ্পত্তির জন্য সেখানেই থাকতে হয়েছিল। ইচ্ছে করেই সেইসময় মোবাইলটা অফ করে রেখেছিলেন। কিন্তু গোপনে ইনবক্স খুলে দেখেছেন, না মধুরিমার কোনও বার্তা আসেনি। ওই সময় এক নাতনির জন্মদিন ছিল। কিছুতো দিতেই হয় ওকে। কেনাকাটা করতে নিউমার্কেট গিয়েছিলেন। যাওয়ার পথে রবীন্দ্রসদনের সামনে মধুরিমাকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছিলেন। কেননা, সময়টা তখন সাড়ে চারটা হবে। যে সবসময় ব্যস্ততা দেখায় এবং এখন ইস্কুলে থাকার কথা, সে কিনা—!
মধুরিমা সেদিন একা ছিলেন না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। মুখ দেখতে না পাওয়া লোকটি কে হতে পারেন? ভালোমন্দ হাজার কাল্পনিক চিত্র গড়েছেন ধরণীধর। কোনটি সঠিক বুঝবেন কেমন করে। একসময় মনকে বলেছেন, দরকার কি এতসব সাতপাঁচ ভেবে। মধুরিমা এমন কে একজন যে, ওদের দু'জনকে নিয়ে নিরর্থক ভাবনাচিন্তায় নিজেকে নিরানন্দময় করে তুলবেন!
মন কি অত সহজেই নিরস্ত হয়! এই যেমন এখন। রাতের আহার অন্তে ধরণীধর আজ ব্যতিক্রমী। শব্দহীন বিষাদময় অন্ধকারে কটেজের সামনের লনে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। অপলক দৃষ্টি, খই ছড়ানো তারায় ভরা নির্মল আকাশের দিকে। অথচ, মন জুড়ে শুধুই মধুরিমা আর মধুরিমা।
মন উচাটনে ধরণীধর জানতে চেয়েছিলেন, চুপচাপ কেন এতদিন?
সকালে পাঠানো প্রশ্নের উত্তর এখনো আসেনি। প্রশ্ন পড়লে তবে তো উত্তর। আজ সারাদিন মোবাইল অন করেননি মধুরিমা। ভেবেই পাচ্ছেন না, কি এমন কারণ থাকতে পারে। সম্ভাব্য কারণ নিয়ে ভাবনার যেন শেষ নেই।
কিছুক্ষণ পর বহু আঁকাঙ্ক্ষিত বার্তা আসার বাজনা বেজে উঠল মোবাইলে। ধরণীধর আনন্দে আন্দোলিত হলেন। দেখলেন আলোময় বার্তায় মধুরিমা লিখেছেন, কি করছেন এখন?
আলো নিভে যেতে ধরণীধর অত্যুৎসাহে নিমেষে লন থেকে ঘরে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, আর কিছুই লেখেননি মধুরিমা।

ধরণীধর ঝটপট জবাবে জানালেন, অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাকৃতিক বাতাস খাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, পঞ্চভূতের অসীমেই তো বিলীন হয়ে যেতে হবে। দু'দিন আগে অথবা পরে। থাক এসব কথা। আমার প্রশ্নের জবাব দিন আগে। কেন চুপচাপ ছিলেন এতোদিন? মোবাইল অফ করে রাখা কি আমাকে এড়াতে?

এরকম ভাববেন না। মেয়ে জামাই নাতি এসেছে। সন্তর্পণে মোবাইল ব্যবহার করতে হচ্ছে। বন্ধ থাকলে বুঝবেন, কিছু সমস্যা আছে। রেস্‌পেকটেড ফ্রেন্ড, দয়া করে বাজে কিছু ভেবে আঘাত পাবেন না।

ধরণীধর লিখলেন, হে সুশ্রী সুমনা বান্ধবী, কোন দিনতো ফোনে আপনার সুকণ্ঠ শোনা গেল না। তৃতীয়বার আর কি কেউ কারও চোখের সামনে আসবো না? অনন্তকাল শুধু এভাবে এস এম এস নির্ভর হয়ে থাকবো? আমার বেলায় যতো ব্যস্ততা অজুহাত! সেদিন সাড়ে চারটায় রবীন্দ্রসদনের সামনে দেখলাম। ব্যস্ততা তখন গেছিল কোথায়?

এমন কথা আপনি বোলতেই পারেন। মধুরিমা জানালেন, আসলে নতুন এক সমস্যায় আছি। আমার পরীক্ষাও বলা যেতে পারে। যার সঙ্গে সেদিন দেখেছেন তিনি কে জানতে চাইবেন না? তিনিই আমার সমস্যা আর পরীক্ষার কারণ।

জানতে চাইবো কোন অধিকারে? বলার হোলে আপনিই বলবেন।

সেদিন মধুরিমার কাছে ধরণীধরের অধিকার আদৌ বিচার্য বিষয় ছিল না। মানসিক অস্থিরতা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে দ্বিধাহীন জানিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রসদনের সামনে সাক্ষাৎপ্রার্থী মানুষটি ওর আইনসিদ্ধ স্বামী। মুম্বাইয়ে ওর জীবনটা ছিল লীভ টুগেদারের মতো। কোনও সন্তানাদি জন্মায়নি। স্বভাবতই অবসর নেওয়ার পর ওকে ছেড়ে যেতে সঙ্গিনীটির কোনও অসুবিধা হয়নি। সেই সময় থেকে নিঃসঙ্গতায় ওর বোধোদয় শুরু। এই বয়সে এখন যাবেন কোথায়? কিছুদিন গোপনে চেন্নাই-এ মেয়ে জামাইয়ের কাছে ছিলেন। ওদের সঙ্গেই কলকাতায় ফিরেছেন। শেষ জীবনের আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে বাকি জীবনটা মধুরিমার সঙ্গ-আশ্রয়ে কাটাতে চাইছেন। মধুরিমা ফিরিয়ে দিলে বৃদ্ধাবাসই শেষ ভরসা।

মধুরিমা তাৎক্ষণিক সম্মতি জানাতে পারেননি। ভেবে দেখতে ক'দিন সময় চেয়েছেন। সমস্যা বা পরীক্ষা বলতে সেটাই। রাজি হওয়া মানেইতো গল্প উপন্যাসের মতো সেই প্রথাগত পরিণতি। সম্মতিতে দ্বিধা সেই কারণে।

শেষ করার আগে মধুরিমা জানিয়েছেন, আমারও বয়স বাড়ছে। যখন স্কুল যাওয়া খাতা দেখার ব্যস্ততা থাকবে না তখন? এই বাড়িটাওতো বৃদ্ধাবাসই হয়ে যাবে।

যথারীতি সবশেষে 'ভালো থাকুন'ও লিখেছেন মধুরিমা।

ধরণীধর সেদিনের পর থেকে আর ভালো নেই। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে এসেছেন, ভালো থাকতে হলে ফিরে যেতে হবে স্বেচ্ছায় ছেড়ে আসা নিজ নিকেতনে। নির্জন শান্তিবনের পরিবর্তে সন্তান সন্ততির কোলাহল মুখরিত আনন্দধামে।

হারিয়ে পাওয়া

সামনে অশান্ত সমুদ্র। গর্জিত সফেন ঢেউ প্রায় পা ছুঁই ছুঁই। নোনা বাতাস বইছে আগোছালো এলোমেলো। তরুলতার হাঁটুতে চিবুক। সফেদ চুল গুটিয়ে বাঁধা। শরীর জড়ানো আঁটসাঁট আঁচল ডানহাতের মুঠো-বন্দী।

অবিরাম ঢেউ আসছে যাচ্ছে। চলে যাওয়ার সীমিত সময়ে দু'টি ছোট ছেলেমেয়ে দুরন্ত বেগে মনপসন্দ ঝিনুক আবিষ্কার করছে। ওদের আবদারমতো সেই ঝিনুক কোল আঁচলে ভরছে যে রমণী তার বয়স তিরিশ ঊর্ধ্ব। নাম নিকিতা। পোশাকে বোঝা না-গেলেও নিকিতা সম্প্রতি অকালে পতিহীনা হয়েছে। সে সম্পর্কে তরুলতার কনিষ্ঠপুত্র অনিবার্য-র পত্নী। বুম্বা, বুলি নামে ছোট্ট দুষ্টুমিষ্টি ছেলেমেয়ে দু'টি তরুলতার নাতি-নাতনি।

এখন পড়ন্ত রোদ্দুর। সূর্য ডুবু ডুবু। বুলি উচ্ছল চঞ্চল খুশি ঝলমল।

তরুলতা ভ্রূক্ষেপহীন অবিচল বসে আছেন যেন পাথরপ্রতিমা।

নিরিবিলি মনোরম প্রাকৃতিক এই সমুদ্রসৈকত ভূমিতে তরুলতার আসা যাওয়া সেই কিশোরী বয়স থেকে। বয়স ব্যবধানে উপভোগের তারতম্য থাকেই। তবু আকর্ষণের গভীরে কোথায় যেন একটা মিল থেকে যায়। কিন্তু, এবারকার আসাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম মন মানসিকতার। এবার জলস্থল অকাশ দর্শন উপলক্ষ্য নয়। নেই কোনও উচ্ছলতা উন্মাদনা। অথবা নিরুদ্বেগ প্রশান্ত শান্তিপ্রাপ্তির প্রত্যাশা। অন্যান্যবারের সঙ্গে অতি গভীরেও বিন্দুমাত্র মিল নেই। নিতান্তই ব্যতিক্রমী। ব্যতিক্রম তো বটেই। তরুলতা শেষবার এখানে এসেছিলেন প্রায় এক যুগ আগে। সঙ্গে ছিলেন স্বামী জ্যোতিপ্রকাশ। সস্ত্রীক জ্যেষ্ঠপুত্র অভ্রান্ত। অভ্রান্ত-অর্চি যুগলের ছোট্ট সন্তান চিরন্তন। ছিল, নববিবাহিতা কন্যা কৃষ্টি আর জামাতা জাগতিক। সেইসঙ্গে অবিবাহিত কনিষ্ঠপুত্র অনিবার্য। সকলে মিলে সাগরতীরে। সেই শেষ সম্মিলিত সকলে।

এক যুগে পালটে যায় বিস্তর কিছু। যথেষ্ট শিক্ষিতা যুক্তিবাদী সুবাদে তরুলতা বুঝতে পারেন যে, হালে জগতময় পরিবর্তনটা ঘটে চলেছে অতিদ্রুত। বহির্জগত ও অন্তর্জগত উভয় ক্ষেত্রেই। তরুলতা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেনে মানিয়ে চলতে অভ্যস্ত। তাই কদাপি জ্যোতিপ্রকাশের মতো দুঃখবাদী মানুষ ছিলেন না। তবু, অনিবার্য-র আচরণে দারুণ আঘাত পেয়ে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম ছিলেন না কোনওমতেই। তরুলতার স্থির বিশ্বাস, দুঃখবাদিতাই জ্যোতিপ্রকাশের হৃদয়যন্ত্র বিকলের অন্যতম কারণ। সে কারণে, অনিবার্য হয়ে উঠেছিল ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য সন্তান।

এই মুহূর্তে নুয়েপড়া গাছের মতো বিশাল চেহারার মানুষটাকে তরুলতা বিশেষভাবে স্মরণে আনছেন। নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতায় সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন জ্যোতিপ্রকাশ। চূড়ান্ত আমুদে মানুষটা প্রায়ই ক্ষ্যাপার মতো আচরণে আক্ষেপ করতেন, আমার সাজানো বাগান শূন্য হয়ে গেল।

জ্যোতিপ্রকাশ বাগান অর্থে টালিগঞ্জে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন বিশাল বাড়িটাকে বোঝাতে চাইতেন। শূন্যতা শুরু অভ্রান্তকে দিয়ে।

কলকাতা ছেড়ে দিল্লিতে যাওয়ার কারণ অভ্রান্ত যথেষ্ট যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। যেন বজ্রাহত জ্যোতিপ্রকাশের মুখের দিকে তাকানোর সাহস পায়নি অভ্রান্ত। ভারাক্রান্ত স্বরে ভেঙে ভেঙে বলল, তোমাদের সবার মাঝে থাকতেই তো চেয়েছিলাম বাবা। চেষ্টা করে দেখলাম তো পাঁচ বছর। এখানে উচ্চমানের ডিগ্রি আর মেধার কোনও মূল্যই দিতে চায় না কেউ। তদ্বির রেফারেন্স আর পার্টিবাজির পিঠে চেপে গাধা ঘোড়াকে দৌড়ে হারিয়ে দেয়। তা নাহলে যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তেমন যুতসই চাকরি পেলাম না কেন এ ক'বছরে!

সেই অভ্রান্ত দিল্লিতেও শেষ পর্যন্ত থাকল না। এত বড় বিশাল দেশ ছেড়ে এখন ছোট্ট একটি দেশ বাহারিনে যথাযোগ্য মর্যাদার আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। তা নাহলে বারবার এগ্রিমেণ্ট এক্সটেনশন হচ্ছে কেন।

জামাতা জাগতিক ঘরজামাই ছিল না বটে কিন্তু ঘন ঘন যাঁতায়াত ছিল। ঘরের ছেলের মতোই হয়ে গিয়েছিল। মেট্রো রেলের সুবিধায় কৃষ্টি যখন তখন চলে আসত শ্যামবাজার থেকে। সঙ্গে থাকত ওদের ছোট্ট মেয়ে ঝুনা।

সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার জাগতিক চাকরি করত কলকাতার এক বহুজাতিক সংস্থায়। সেখানে নানা দাবিতে হামেশা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন লেগেই থাকত। জাগতিক আশঙ্কা প্রকাশ করত, ট্রেড ইউনিয়নের সর্বনাশা আন্দোলনে ওয়ার্ক কালচারটা যেভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাতে এখানে ব্যবসা করা দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভয় হয়, কবে না আমাদের কোম্পানি ডকে উঠে যায়।

জাগতিকের আশঙ্কা কিছুটা মিলে গেল। ডকে না উঠলেও ওদের সংস্থা পাততাড়ি গুটিয়ে চেন্নাই চলে গেল। সেটা ছিল জ্যোতিপ্রকাশের সাজানো বাগানে দ্বিতীয় দফায় শূন্যতা সৃষ্টি।

আর অনিবার্য? অনিবার্য ছিল জ্যোতিপ্রকাশের সব শূন্যতায় পরিপূর্ণতার একমাত্র অবলম্বন। অন্ধের যষ্টি। নয়নের মণি। যে কোনও বিপদে-আপদে প্রধান বল-ভরসা। সুখ শান্তি আনন্দ ছন্দর উৎস। অথচ সে ছিল, জ্যোতিপ্রকাশের দৃষ্টিতে একসময় ব্রাত্য পর্যায়ের। সেজন্য জ্যোতিপ্রকাশকে দোষ দেওয়া যায় না। অনিবার্য ছিল জ্যোতিপ্রকাশের অবাধ্য ছেলে। অভ্রান্তর ঠিক বিপরীতধর্মী চরিত্রের। ডানপিটে স্বভাবের। বিলাসী। মেধা থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনোয় অমনোযোগী দারুণ আড্ডা আর স্ফূর্তিবাজ। মুখরা। অপরিণামদর্শী। আরও অনেক কিছু ত্রুটিযুক্ত।

এই শ্রেণীর উদ্ধত যুবকদের মতো প্রচুর দোষে দোষী অনিবার্যও সাধারণ গ্র্যাজুয়েট। তারপর অতি সাধারণ চাকরি করত। কিন্তু বংশপরিচয় আর পর্দার নায়কসুলভ শারীরিক সৌন্দর্যে কয়লাখনির মালিকের একমাত্র সন্তান নিকিতার প্রেমে পড়ার উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। পরিণামে নানা প্রতিবন্ধকতা-উত্তীর্ণ হয়ে বিয়েও হয়েছে।

ধনী বাপের একমাত্র সন্তানের যে ধরনের আচার-আচরণ হয়ে থাকে নিকিতার মধ্যে সবই কমবেশি ছিল। এমনতর স্ত্রীর স্বামীরা যেমনটি হয়ে থাকে অনিবার্য ঠিক তেমনটিই ছিল। সুতরাং, অনিবার্য ব্রাত্য হয়ে থাকবে সে এমন বিচিত্র কি!

সেই অনিবার্য নিকিতা আর ওদের দুই সন্তান বুম্বা-বুলিকে নিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ যখন আহ্লাদে আটখানা তখনই অকস্মাৎ আবার বজ্রপাত।

অনিবার্য একদিন বলল, সামান্য মাইনের এই চাকরিটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি বাবা।
এই বয়সে কোথায় আরও ভালো চাকরি পেলি? জ্যোতিপ্রকাশ অবাক হয়ে প্রশ্ন রাখলেন।
চাকরি নয়, ব্যবসায় নামছি।
কিসের ব্যবসা? তরুলতা জানতে চাইলেন।
হোটেল।
সেতো অনেক টাকার ব্যাপার!
জ্যোতিপ্রকাশ প্রশ্ন ছুঁড়লেন, এত টাকা পাবি কোথায়? আমাকে আগে বলিসনিতো কিছু!
আমিই কি জানতাম? অনিবার্য মুখ ফিরিয়ে নিকিতার দিকে তাকালো, তুমি নিজেই বলো না। চুপ করে আছো কেন?
আমার বাবা ব্যবস্থা করেছেন। নিকিতা কারণ দর্শালো, বুম্বা-বুলি বড় হচ্ছে। ওদের ভালোভাবে পড়াশুনা করাতে গেলে আপনাদের ছেলের রোজগারে সম্ভব নয়। তাই—
তাই তোমার বাবা ব্যবস্থা করেছেন!
জ্যোতিপ্রকাশ চরম উত্তেজনায় কণ্ঠস্বরে মেজাজ তুঙ্গে তুললেন, চমৎকার। বলি, আমি কি মরে গেছি? অপমান। এ আমার ভীষণ অপমান। ছিঃ ছিঃ অনি। এমন ছুড়ে দেওয়া রুটি লুফে নিতে তোর আত্মসম্মানে এতটুকু বাধল না। তুই এতটাই মেরুদণ্ডহীন হয়ে গেছিস! সেই ছোট্টবেলা থেকে যে জ্বালাতন শুরু করেছিস তা কি থামবে না?
এবার থামবে বাবা। সে জন্যই তো তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছি।
দূরে! তরুলতা শূন্যতা সৃষ্টির যোলো কলা আঁচ পেয়ে বললেন, দূরে কতদূরে তোর হোটেল ব্যবসা শুরু হবে?
পুরীতে। অনিবার্য সাবলীল শোনালো, সমুদ্র তো তোমার দারুণ প্রিয় মা। যখন মন চাইবে তোমরা দু'জনে চলে যাবে। এখান থেকে এমন কিছু দূরত্বেও নয়। রাতে ট্রেনে ঘুমিয়ে ভোরে পৌঁছে যাবে। যাবে তো?
নাহ্। যাব না। কোনও দিনই যাব না।
কেন যাবে না! আমি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হই তা কি তুমি চাও না?
তোর মা-র হয়ে জবাবটা আমিই দিচ্ছি।
জ্যোতি প্রকাশ দ্বিধাহীন জানালেন, তোর শ্বশুরের টাকায় তুই সুপ্রতিষ্ঠিত হবি তা আমরা চাই না। আমার আত্মসম্মানবোধ আছে। অত টাকা হয়তো আমার নেই। কিন্তু তুই কিছু ব্যবসা করে আরও ভাল থাকতে চাস জানলে আমি তোকে সাহায্য করতে পারতাম।
সেটা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় তাকি আমি জানি না? কোথায় পেতে এত টাকা তুমি?
তোদের মুখ চেয়েই তো এই বাড়িটা করেছিলাম। অভ্রান্ত আর এই বাড়িতে কোনও দিনই ফিরবে না বুঝতে পারছি। দরকারে বাড়িটা বিক্রি করে দিতাম। সেই টাকাতে হোটেল হয়না জানি। তার সঙ্গে সঞ্চিত টাকা যোগ করলেও হবে না, সেটাও বুঝি। প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়া যেত।

বাবা, আপনি এভাবে বিচার করছেন কেন?
নিকিতা যথেষ্ট নরম স্বরে বলল, আমি তো আমার বাবা মা-র একমাত্র সন্তান। ভবিষ্যতে সব কিছুর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। ভাবুন না বাবা আমাকেই দিয়েছেন। আপনার স্বপ্নসদনটাও থেকে যাচ্ছে।
স্বপ্ন যেখানে ভেঙে যায় সেখানে সদন থেকে লাভ কি? জ্যোতিপ্রকাশ অন্তর্জ্বালা উন্মুক্ত করলেন, আমার স্বপ্ন ছিল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর ওদের সন্তানেরা বাড়িটা আনন্দময় আলোকিত প্রাণময় করে রাখবে। একে একে সবাই দূরে চলে গেলেও তোমাদেরকে নিয়ে আমরা তো পরম আনন্দেই ছিলাম মা।
এখন বাড়িটা তো ভুতুড়ে বাড়ির মতোই হয়ে যাবে বউমা। তরুলতা সহমতে সমর্থন সঙ্গত জুড়লেন, এই বয়সের দুই বুড়োবুড়ির বাকি জীবনটা কেমনভাবে কাটবে ভাবলেও না একবার! হৃদয় থাকলে ভাবা উচিত ছিল।
বৃথা তোমরা আগডুম বাগডুম ভেবে দূরত্ব বাড়াচ্ছ। অনিবার্য গুমোট আবহাওয়া পরিবর্তন প্রত্যাশায় বোঝালো, পুরী এমন কিছু দূরে নয়। বিশেষত উন্নততর যান্ত্রিক যুগে। টেলিফোনিক আর ইন্টারনেট যোগাযোগে দরকার হলে রাতের ট্রেন ধরলেই সকালে দেখা হওয়া সম্ভব। তবু তোমরা এত ভাবছ কেন?
ধরুন যদি আপনার এই ছেলেও বড়দার মতো গুণী হত। নিকিতা অকাট্য যুক্তি পেশ করল, ওর যোগ্যতায় বড়দার মতো বিদেশে ভালো চাকরি পেত তখনও কি এমন বাধা হয়ে দাঁড়াতেন?
বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি কে বলল মা?
জ্যোতিপ্রকাশ মাথার তাপমাত্রা নামিয়ে শান্ত জবাব দিলেন, আর্শীবাদ করছি তোমাদের আগামী জীবন সুখশান্তিতে ভরে উঠুক। আমার বাগান শূন্য হয়ে গেলেও কি এসে যায়।
তোমাদের নতুন বাগানের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র রাগরোষ অভিমান থাকবে না। তরুলতা আঁচলে চোখ মুছে ভেজা গলায় বললেন, সেই কিশোরী বয়স থেকে সমুদ্র আমার বড্ড প্রিয় ছিল। এখন থেকে সমুদ্রকে দারুণ নিষ্ঠুর মনে হবে। মনে হবে, যে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায় সে আমার শত্রু। সেই শত্রুর মুখ দেখব না আর কোনও দিন।
সত্যিই তাই। এই ক'বছরে একবারের জন্যও তরুলতা পুরীতে যাননি। অনিবার্য ওরা যথার্থ যোগাযোগ রেখেছে। সপরিবারে এসেছেও বেশ কয়েকবার। প্রতিবারই মা-বাবাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেছে। তরুলতা বিন্দুমাত্র দুর্বল হননি। শেষবার জ্যোতিপ্রকাশ উৎসাহ প্রকাশ করলেন, চলোই না ক'দিন ঘুরে আসি। সমুদ্রর ওপর গোঁসা করে ওদেরকে কষ্ট না দিলেই কি নয়?
তোমাকে তো বাধা দিচ্ছি না। তরুলতা জেদ বজায় রাখতে মেজাজ দেখালেন, দয়া করে আমাকে যেতে বলো না। এই তো বেশ আছি। ওরা আসছে, থাকছে। দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। ফোনেও যোগাযোগ আছে। এখন আর মনেই হয়না, ওরা কাছে নেই। অনেক দূরে চলে গেছে।
মানলাম। নিকিতা অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল, হোটেল আর আমাদের ঘরদোর কেমন, তাও তো দেখতে যেতে পারেন।

তোমাদের হোটেল আর পাতা সংসার যদি সমুদ্র-পারে না হয়ে পাহাড় সমতল জঙ্গল এমনকি মরুভূমিতেও হতো তাহলে যেতাম। বলেছিতো, সমুদ্রর মুখ আর আমি কোনও দিনই দেখব না। ওর সঙ্গে আমার চিরকালের আড়ি।
স্বভাবতই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জ্যোতিপ্রকাশের আর যাওয়া হয়নি।
পরবর্তীকালে শান্তির খোঁজে তরুলতা মঠ মন্দির আশ্রম কেন্দ্রিক ধর্মকর্মে অন্যমুখি হয়ে পড়লেন। এসবে অনীহায় জ্যোতিপ্রকাশের নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠল। নিরন্তর মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকলেন। ফলশ্রুতি, বিশাল শরীরটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ল। শরীর জুড়ে নানা রোগ ব্যাধি বাসা বাঁধতে শুরু করল। অবশেষে একদিন নিজের সাজানো বাগান ছেড়ে তিনি চির শান্তিধামের বাগানে চলে গেলেন।
বিশাল বাড়িটাতে তরুলতা এখন সম্পূর্ণ একা হলেও প্রতিক্রিয়াহীন নির্বিকল্প। আধ্যাত্ম ভাবনাচিন্তায় নিমগ্ন মানুষেরা যেমনটি হয়ে থাকে তেমনটি। মায়াময় এই জগৎ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার প্রয়াসকালে বিধি বাম হল। নিদারুণ দুঃসংবাদটা আকস্মিক আছড়ে পড়ল বিধ্বংসী সমুদ্র ঢেউ-এর মতোই। অন্যমুখি জীবনটাকে প্রবল বেগে নাড়িয়ে দিয়ে সবকিছু নিমেষে তছনছ করে দিল যেন।
শ্বশুর শাশুড়িকে নিয়ে সমুদ্র-স্নানে নেমেছিল অনিবার্য। সঙ্গে কোনও নুলিয়া নেওয়া দরকার মনে করেনি। সাপিনীর ছোবলের মতো ভয়ঙ্কর এক সমুদ্র-ঢেউ ওদের তিনজনকে নিয়ে উধাও। দীর্ঘক্ষণ সার্বিক সন্ধান চালিয়েও কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। সমুদ্রতীরে জমে থাকা বহু মানুষের প্রতীক্ষিত দৃষ্টির সামনে ওরা আবার একে একে ফিরে এসেছিল। অনেক পরে। সমুদ্র ওদের তিনজনকেই নিষ্প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল।
এ কেমনতর ফিরিয়ে দেওয়া! তরুলতা মনে মনে ভাবলেন, সমুদ্রর নেওয়া আর ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে কত উদারতা আর মহিমা কীর্তনই না শুনে এসেছেন এতকাল। এই তার নমুনা!
সমুদ্রর ওপর তরুলতার রাগ ক্ষোভ ঘৃণা বেড়ে গেছে-অনেক অনেক বেশি।
সেই তরুলতা নাতি-নাতনিকে বুকে টেনে একদিন আর্তচিৎকার করে উঠলেন, রাক্ষসী সমুদ্র শুধু আমার সন্তানকেই কেড়ে নেয়নি, এইটুকু বয়সে তোদেরও পিতৃহারা করে ছেড়েছে। নিষ্ঠুর নির্মম পিশাচী। কথা দে, আমার মতো তোরাও আর কোনও দিন সমুদ্রর মুখ দর্শন করবি না।
এভাবে বলবেন না মা। অকাল-বিধবা নিকিতা অকল্পনীয় আচরণে তরুলতার কাঁধে সান্ত্বনাসূচক হাত রাখল। তারপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসে বলল, আমি তো শুধুমাত্র স্বামীকেই হারাইনি। পিতৃমাতৃহীনাও হয়েছি। কষ্টতো আমারও কম নয়। তবু বলছি—আমাদের দু'জনকেই এখন মন শক্ত করতে হবে। অন্তত ওদের দু'জনের মুখ চেয়ে কোনও মতেই ভেঙে পড়লে চলবে না।
ব্যস, তরুলতার জীবনটা আবার একবার অন্যমুখি হয়ে গেল। এখন প্রয়াত জ্যোতিপ্রকাশের বাগানে চারটি পৃথক বর্ণ বয়সের ফুলের সমাবেশ। উজ্জ্বল ঝলমল আলোময়। কলকাকলি মুখরিত। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। শোকছায়া বিলুপ্ত। তবু, তরুলতার সমুদ্র-বিদ্বেষ কিছুতেই যায় না।
একদিন সমুদ্র-সংক্রান্ত একটি লেখা পড়ছিল স্নেহের নাতনি বুলি। শব্দ উচ্চারণে পড়া বুলির অভ্যেস।

কি পড়ছিস বুলি? তরুলতার অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠের প্রশ্নে বুলি পড়া থামাল। পড়ায় বাধা পেয়ে বিরক্ত হল।
কেন, পরীক্ষার পড়াই তো পড়ছি ঠাম্মা! অবাক বুলি জবাব দিল।
মনে মনে পড় সোনা। তরুলতা ম্লান হলেন।
বুঝেছি। বুলি পড়া ছেড়ে কাছে ছুটে এল। জড়িয়ে ধরে তরুলতাকে বলল, সমুদ্রর ওপর এখনও তোমার রাগ গেল না!
বলেছিতো জীবনেও যাবে না।
আমার কিন্তু আর কোনও রাগ নেই ঠাম্মু। বুম্বা ছুটে এসে তরুলতাকে বলল, কেন জান?
কেন? তরুলতা বুম্বাকে কাছে টেনে নিলেন।
সমুদ্র বাপিকে না নিয়ে গেলে কি তোমাকে পেতাম?
আমি কি তোর বাবার চাইতেও বেশি কিছু? তরুলতার দু'চোখে জল চিক চিক আনন্দ খুশি।
অবশ্যই। বাপিকে কাছে পেতাম কতটুকু।
আমারও একই কথা। বুলি নিজের মাথা তরুলতার বুকে সঁপে দিয়ে বলল, বাপিকে হারিয়ে তোমাকে না পেলে জানতামই না স্নেহ ভালবাসা মমতা কি।
ওরা ঠিকই বলছে মা। নিকিতা পরে নিরিবিলি একান্তে বেআব্রু বলল, টাকা ছাড়া কিছুই বুঝত না আপনার ছেলে। টাকা ওকে ক্রমশ পালটে দিচ্ছিল। সেসব চরিত্রদোষের কথা আপনাকে আর বলতে চাই না। বিশ্বাস করুন মা, আমার ভীষণ ভয় করত। ভাবতাম বুম্বা বুলি বড় হচ্ছে। ওরা যখন জানতে বুঝতে পারবে তখন কোথায় গিয়ে পৌঁছাব?
আমাদের জানাওনি কেন?
তাতে আপনার আর বাবার অশান্তি বাড়ত বই কমত না। আমারও। তাইতো ভাবি, সার্থক নাম রেখেছিলেন আপনারা। সবকিছুই অনিবার্য ভেবে কিছুটা শান্তি পেতাম। এখনও তাই। সেজন্যই বলছি, সমুদ্রকে সবসময় অমন ঘেন্না করবেন না। গালাগালও দেবেন না। যদি বলেন, কেন? উত্তর পেতে হলে সব রাগ ক্ষোভ অভিমান ঘৃণা বিদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে আবার একবার সমুদ্রের কাছে যেতে হবে।
সেই পুরীতে? বিহ্বল তরুলতা সম্মোহিতের মতো আলতো উচ্চারণ করলেন, জন্মানো ঘেন্না থেকে মুক্তি পাওয়া কি অতই সহজ বউমা।
পুরীতে এখনই আমার পক্ষেও যাওয়া সম্ভব হবেনা মা।
নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছ তো এখন। তরুলতা বিষাদময় চোখে তাকালেন।
জগৎ তো নিজের নিয়ম আর ছন্দে চলে। নিকিতার দু'চোখে ধৈর্য প্রত্যয় প্রত্যাশা। দুর্বলতা উসকে দিয়ে বলল, চলুন না সেই সমুদ্র সৈকতে আবার যাই।
কোন জায়গার কথা বলছ?
সেই যেখানে কিশোরী বয়স থেকে আপনি বহুবার গেছেন। বুলিও তো কিশোরীর দিকে পা বাড়িয়েছে।

তরুলতা অবিশ্বাস্য আবেগে আপ্লুত হলেন। কিন্তু অপলক বিস্মিত দৃষ্টি মেলে নির্বাক নিস্পন্দ রইলেন।
তারপর সকলে মিলে এখন এই সমুদ্র সৈকতে।
পশ্চিমের জলে টুক করে সূর্য ডুবে গেছে। ম্লান রোদ্দুর উধাও। সমুদ্র বর্ণ বদলে তুঁত-রঙ হয়েছে। চরভূমিতে সন্ধ্যা নামছে। ক্রমশ ধূসর হচ্ছে, গাঙচিল বালিহাঁস সারিবদ্ধ পালতোলা মাছধরা নৌকা। আরও পরে অল্প দূরত্বের নরমবালিতে ঝিনুক, লাল-কাঁকড়া ইত্যাদি।
নোনা বাতাসের ঝাপটায় তরুলতার গা শির শির করে উঠল। হঠাৎ যেন কিশোরী বয়সের নিজেকে সমুদ্রমুখি ছুটতে দেখলেন। পরক্ষণেই মনে হল, বোধহয় বুলিই ছুটছে। শিয়রে সর্বনাশ দেখে তরুলতা আর্তচিৎকার করে উঠলেন। চরাচর খান খান করা শব্দে ডাকলেন, ওভাবে ছুটিস না বুলি। ফিরে আয় সোনা। বউমা তুমি আর বুম্বা কোথায়? বাঁচাও বাঁচাও।
ঠাম্মা, এই তো আমরা! তরুলতাকে জড়িয়ে ধরে বুম্বা বুলি খিল খিল হেসে লুটোপুটি, ঠাম্মা ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে।
বউমা কোথায়?
আমি তো অনেকক্ষণ হল আপনার পাশেই বসে আছি। নিকিতার ঠোঁটে স্নিগ্ধ আলোর মতো হাসি।
তুমিও ওদের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরো বউমা।
সমুদ্রকে এখনও এত ভয় আপনার! নিকিতা দু'হাতের বন্ধনে আঁকড়ে ধরে বলল, এইতো আমরা সবাই আছি।
তরুলতা সংশোধিত নিরুচ্চার বললেন, অনিবার্য বাদে বাকি সবাই। পরমুহূর্তে সব শোক ক্ষোভ রাগ উত্তীর্ণ কল্যাণময় আনন্দসুখের স্পর্শ অনুভব করলেন। ভাবলেন, অনিবার্য বেঁচে থাকলে হয়তো আর কোনও দিনই ওদেরকে এভাবে পাওয়া যেত না। সমুদ্র একজনকে নিয়ে তিনজনকে শূন্য বুক বাগান বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছে।

মৃত কার্ডের ময়না তদন্ত

আজকের সাক্ষাৎকারকালে স্বাগতার উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন ছিল না। ওর যাওয়ার ইচ্ছার পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলেও মনে হয়নি। বজবজের চড়িয়াল থেকে বাসে বাটানগর। সেখানকার টার্মিনাস থেকে মিনিবাসে হাওড়া স্টেশন। ফের অটো রিকশায় চড়ে রেশনিং অফিসে পৌঁছতে হবে। নিতান্ত কম সময় ও ধকলের ব্যাপার না। তবু, প্রিয়রঞ্জন একবারটি প্রশ্ন তোলেননি, খামোকা তুই কেন আবার কষ্ট করতে যাবি! পরিবর্তে সহজ সরল মনে স্বাগতাকে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছেন। রেশন অফিসের কাউন্টারে এখন বেজায় বাজারি-হই-হট্টগোল ভিড়ভাট্টা। মডিফায়েড রেশন অঞ্চলের বাসিন্দা প্রিয়রঞ্জন রীতিমতো অবাক হলেন। নতুন রেশন কার্ডের জন্য অত চাহিদার কারণ কি হতে পারে তা অনুমান করতে পারলেন না।

প্রিয়রঞ্জন দূর থেকে ব্যস্ত গলদঘর্ম ইন্সপেক্টর পিনাকী করের নাজেহাল অবস্থা দেখে ধারে কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলেন না। কিন্তু স্বাগতা সঙ্গে থাকায় অস্বস্তি বোধ করলেন। কেননা, আর দশটা সরকারি অফিসের চেয়ার টেবিল আলমারি দেওয়াল ফ্যান লাইটের মতো এই অফিসটিরও দৈন্যদশা। প্রয়োজনে আসা প্রতীক্ষারত ব্যক্তিদের বসার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। সম্ভবত স্বাগতার উপস্থিতি সুবাদে জনৈক কর্মী এগিয়ে এসে প্রিয়রঞ্জনদের প্রয়োজন জানতে চাইলেন। হেতু শুনে আন্তরিকতায় কোনও রকমে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

দীর্ঘ সময় গড়িয়ে গেল। ভিড়মুক্ত পিনাকীর কাছ থেকে প্রতীক্ষারত প্রিয়রঞ্জনের ডাক এলো বেলা দেড়টায়। দু'দিকে প্লাস্টার খসা স্যাঁতস্যেতে দেওয়াল আর একদিকে তেল চিটচিটে পুরনো আমলের আলমারি ঘেরা চেম্বারে পিনাকী বসে আছেন। ক্লান্ত বিধ্বস্ত। একটি ফাইলে কিসব লেখালেখি করছেন।

প্রিয়রঞ্জন সৌজন্যমূলক নমস্কার জানালেন। প্রত্যুত্তরে পিনাকী মুখ তুলতে পাশে দাঁড়ানো স্বাগতাকে দেখিয়ে বললেন, এই আমার সেই মেয়ে।

পিনাকী অপ্রস্তুত বিব্রত। সুমুখেতো একটিই মাত্র চেয়ার। দু'জনকে বসতে বলবেন কিভাবে! সারা অফিস খুঁজে যদিওবা অতিরিক্ত আর একটি চেয়ারের সন্ধান মেলে তো সেটির স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্যে বসার উপযুক্ত হবে না নিশ্চিত। মুশকিল আসান করলেন একই চেম্বারে অপর একটি চেয়ারে বসা সহকর্মী। তিনি নিজের আসন স্বেচ্ছায় ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, আপনারা একজন এখানে বসুন। পিনাকীর মুখোমুখি বসে জরুরি বাক্যালাপে প্রিয়রঞ্জনের সুবিধা হবে বিচারে স্বাগতা দ্বিধাহীন এগিয়ে গেল। পিনাকীর পাশের শূন্য চেয়ারটিতে বসল। প্রিয়রঞ্জন সুমুখে বসলেন।

ওয়েট এ মিনিট। পিনাকী লেখা শেষ করে ফাইল বাঁধলেন। এমন সময় একজনের প্রবেশ। এক হাতে এনামেলের কেটলি। অপর হাতে বেশ কয়েকটি মাটির খুঁদে ভাঁড়। জিজ্ঞেস করল, চা দেব স্যার?

হ্যাঁ হ্যাঁ। পিনাকী খুশি ঝলমল বললেন, এদেরকেও দাও।

না। ন্নাহ্। প্রিয়রঞ্জন অনেকক্ষণ হল একটু চা খাওয়া দরকার মনে করলেও বললেন, আবার আমাদেরকে কেন?

খান খান। পিনাকী অকৃত্রিম আন্তরিকতা দেখালেন, আপনারাও তো ক্লান্ত। কতক্ষণ হল বসে আছেন। অতদূর থেকে সেই কখন বেরিয়েছেন।

স্বাগতা কোনও আপত্তি জানাল না। প্রিয়রঞ্জন ম্লান হাসলেন। ভাঁড়ের চায়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে কাজের কথায় এলেন, কিছু ব্যবস্থা করতে পারলেন স্যার?

অবশ্যই। দু'চুমুকে ভাঁড় শূন্য করে পিনাকী ড্রয়ার খুললেন। একখানি রেশনকার্ড বের করে বললেন, এই আপনার মেয়ের কার্ড।

শেষ পর্যন্ত দিল তাহলে? খুশি ঝলমল প্রিয়রঞ্জন বললেন, আপনাদের কাছে আসার আগে কতরকম ভাবেই না চেষ্টা চালিয়েছি! কিছুতেই ফেরত দেয়নি।

আসলে এখন দিতে বাধ্য হয়েছে। পিনাকী ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন, কেন জানেন? খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ওরা এই কার্ডে এখনও নিয়মিত রেশন তুলছিলেন। রেশনিং আইন অনুযায়ী যা কিনা দণ্ডনীয় অপরাধ।

আপনাকে সেদিন বলেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়? ওদের এখনও সেপারেশন হয়নি। কোর্ট কেস চলছে। এই রেশন কার্ডটি ওরা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে আশঙ্কাতেই আমাদের এ্যাডভোকেট পরামর্শ দিয়েছেন, যেকোনও প্রকারেই হোক তাড়াতাড়ি হাতে আনার ব্যবস্থা করতে। তবেই না বুঝেছি, বিয়ের দানসামগ্রী ফেরত পাওয়ার চাইতে রেশন কার্ডটি আগে হাতে পাওয়া বেশি জরুরি।

প্রিয়রঞ্জনের হাত ঘুরে রেশন কার্ডটি এখন স্বাগতার হাতে। অন্যমনস্ক স্বাগতা এতক্ষণ নির্বাক থাকার পর প্রথম মুখ খুলল, আপনি কি ওদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। এই প্রথম পিনাকী সুশ্রী সুন্দরী স্বাগতাকে ভাল করে দেখলেন। বিষণ্ণতা লক্ষ্য করলেন। বললেন, তোমার শ্বশুর শাশুড়িকেতো বেশ ভালই লাগল।

আপনাকে কোন ঘরে বসিয়েছিলেন?

প্রথমে বৈঠকখানায়। চা জলখাবারে আপ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন। যথেষ্ট আন্তরিকভাবেই। আমার হাতে সময় কম ছিল। ওরই মধ্যে বৈঠকখানার সোফাসেট টি ভি টেপডেক ইত্যাদি দেখিয়ে বললেন, এসব বউমার। তারপর আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে তোমাদের বেডরুমে নিয়ে গেলেন, সৌখিন সাজানো আসবাবপত্রগুলি যে তোমার বিয়ের দানসামগ্রী হিসেবে পাওয়া তাও জানালেন।

গহনাপত্রগুলিও দেখালেন? প্রিয়রঞ্জন জানতে চাইলেন।

না। পিনাকী মুচকি হেসে বললেন, সেগুলি নিশ্চয়ই লকারে। নইলে হয়তো দেখাতেন। আমারতো রীতিমতো অস্বস্তি লাগছিল। যে প্রয়োজনে যাওয়া সেটিতো ততক্ষণে হাসিল হয়েই গিয়েছে। সুতরাং, অযথা সময় নষ্ট করে কি লাভ?

আমাদের অবশ্য লাভ হয়েছে। প্রিয়রঞ্জন কারণ ব্যাখ্যা করলেন, আমার একমাত্র সন্তানের বিয়েতে দু'হাত খুলে দেওয়া দানসামগ্রীগুলি যে এখনও অক্ষত আছে জেনে বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারলাম।

অফ দ্য রেকর্ড, আন অফিসিয়াল একটা প্রশ্ন করব? পিনাকী কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

স্বাচ্ছন্দ্যে। প্রিয়রঞ্জন সম্মতি জানালেন।

আমি যেসময় গিয়েছিলাম তখন মিঃ শৈবাল সাঁতরার বাড়িতে থাকার কথা নয়। ডেকস-এ্যালবামে ওর রঙিন ফটো দেখলাম। দারুণ স্মার্ট হ্যান্ডসাম মনে হল। ইলেকট্রনিকস গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং

ব্যবসায় এই বয়সেই প্রচুর টাকাকড়ির মালিক হয়েছে নিজের নিষ্ঠা ও প্রতিভায়। মারুতি গাড়ি পর্যন্ত কিনেছে শুনলাম। অর্থাৎ কিনা আজকের দিনে একজন সুপাত্র। তা সত্ত্বেও ছ'মাস বাদেই আপনার মেয়েকে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে হল কেন?

জবাবটা আমি দিচ্ছি। স্বাগতা নম্রতার আচ্ছাদন সরিয়ে হঠাৎ যেন ঝলসে উঠল, শৈবালের আউটলুকটা অত্যন্ত ভাল। কোনও একটি অনুষ্ঠানে সামান্য আলাপে আমি তাই মুগ্ধ হয়ে ওর প্রেমে পড়েছিলাম। সামান্য ক'মাসের মেলামেশায় ওকে যথেষ্ট যাচাই করার সুযোগ ছিল না। অসবর্ণে মা-র আপত্তি থাকলেও বাবা অমন পাত্র হাতছাড়া করতে চাননি। শুভস্য শীঘ্রম বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আউটডোরে একজন পুরুষকে কতটা কি চেনা যায়? ইনডোরে বুঝতে বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি যে, শৈবাল কতটা ব্রুট ইনহিউম্যান মাতাল লম্পট দুশ্চরিত্রের মানুষ। তবু আমি ওকে সংশোধনের চেষ্টা করেছি, পারিনি। মার্ডার হয়ে যাওয়ার ভয়ে বাবার কাছে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছি। এনি মোর ক্রোশ্চেন?

নো। অপরাধীর মতো পিনাকী বললেন, আই এ্যাম স্যরি। এবার আপনারা আসুন।

শৈবাল-স্বাগতা সম্পর্কিত ঘটনাটা ভুলে যেতে পিনাকীর যথেষ্ট সময় লাগছিল। যখন প্রায় পূর্বতন স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরছিলেন ঠিক সেই সময় আর একটি রেশনকার্ড সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চিঠি এসে হাজির হল। এবারকার চিঠিটা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো। প্রেরক জনৈক সব্যসাচী সরখেল। লেটার হেডে মুদ্রিত নামের নিচে ক্ষুদে অক্ষরে পরিচিতি—প্রাক্তন আর্মি অফিসার। ঝকঝকে টাইপে জানানো ঘটনার নিচে সব্যসাচীর সৌন্দর্যের স্বাক্ষর।

সব্যসাচী অভিযোগে জানিয়েছেন, ওর মেয়ে গার্গী এখন আর সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় নামে ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করে না। শ্বশুরবাড়ির পরিবর্তে পিত্রালয়েই আছে। তবু সুমন্ত পরিবারের অভিভাবক ওর বাবা হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ অন্যায়ভাবে এখনও গার্গীর রেশনকার্ডটি নিজেদের দখলে রেখেছেন। একাধিক চিঠিতে দাবি আদায়ের তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও রেশন কার্ডটি ফেরত পাঠানো হয়নি। রেশন দোকানের উদ্দেশে চিঠি দিয়েও কোন সাড়া মেলেনি। সুতরাং উল্লেখিত রেশন দোকান মালিক, হৃদয়নাথ ও সুমন্তর বিরুদ্ধে যেন আইন মোতাবেক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। সেইসঙ্গে প্রকৃত মালিক গার্গীর হস্তান্তর অযোগ্য রেশনকার্ডটি বেআইনি দখলদারদের হাত থেকে উদ্ধার করে বর্তমান ঠিকানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। অন্যথায়, গার্গীর বাবা নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেন।

আইনের আশ্রয়! কার বিরুদ্ধে? বেশ কয়েকবার চিঠিটি পড়ার পরও পিনাকী বুঝতে পারলেন না হুমকিটা দেওয়া হয়েছে কাকে? বিন্দুমাত্র বিব্রত বিচলিত হলেন না পিনাকী। বরং, তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। ড্রয়ার খুলে চিঠিটি সযত্নে রেখে দিলেন। ভাবলেন, কাল পরশু ছুটির দিন। সোমবার রেশন দোকান বন্ধ থাকে। মঙ্গলবার দেখা যাবে, গার্গীর কার্ডটিতে এখনও রেশন তোলা হচ্ছে কিনা। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

মঙ্গলবার দুপুরে রেশনিং অফিসার তমাল চৌধুরির চেম্বারে পিনাকীর জরুরি ডাক পড়ল। তমাল ফোনে কথা বলেছিলেন। পিনাকীকে দেখে হাতের তালুতে রিসিভারে আবরণ তৈরি করে জানতে চাইলেন, সব্যসাচী সরখেলের চিঠিটা পেয়েছেন নিশ্চয়ই। এনকোয়ারি করেছেন?

শুক্রবার পেয়েছি। মাঝে ছুটি ছিল। আজ যাব।

নিন মিঃ সরখেলের সঙ্গে কথা বলুন। তমাল ফোনের অপর প্রান্তে সব্যসাচীকে বললেন, এনকোয়ারি অফিসারের সঙ্গে কথা বলুন।

হ্যালো। রিসিভার ধরে পিনাকী বললেন, বলুন মিঃ সরখেল।

আমার মেয়ে গার্গীর রেশনকার্ডটি কবে আশা করতে পারি?

যদিও রেশনকার্ডটি আপনাকে পাইয়ে দেওয়া আমাদের ডিউটির মধ্যে পড়ে না, তবু চেষ্টা করব। আপনি দু-একদিন পরে খোঁজ নেবেন। রেশন কার্ডটি ফেরত নিতে হলে কিন্তু স্বয়ং গার্গীকেই আসতে হবে। ওকে?

পিনাকী ইচ্ছাকৃত ফোনে কথা না বাড়িয়ে রিসিভারটি রেখে দেয়ায় সব্যসাচী ক্ষুব্ধ হলেন। ফলশ্রুতি, পরের দিনই আর্মাদা গাড়ি হাঁকিয়ে রেশনিং অফিসে এসে হাজির। পিনাকীর মুখোমুখি হতে জিজ্ঞেস করলেন, আমার চিঠির রেজাল্ট কি?

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তেজদীপ্ত সব্যসাচীর দিকে নির্ভীক তাকিয়ে পিনাকী বললেন, রেশন দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখেছি গার্গীর কার্ডটি তিনমাস আগেই রেশন না-তোলা দোষে বাতিলের পর্যায়ে চলে গেছে। গার্গী কতদিন যাবত আপনার ঠিকানায় আছে?

তা চার মাস হল।

নিয়মমতে কোনও রেশনকার্ডে একাদিক্রমে চার সপ্তাহ রেশন না তুললে সেটি বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা গার্গী এখান থেকে চলে যাওয়ার পর ওরা আর একটি সপ্তাহও ওটিতে রেশন তোলেননি। এমন সততা খুব কম দেখা যায়। বেশ ভাল লোক বলতে হবে।

আমি কিন্তু ওদের গুণগান শুনতে আসিনি। সব্যসাচী রুক্ষ মেজাজে বললেন, গার্গীর রেশনকার্ডটি উদ্ধার করার কতদূর কি করলেন সেটা বলুন।

কালকে ফোনেই বলেছি, দ্যাট ইজ নট আওয়ার ডিউটি। পিনাকী নম্রভাবে জানালেন, ইউ কাণ্ট ডিমান্ড ফ্রম আস। তবু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অফিসিয়াল ডিউটির বাইরে সাহায্য করে থাকি। সেটা করতে হয় ট্যাকট্‌ফুলি। এরপর পিনাকী সম্প্রতি শৈবাল-স্বাগতার ঘটনাটা সংক্ষেপে জানিয়ে বললেন, ওরা কিন্তু পরিবারের অন্য কার্ডগুলির সঙ্গে একই ক্যাশমেমোতে রেশন তুলছিলেন। সেই অপরাধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওদেরকে দুর্বল করতে পেরেছিলাম। গার্গীর ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই। ওরা অনায়াসেই গার্গীর কার্ড ওদের কাছে নেই বলতে পারেন। সমস্যাটা সেখানেই। আমাকে যথেষ্ট ভাবতে হচ্ছে।

তা ভাবুন। সব্যসাচী হঠাৎই আর্মি মনোভাব ত্যাগ করে নরম হলেন, একটা কিছু উপায় বের করুন। আই নীড ইওর হেলফ প্লীজ।

ওকে। সব্যসাচীর চিঠির ভাষায় ক্ষুব্ধ পিনাকী সবকিছু ভুলে অভয় দিলেন, আশা করছি দু'একদিনের মধ্যে গার্গীর রেশন কার্ডটি আমি উদ্ধার করতে পারব। কিন্তু সেটি স্বয়ং ওকে এসে প্রাপ্তি স্বাক্ষর করে নিয়ে যেতে হবে।

বেশ তাই হবে। কবে কখন ওকে পাঠাব বলুন।

সোমবার ফোন করে জেনে নেবেন।

ফোনে যোগাযোগ করে আজ নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে গার্গী। সারা অফিসের কর্মীরা ওর জৌলুসদার সেক্সি মদালসারূপ দেখে বিমুগ্ধ। পিনাকী এই বয়সেও তির তির রক্তচাঞ্চল্য টের পাচ্ছিলেন। সুমুখে বসে বিজ্ঞাপনের মডেলরূপী নয়নলোভা গার্গী। রেশমের মতো চুল উড়ছে ফ্যানের হাওয়ায়। নিজের নামের রেশন কার্ডটি হাতে পেয়ে পিনাকীর নির্দেশ মতো ছোট্ট কাগজে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র লিখল ইংরেজিতে। স্বাক্ষরে নাম লিখল, গার্গী সরখেল।

বোধহয় ঠিক হল না। পিনাকী ভুল ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমাদের তো এখনও আইন মোতাবেক সেপারেশন হয়নি। কার্ডে লেখা আছে গার্গী চট্টোপাধ্যায়। স্বামী সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়। কার্ডে যেমনটি তোমার স্বাক্ষর আছে ঠিক তেমনটি কর।

গার্গী বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। নতুন করে স্বাক্ষর সেরে কাগজটি এগিয়ে দিয়ে বলল, এবার ঠিক হয়েছে?

হ্যাঁ।

এবার গার্গীর চলে যাওয়ার কথা। তবু কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকায় পিনাকীই জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবে তুমি?

বলছিলাম কি, সুমন্তর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ। বাড়ির সকলেই আমাকে ঘিরে বসেছিলেন।

আমার সম্পর্কে নিশ্চয়ই অনেক বাজে কথা বললেন?

একটিও না।

তাহলে কি কথা হল?

তোমাদের সম্পর্কে কিছুই না। পাড়ার লোকমুখে ওদের পরিবারের অনেক সুখ্যাতি শুনেছিলাম। অমন একটি শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পন্ন বনেদি পরিবারের সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেশ ভাল লাগছিল। সুমন্তর সাহিত্য হৃদয়নাথবাবুর নাটক আর সুমন্তর দাদার আঁকা ছবি নিয়ে অনেক আলোচনা হল। সুমন্তর ভাইতো স্বরচিত তিনখানা জীবনমুখি গান পর্যন্ত গেয়ে শোনাল। চা খেলাম। একটা সুন্দর সন্ধ্যা কাটালাম।

সত্যিই ওরা সকলে মানুষ হিসেবে খুব ভাল। গার্গী কিন্তু বিষণ্ণ হল না।

তবু কি এমন কারণ ঘটল যে তুমি সবাইকে ছেড়ে চলে গেলে? প্রশ্নটা পিনাকীর ঠোঁটে এলেও স্বাগতার কথা মনে পড়তে কৌতূহল চাপলেন।

গার্গী নিজে থেকেই অপ্রত্যাশিত বলল, বড্ড বেশি ভাল বলেই বোধহয় আমার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। আমাদের ফ্যামিলি—কালচারের সঙ্গে মিলছিল না। সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে মানুষ আমি ফ্রি এ্যান্ড ফাস্ট লাইফে অভ্যস্ত। সুমন্ত কিছু না বললেও বাইরের জগতের বন্ধুদের সঙ্গে আমার মেলামেশা ওর রক্ষণশীল অভিভাবকরা মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই—

এসব ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ঘটনা আমাকে শুনিয়ে কি লাভ? পিনাকী এক চিলতে হেসে বললেন, না বলাই ভাল।

পিনাকীর অনীহার কারণ সুমন্তের পাড়ার একাধিক জনের মুখ থেকে শুনেছেন, খ্যাতনামা হৃদয়নাথ-পরিবারে গার্গী বেমানান। ওর আচার আচরণ রীতিমতো বেপরোয়া। ভিন্নতর পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ওকে কলকাতার হোটেল বার রেস্তোরাঁ, শহর উপকণ্ঠের হলিডে রিসর্ট আর দীঘার সমুদ্রতটে পর্যন্ত দেখা গেছে। তাই পিনাকীর ধারণা, গার্গী হয়ত আত্মপক্ষ সমর্থনে উদ্দেশ্যমূলক অনেক কিছু বলতে চাইছে।

পিনাকীর কাছ থেকে বাধা পেয়ে যৌবন উচ্ছল গার্গী রীতিমতো অপ্রস্তুত। সাময়িক ম্লান স্তিমিতও বটে। আচমকা নির্বাক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সপ্রতিভ বলল, ওকে। আমি যাচ্ছি। গুড বাই।

গার্গী চলে যাওয়ার পর শৈবাল-স্বাগতা আর সুমন্ত-গার্গী জুটি দুটির পরিবারের মানসিকতার তারতম্য নিয়ে পিনাকী বিস্তর ভাবনাচিন্তা করলেন। সুমন্তরা বনেদি হলেও এখন মোটেই বিত্তবান নয়। তবু কোনও দানসামগ্রী বা লৌকিকতার উপহার দ্রব্য নেননি। বিস্তারিত শুনে মুগ্ধ পিনাকী জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাহলে অযথা কেন এই সামান্য রেশন কার্ডটি ধরে রেখেছিলেন?

প্রত্যুত্তরে অবাক করে হৃদয়নাথ বলেছিলেন, বউমার সঙ্গে সুমন্তরতো ডিভোর্স হয়নি। গভীর বিশ্বাসে তিনি আশায় ছিলেন, যদি নিজের ভুল বুঝতে পেরে বউমা আবার ফিরে আসে।

জোয়াল কাঁধে

খোকন ভীষণ দুষ্টু হয়েছে। কাজের সময় সে ভয়ানক জ্বালায়। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। ভাঙচুর করে। ছোট্ট বয়সে খোকনদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। অথচ, এসব ওর মা মীনার পছন্দ নয়। মীনার শাসন, খোকনের কোমরে দড়ি। দড়ির অপর প্রান্ত তক্তপোশে বাঁধা। বিয়ের অনেক বছর পর খোকন এসেছে তাই, এতকালের শূন্য বাড়িটা কী যে পরিপূর্ণ! সুন্দর স্বর্ণময় উজ্জ্বল। প্রাণবন্ত এবং মুখরিত। তবু, ওর শাস্তি কেন?

মীনার মতে, ছেলেটা বড্ড বেয়াদপ হচ্ছে। দস্যু। ডাকাত। এসব কি ওর আদরের কথা? বোধহয়। তবে এটাও গূঢ় সত্য, সে একমাত্র সন্তানকে এখন থেকেই কঠোর শাসনে শান্ত সংযত নম্র ভালোমানুষ করে গড়ে তুলতে চায়। এতটা আমার ভাল্লাগে না। মীনা এখনই যা চায় সেতো খোকনদের লক্ষণ নয়। বরং খোকনদের বুড়িয়ে ফেলার অপচেষ্টা। আমার এই একান্ত নিজস্ব মতামতটা কিছুতেই দৃঢ়তার সঙ্গে মীনার কাছে ব্যক্ত করতে পারি না। মনের গভীরে ব্যাপক প্রস্তুতি অনুশীলন ব্যর্থ হয়ে যায়। এরকম ব্যর্থতা আমার ছেলেবেলা থেকেই চলে আসছে।

মারাদোনা কলকাতায় সদলবলে প্রদর্শনী ফুটবল খেলতে আসছে। চোপরা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপকে আশি লাখ টাকার একটা নতুন কাজ পাইয়ে দিয়ে সেই খেলা দেখার দুষ্প্রাপ্য একখানা টিকিট পেয়েছি। সুতরাং, দীর্ঘ পনেরো বছর পর আজ আমি কলকাতায় যাব। বারাসত মীনার বাপের বাড়ি। কলকাতায় অনেক আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং, সেও আমার সঙ্গে যাবে। সকাল থেকে তারই প্রস্তুতি চলছে।

কলকাতা ভাবতে প্রথমেই আমার মনুমেন্টের কথা মনে আসে। বেশ কয়েক বছর আগে মনুমেন্টটা শহিদ মিনার হয়ে গেছে। নিচে থেকে তাকিয়ে শহিদ মিনারকে আকাশ ছুঁতে দেখা যায়। আর ওপর থেকে কলকাতা কতটুকু? শিশু। কিশোর বয়সে বাঙাল আমি কলকাতার ময়দানে সর্বপ্রথম মনুমেন্ট দেখেছিলাম। ঊর্ধ্বমুখে অপলক চোখ চেয়ে পরম বিস্ময়ে। আকাশমুখি মোরগের মতো কক্-ক-কক্-ক শব্দটা কলকাতার মতো শুনতে লেগেছিল। আর মনুমেন্টের ওপর থেকে কলকাতা দেখেছিলাম মাথা নত করে। সেই থেকে কলকাতার সব কিছুতেই আমার মাথা আনত হয়ে যায়। কলকাতার সব কিছুই আমার কাছে প্রণম্য। রসালো আখের খণ্ড কিংবা চিনাবাদাম চিবোতে চিবোতে মেঠো ম্যাজিক সার্কাস এবং বাঁদর নাচ দেখতে দেখতে মনে হতো, কলকাতায় সব কিছুতেই বড্ড বেশি নাচানাচি। আর এখন আমি—শহিদ নাকি মমি? আমার সরল স্বীকারোক্তি, মীনাকে আমি রীতিমতো ভয় করি। কীসের ভয়? সংঘর্ষের। আমি তাই, দাম্পত্য জীবনে নিস্পৃহ থেকে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী।

জানলার সুদৃশ্য গ্রীলের ফাঁকে আমার দৃষ্টি প্রায়শ দে ছুট্। মুক্ত পাখি। বিস্তৃত নিঃসীম শূন্যে নীড়-ছাড়া পাখিদের উড়ে যেতে দেখছিলাম। সূর্যডোবা অনেক সন্ধ্যায় ওদেরকে নীড়ে ফিরতেও দেখি। আমি কী অলস! পাখি ওড়া দেখতে গিয়ে সময়মতো জুতোর কলপ লাগাইনি বলে মীনা সেরকমই বলে যায়। যাবার আগে বলে, এখানে এই বিহারে যেমন খুশি থাকো। কলকাতায় যাচ্ছো, জুতোটা পালিশ করে নাও।

আসলে, আমি পায়ের জিনিসকে আদর করে মাথায় তোলায় বিরোধী। মাথার চুলে আমিতো বেশ পরিপাটি। এসব কথা এখন মীনাকে কিছুতেই বলার নয়। মীনা বড় মুখরা এবং বদমেজাজি। আজ সকাল থেকে দু'টোতেই ভর করে আছে। এমনিতেই পড়শিজনের সন্তানেরা মীনার কাছে অনেক সময় পাখি-সংবাদ হয়ে যায়। আমার কানের কাছে সেযে কি নিন্দুকি কিচির মিচির করে। আমার কষ্ট হয়। আর আজ সকালে বারান্দায় ঝুলন্ত খাঁচা থেকে আমাদের পোষা পাখিটাই উড়ে পালিয়েছে। এতকাল পরম যত্ন আদর ভালবাসায় বুড়ো আঙুল দেখানো? অকৃতজ্ঞ বেইমান—সাতসকালে মীনার কতশত গালমন্দ। মাথা কোঁটা চিৎকার চেঁচামেচি। আমি নিস্পৃহ।
অনেক খোঁজাখুঁজিতে জুতোর কালিটা পাওয়া যায় না। ওটা মাঝে মাঝে খোকনের খেলনা হয়ে থাকে! হাতে তেমন সময় ছিল না। মীনা বলে, আর খুঁজতে হবে না। স্টেশনে পালিশ করিয়ে নিও।
মীনা আর খোকনকে ট্রেনে বসিয়ে আমি প্লাটফর্মে একটি গরিব খোকনের কাঠের বাক্সে পা রাখি! মীনা ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে এদিকে তাকিয়ে। পালিশ চলতে থাকে। প্লাটফর্মে কত বিচিত্র সব মানুষ জন। কত সে খোকন! আমি দেখছিলাম, কত যে খোকনেরা ভিক্ষে করছে। ওদের বাবা মা আছে কি? তাদের মনটাও কী মীনা এবং আমার মতো? এসব ভাবনা বা তুলনার কোন মানে হয় না। তবু, আমি ভাবি। ভাবতে ভাল লাগে।
আমার বাবা মা ছিলেন। বাবা অঢেল দেনা এবং তিনটি নাবালিকা বোন সহ মা-র সর্বময় দায়িত্ব একমাত্র তরুণপুত্র আমার হাতে অর্পণ করে অন্যলোকে চলে যান। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন, সুখে থাক।
আমার কাঁধে কি যে বিষম দায় দায়িত্ব কর্তব্য। রীণা বীণা নীনা—তিনটি বোন ফুলেরই মতন। বাবা বেঁচে থাকতে ভীষণ দুষ্টু ছিল এবং জ্বালাতো। বাবা চলে যেতে হঠাৎ পরিবর্তন। ওরা আমার কষ্টে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। ট্যুইশনি করে স্কুল কলেজ পড়েছে। স্কুলে টিচারি করে নিজেদের বিয়ের গয়নার টাকা জমিয়েছে। তবেই না আমি পেরেছি। ওরা বিয়ের পর নিজেদের সংসার দেখতে দেখতে দাদার জন্যে বউদির খোঁজ করেছে। শুনে বলেছি, আমি বুড়িয়ে গেছি। এখন আর কিছুতেই বিয়ে নয়। ওরা কিছুতেই শোনেনি।
ট্রেন ছুটছে দুরন্ত গতিতে। ইঞ্জিনের ভারি হুইসীল। শব্দ শুনে মাঠে খোকন-গরু ভয়ে লাফায়। ছুটে পালায়। মীনার কোলে আমার খোকন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমায়। খোকনের নামে আমি রেকারিং ডিপোজিট খুলেছি। মীনাকে নমিনি করে বড় অঙ্কের লাইফ ইনসিওর করেছি। গোটা দুই ফিক্সড ডিপোজিট এ্যাকাউন্টস আছে। প্রভিডেন্ড ফাণ্ড গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য সিকিওরিটি কার? খোকন এবং মীনার।
দু'ধারে রুক্ষ লাল মাটি। কয়লার স্তূপ। ঢাল জমি। কাঁকুড়ে পথ। ঝলসানো বন। ধূসর তামাটে আকাশ। উষ্ণ বাতাস। চায়ের জমি ফেটে চৌচির। শূন্য বুকে পুকুর ডোবা। মেঠো পথে ধুলো উড়িয়ে গরুর গাড়ি যায়। চাকা দু'টোয় গোঙানি কান্নার শব্দ ছড়ায়।
আজকাল প্রকৃতি—ঋতু ঠিকঠাক চলে না। এখন হিসেব মতে বর্ষাকাল। অথচ, বিহার বাংলায় দারুণ খরা। তবু, দু'ধারে শস্যক্ষেতে চাষী। কিসের আশায় লাঙল চালায়? ক্ষীণস্রোতা খালের বাড়ন্ত জল একমাত্র ভরসা। ডোঙায় জল তুলে কত আর রুক্ষতা ম্লান হয়। শ্যামলিমা আসে

কতটুকু! বড় দুঃখ ব্যথার দগ্ধ মাঠেরা শক্ত বুকে। চাষীর বুক তার চেয়েও নির্মম শক্ত। ওরা লাঙল চালায়। মাথার ঘাম কপাল গড়িয়ে বুকের ঢালে বন্যা আনে। জোড়া বলদের পা অসাড় হয়ে আসে। ক্লান্তিতে চোখ নিবু নিবু। জিব শুকিয়ে কাঠ। গর্দানে রক্ত ঝরে। মুখের কশ বেয়ে সফেদ ফেনা গড়ায়।

খোকন কখন যেন জেগে উঠেছে। সে এখন মীনার কোলে ঠিক মীনার মনের মতো বসে। দিগন্তের দৃশ্য দেখে খুশিতে ঝলমল। বাইরে সব কিছু উল্টো মুখে ছুটতে দেখে আহ্লাদে আটখানা। মীনা হঠাৎ বলে, দেশ থেকে জোড়া বলদ ব্যবহার তুলে দেয়া উচিত। ব্যাপারটা জঘন্য পাশবিক।

অনেক কাল পর মীনার একটা মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। মনে হয়, মীনাকে চিনতে হলে চার দেয়ালের বাইরে চাই। ওর ওপরটা সত্যিই তাহলে রুক্ষতায় ঢাকা। ভিতরে ভালবাসার ফল্গুস্রোত বয়ে যায়। শুধু মীনা কেন—আমাদের প্রত্যেকের মন ঘরের বাইরে কম বেশি উলঙ্গ উন্মন এবং দরদি বোধহয়। আমার তো তাই মনে হয়।

এক্ষণে আমাদের কমপার্টমেন্টের সকলে পরস্পরের কষ্ট বুঝে চলছি। সামান্য সময়ে অনেকেই আমার খোকনকে ভালবেসে ফেলেছে। সে এখন একের কোল থেকে অপরের কোলে ঘুরছে ফিরছে আদর কুড়োচ্ছে। তার হাতে হরেকরকম খেলনা খাবার প্রীতি উপহার। সে দারুণ খুশি। খুশিতে সহযাত্রী আধুনিকার কোল ভাসায়। মীনা ছিঃ ছিঃ চিৎকারে খোকনকে রক্তচক্ষু দেখায়। হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিতে যায়। বলে, ভীষণ অসভ্য হচ্ছো। মহিলাটি ভেজা কাপড়ে বিন্দুমাত্র বিরক্ত নয়। বাধা দিয়ে বলে, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন-ছেলেমানুষ। সভ্য হবার বয়স যত দেরিতে আসে ততই ভাল।

মীনা পিট পিট হাসে। মহিলাটিও। কাছাকাছি অনেকের ঠোঁটেই চিলতে হাসি। ধূপকাঠি বিক্রেতা খোকনটিও হাসিতে লুটোপুটি খায়। প্যাকেটগুলো এগিয়ে অনুরোধ জানায়, একটা প্যাকেট অন্তত নিন মাসিমা। জ্বেলে দিন—সুন্দর গন্ধ ছড়াবে। মহিলাটি ক্ষেপে আগুন। ধমকে ছেলেটিকে তাড়া করে। ওর তেল চিটচিটে গেঞ্জি অপরিচ্ছন্ন শরীর দেখে নাক চোখ ভুরু কোঁচকায়। বলে, বখাটে ছেলে ঠাট্টা হচ্ছে। আমি আবার তোর মাসি হলাম কবে!

কম্‌পার্টমেন্ট ভর্তি শুধু হকার আর হকার। অনেকেরই অসহ্য। ধূপকাঠি চানাচুর মশলামুড়ি সোডাজল লজেন্স ফাউন্টেন পেন—আরো কত কিছুর হকারি। প্লাটফর্মে চা-গরম সিঙ্গাড়া গরম ডালপুরি খেলনা আর পেপার বিক্রি—সর্বত্র অল্পবিস্তর খোকনেরা আছে। খোকনেরা বিড়ি খায়। পকেট মারে। চুরি ছিনতাই করে। গান গেয়ে ভিক্ষে করে। আরো কত কীযে করে। খোকনেরা বড় দুষ্টু এবং জ্বালায়।

আমি ঘন ঘন চা সিগারেট খাই। মীনা সিঙ্গাড়া বাদাম মশলামুড়ি খায়। সিনেমা পত্রিকার পাতা ওল্টায়। খোকন মাঝে মাঝে ফ্লাক্স থেকে দুধ খায়। টফি বিস্কুট লেবু খায়। জাগে—ঘুমায়—জাগে। সময় দ্রুত গড়িয়ে যায়। ট্রেনপথ ক্রমশ ফুরিয়ে আসে।

মীনা একসময় জিগ্যেস করে, কলকাতায় গিয়ে উঠবে কোথায়? আমি বলি, আমার দিক থেকে বন্ধু বিমল ছাড়া আর কেইবা আছে। ওর প্রথম সন্তানটা মরে যেতে ডাক্তার বলেছে, আর সম্ভাবনা নেই। খোকনকে পেলে ওরা দু'জনেই খুব খুশি হবে। মীনা আপত্তির কারণ দর্শায়, খোকনকে দেখে ওদের দুঃখটা বাড়তেও পারে।

আমাদেরও তো সম্ভাবনা ছিল না।

আমার মতে, সেকারণে ওরা আশার আলোও দেখতে পারে।
মীনা এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। বলে, ওদের জয়েণ্ট ফ্যামিলি। জায়গার বড় অভাব। ঘরগুলো কেমন অন্ধকার স্যাঁতস্যেতে। বাথরুমটাও মোটেই ভাল নয়। খোকনেরও খুব কষ্ট হবে।
কথাগুলো মীনা এমনভাবে বলে যায় যেন ওদের ঘরে কখনও কোন খোকন ছিলনা বা এখনও নেই। আমি বিতর্কে যেতে বিমুখ। জিজ্ঞাসা করি, তবে? মীনা যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে প্রস্তাব রাখে, বড়দির ওখানেই চল যাই।
মনে মনে ভাবি মন্দ কী। বড়দির পুরুষ মানুষটিও লোক ভাল। মীনা আর আমার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক। কিন্তু মীনার মুখে শুনেছিলাম, ওদের নাকি দারুণ দারিদ্র্যে দিন কাটছিল। বড়দির ছোট মেয়েটিকে মেজদি নিয়ে গিয়ে মানুষ করছিল। মীনার কাছে তাই জানতে চাই, তোমার জামাইবাবু জীবনদার ব্যবসা নাকি ভাল যাচ্ছিল না—এখনকার খবর জানো? মীনা জবাব দেয়, জানিনা। তবু ওখানেই ভাল। ওরা ভীষণ ভালোবাসে। দু'এক রাত থেকে বারাসত চলে যাব। অনেকদিন পর দেখা সাক্ষাৎ হলে ভালোই লাগবে।
মীনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে। সেইমতো আমি ওর ইচ্ছা মেনে নিলাম।
আমাদের ট্রেনটা দু'ঘণ্টা লেটে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে। প্লাটফর্মে নামতে একজন খোকন কুলি ছুটে আসে। স্যুটকেশ দু'টো তুলে নেয়। স্টেশন ছাড়িয়ে বাইরে আসতে খেয়াল হয়, চারদিক ছেয়ে গাঢ় অন্ধকার। অর্থাৎ লোডশেডিং। স্ট্যাণ্ডে ট্যাক্সির জন্য দীর্ঘ লাইন পড়েছে। অথচ, কোন ট্যাক্সি নেই। তবে? বিব্রত বোধ করি। ঠোঁটের সিগারেটে জোনাকি—আগুন জ্বলে।
স্টেশনের ভিতর বাইরে এত নিঃস্বদের ভিড় কেন? তিন ইঁটে কাঠ জ্বালিয়ে রাতের রান্না চলছে ইতস্তত। অনিয়ন্ত্রিত পরিবার। গৃহহীন অদ্ভুত সংসার। তিন তিনজন সমর্থ পুরুষ ভিক্ষে চেয়ে যায়। কয়েকটি যুবতী অন্ধকারে নিম্নস্বরে কিসের দরদাম করে? খোকন-কুলি ইতি উতি তাকিয়ে দেখে। আমার ভাল্লাগে না।
কতক্ষণ আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। একটা টানা-রিকশা নিলে কেমন হয়? টানা-রিকশার কথা ভাবতেই বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। এরকম রিকশার প্যাডেল হ্যাণ্ডেল ব্রেক বাতি নেই। মটর নেই। তবে চলে কি করে? ভাবতেই আমি লক্ষ পা পিছিয়ে যাই। অথচ, মীনা টানা-রিকশায় চড়তে চায়। টুং টাং ঘণ্টি আর খটর খটর চাকার শব্দ ওর ভাল লাগে। ঝাঁকুনিতে নাকি ঝিম ঝিম তন্দ্রা আসে।
অতএব, আমাদের অন্তত একটা টানা-রিকশা চাই। টানা-রিকশাই বা মিলছে কোথায়। আমরা তাই স্টেশন চৌহদ্দি পেরিয়ে বড় রাস্তায়। বরাত জোরে মিটারে 'ডিফেকটিভ্' দর্শানো একটা ট্যাক্সি পেয়ে যাই।
এখানে ভাল বর্ষা হয়েছে। হয়তো অনেকদিন থেকেই। গর্ত জল নোংরা আবর্জনায় বিপদ জনক পথ। কুষ্ঠ রোগীর মতো। ট্রাম লাইন বিশ্রী দাঁত বের করে। দোকানে দোকানে কেরোসিন কারবাইড মোমের দরিদ্র আলো। যানবাহনের হেডলাইট চোখ ধাঁধায়। পরক্ষণেই অন্ধকার আরো বাড়ায়। সর্বত্র মানুষজনে গিজগিজ। এমনকি বাসট্রামের পাদানি হ্যাণ্ডেলেও। ফুটপাত ছাড়িয়ে ট্রাম লাইন পর্যন্ত বাজার—বিকিকিনি।

'রূপসী কলকাতা' হোর্ডিংটা মীনার নজরে পড়ে কি? সে গর্তে গড়ানো চাকার ওপর ঝাঁকুনি খেতে খেতে গজগজ গর্জায়। বলে, সমস্ত কলকাতাটা যেন ক্রমশ একটা বাজার হয়ে যাচ্ছে। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়, সেদিন কোন পত্রিকায় পাঠকের মতামত-এ দেখেছিলাম, কলকাতারই কে যেন লিখেছে, সমস্ত কলকাতা শহরটা একটা বেশ্যালয় হয়ে যাচ্ছে।
মীনা সাধারণত কলকাতা সম্পর্কে কারও বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। তর্ক জুড়ে দেয়। সেহেতু, আমার মন্তব্যের মতো সংবাদ সংযোজন ব্যাপারটা ওকে যথেষ্ট উত্তেজিত করে তোলে। সে সুর পাল্টায়। বলে, লেখকের উচিত কলকাতা ছেড়ে তীর্থ ক্ষেত্রে চলে যাওয়া। সে জানেনা, পচা সমাজ ব্যবস্থায় পেটের জ্বালায় অনেক কিছুই হয়।
যেমন ট্রেনে টিকিট না-কাটা চুরি ডাকাতি ছিনতাই এবং.......
থাম। তোমাকে আর টিপ্পনি কাটতে হবে না। মীনার কাছে আমি ধরা পড়ে যাই। সে আমার দিকে তির্যক তাকায়। বলে, বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে। অবক্ষয় হঠাৎ একদিনের কিছু নয়।
অতএব, সব যেন ক্ষমার পর্যায়—মীনা বোধহয় এরকম কিছু একটা বোঝাতে চায়। আমার জানতে ইচ্ছে করে, মানুষের শরীরে আরেকটা মোক্ষম জ্বালাওতো আছে—সেখানে কেড়ে নেয়া কেন পাশবিক হয়ে যায়? মীনাকে জিগ্যেস করবো? অসম্ভব। মনে মনে ধন্দ লাগে, মীনা কি আজকাল বামপন্থী হয়ে যাচ্ছে! তাহ'লে সেবার অটোমেশনের স্বপক্ষে আমাকে সমর্থন জানিয়েছিল কোন্ নীতিতে। আজ ট্রেনে বসে জোড়া বলদ ব্যবহার তুলে দেয়া উচিত বলেছিল কেন! সে আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে।
আমি যথেষ্ট সংযত ভাষায় সভয়ে জানতে চাই, আচ্ছা মীনা—বাঁচার তাগিদে যা কিছু করার স্বাধীনতা-সীমা ঠিক কতটুকু হওয়া উচিত— তোমার কি মনে হয়?
মীনা কোন গভীরতায় যেতে চায় না। আমার প্রশ্ন শুনে গর্জে ওঠে। বিরক্তির সঙ্গে মেজাজ দেখায়। বলে, জানিনা! চুপ করে থাকতো! সহজ কথাগুলোকেও পেঁচিয়ে ফেলা তোমার ভীষণ বদ অভ্যাস।
আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। স্পষ্টত বুঝতে পারি, নারীর কাছে স্বাধীনচেতা পুরুষের পরাধীনতা কোথায়। একারণেই আমি বিয়ের পর থেকে 'অধিকার' এবং 'স্বাধীনতা' শব্দ দু'টোর ওপর খুব একটা আগ্রহ দেখাই না। বরং সংসার সমাজ কর্মক্ষেত্রে—সর্বত্র অনুগত; এবং নিস্পৃহ।
ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাশে বসে একজন খোকন-হেল্পার। সে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে কি দেখে? মীনার শাসন, নাকি আমাদের কথার অর্থ খোঁজে? আমার খোকন পরম সুখে মায়ের কোলে। মোটেই দুষ্টুমি করছে না। জ্বালাচ্ছে না। অন্ধকারে ভয় পেয়ে মীনার মনের মতো হয়ে যাচ্ছে। আমিও নাকি ছোটবেলায় মায়ের মনের মতো শান্তশিষ্ট সুবোধ ছিলাম। এসব ভাবতে আমার মোটেই ভাল্লাগে না।
অনেক কায়দাকানুন করে ট্যাক্সিটা ঠিক ঠিক মীনার বড়দি-বাড়ির দরজার পৌঁছে যায়। গলির ওপারে মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে জেনারেটারে বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে। বোর্ডের ঝলমল আলোয় দেয়াল স্তম্ভে লেখা দেখা যায় 'কুলদাকুঞ্জ'। পিতৃকুলের কারও নাম হবে সম্ভবত। বেশ প্রাচীন বাড়ি। রংচং মেরামত হয়নি কতকাল। এমনিতেই জরাজীর্ণ। তারপর লোডশেডিং। ভূতের বাড়ির মতো। জং ধরা গেট—গ্রীলের ঝুলন্ত তালা বাজিয়ে মীনা কলিং বেলের কাজ সারে। ভিতর মহল থেকে

শব্দটা গড়িয়ে আসে, কে-এ-এ-এ। মীনার বড়দি পারুলদির কণ্ঠস্বর। পনেরো বছর পর হলেও চিনতে অসুবিধা হয় না।
আমি মীনা।
কে মীনা? অন্ধকারে ভাসন্ত প্রদীপের মতো টিমটিমে কেরোসিন বাতি এগিয়ে আসে। লণ্ঠন হাতে সামনে কে দাঁড়িয়ে?
ওমা মীনা তুই? পারুদি প্রায় চিৎকার করে ওঠেন। হাঁক দিয়ে বলেন, জয়া গেটের চাবিটা নিয়ে আয়। দেখ কে এসেছে। জয়া ছুটে আসে। গেট খুলে দেয়। খোকনকে কোলে তুলে নেয়। আমাকে উদ্দেশ করে বলে, ভিতরে আসুন। কি ভাগ্য আমাদের!
জয়া তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছে। সেবার ওকে আমি একবাক্স টফি আর একটা ফ্রকেই দারুণ খুশি করতে পেরেছিলাম। আমি বলি, ভাবতেই পারিনি যে তুমি এত লোভনীয় বড় হয়ে গেছো।
জয়া লজ্জা পায়। মিষ্টি দেখায়। মীনা ততক্ষণে পারুদির সঙ্গে অন্তঃপুরে। জয়ার পিছনে ওরা দু'জন কে? শীর্ণ চেহারা। ম্লান বিষণ্ণ চোখ মুখ। বড় করুণ। এই সেই অপু তপু যমজ দু'ভাই। ভাল নাম অর্পণ তর্পণ। জয়ার থেকে বছর তিনেকের ছোট। কী ভীষণ দুষ্টু ছিল। কী দুর্দান্ত দস্যিপনা। সেই দুষ্টু ছোটবেলায় কী সুন্দর মিষ্টি চেহারা ছিল ওদের! টিকলো নাক। দুধে আলতা রঙ। কুঁচকুঁচে চুল। আর এখন? যেন অকাল-বার্দ্ধক্য। নাকি বজ্রদগ্ধ নবীন গাছ?
অপু তপু কী ভীষণ পাল্টে গেছে। ওরা দু'জনে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। তারপর ছিনিয়ে নেওয়ার মতো স্যুটকেশ দু'টো নিয়েই দে ছুট্।
জয়া আমার জন্য একখানা ছিমছাম সাজানো ঘরের দরজা খুলে দেয়। লোডশেডিং ওভার। ঘরময় ফ্লোরোসেন্ট বাতির আলো ঝলমল। কী সুদৃশ্য সাজানো ঘর। অভিজাতদের বৈঠকখানার মতো। সেবার অপু তপুকে দেয়া খেলনা বন্দুক আর কাঠের ঘোড়াটা সযত্নে সাজানো।
জয়া আমার সেবা যত্ন আতিথেয়তায় তৎপর। এমন আচরণ করছে যেন আমি একজন ভি আই পি। সে নিমেষে সবকিছু গোছগাছ করে দেয়। এক কাপ গরম চা এগিয়ে দিয়ে বলে, খেয়ে একটু জিরিয়ে নিন। জল তোয়ালে সাবান দেয়া আছে। হাত মুখ ধুয়ে চুপচাপ আরাম করে বসুন। আমি জল খাবার নিয়ে আসছি। পারুদি দু'চারবার এসে ঘুরে যান। টুকটাক কথা বলে ব্যস্ততায় চলে যাওয়ায় ঠিক জমে না।
জীবনদা বেশ মজাদার লোক। দিনে ছয় সাত বাণ্ডিল বিড়ি খান। দশ থেকে পনেরো কাপ চা চাই। জমিয়ে গল্প করতে পারেন। কৌতুকপ্রিয় সরল উদার মন। দারুণ ফুর্তিবাজ। কোন সমস্যার গভীরে যান না। শুধুই ভেসে বেড়ান। সম্ভবত এখন তিনি বড়বাজারে তিনপুরুষের ব্যবসা তেল মশলার গদিতে।
জয়া জলখাবার দিয়ে যায়। ডজন খানিক লুচি। বেগুন ভাজা। ডিমের ওমলেট এবং চারটে বড় সাইজের মিষ্টি। দীর্ঘ ট্রেন জার্নির পর আমি বেশ আয়েশ করে খাই। খাওয়া শেষ হতে জীবনদা ঘরে ঢোকেন। সঙ্গে এক কৌটো বিড়ি। এক ডিবে নস্যি। ঢুকেই জিজ্ঞাসা, মারাদোনার খেলা দেখতে বুঝি?
ঠিক তাই। তাছাড়া, অনেক দিন থেকেই বারাসত আসব ভাবছিলাম।
কোন্‌টা রথ আর কোন্‌টাইবা কলা?

আপনার কি মনে হয়?
জীবনদা আমার একটা সিগারেট চেয়ে নেন। সুখটানের ধোঁয়া উড়িয়ে জবাব দেন, কলকাতা যেমন নেচে উঠেছে মনে হয় কলা-ই দেখবে। টিকিটের বড্ড চড়া দর যাচ্ছে। তবু কিনতে হবে একখানা।
আপনিও তাহলে খেলা দেখতে যাচ্ছেন?
ধ্যেৎ। আমাদের ভাত কাপড় দরকার। ব্যবসার স্বার্থে দিতে হবে একজনকে।
আমার মনে আচমকা হাওয়া-ব্রেকের ধাক্কা লাগে। তাৎক্ষণিক সামলে নিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাই। কুশল বিনিময় করি। লঘুগুরু আলাপ আলোচনা চলে। কথা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করি, এখন দোকান থেকে এলেন?
না। গদি এখন অপু তপুর দখলে। বিধ্বস্ত এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখিয়ে বলেন, শরীরে কুলোয় না। তাসের আড্ডায় ছিলাম। খবর পেয়ে ছুটে এলাম।
কেমন চলছে ব্যবসা এখন?
ভাল। খুব ভাল। কয়েক বছর বেশ কষ্টেই ছিলাম। আজকাল ব্যবসার হালচাল কায়দাকানুন অনেক পাল্টে গেছে। আমি রাজনীতি বুঝি না। 'ভদ্রলোকের চুক্তি'ও বুঝি না। 'জরুরি অবস্থা'য় কোন্‌টা বেশি জরুরি তাও বুঝতে পারিনি। ব্যস, ব্যবসাটা ডুবতে বসেছিল। এখন অপু তপু হাল ধরায় বেশ ভাল আছি।
ওরা তাহলে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে?
না তা নয়। তবে দু'টো বছর ক্ষতি হয়েছে বটে। সামনের বছর দু'জনেই প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দেবে।
বলে কী! আমার দু'চোখে বিপুল বিস্ময়। ব্যবসা এবং পড়া—একই সঙ্গে এই বয়সে!
কত বয়স হবে ওদের এখন?
বিশ বছর।
জীবনদা সম্ভবত আমার প্রশ্নটার নেপথ্য অর্থ অনুমান করতে পারেন। তাই নিজে থেকেই জবাব জুড়ে দেন, বয়সে কি এসে যায়। দারুণ ব্যবসা-বুদ্ধি ওদের। খেলার টিকিট কেনা হবে ওদের বুদ্ধিতেই।
এই নিয়ে দু'বার খেলার টিকিটের প্রসঙ্গ এসে যায়। আমার বুকের ভিতর কাঁটালতা দোল খায়। আমি বিমর্ষ বোধ করি। জীবনদা বলে যান, ছেলে দু'টি দারুণ পরিশ্রমী হয়েছে হে। কোন নেশা নেই। আড্ডা নেই। জামাকাপড়ে বিলাসিতা নেই। কলকাতার কোন ফালতু ফুর্তিতেই ওদের আগ্রহ নেই।
ছেলেদের গুণের কথা বলতে বলতে অপু তপু-র বাবা জীবনদার চোখমুখ গর্ব ও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জয়া এসে রাতের খাবারের ডাক দিয়ে যায়।
খাবার টেবিলে মহাভোজের আয়োজন। ভাতের থালা ঘিরে সাকুল্যে সাত সাতটি বাটি। গরম ভাতের ওপর ভাজা এবং ঘি। ভাতগুলো কোনমতেই রেশন-চালের নয়।
কিন্তু খাবার টেবিলে আমরা দু'জন কেন—অপু তপু গেল কোথায়? ওরা তো আর আমার কাছে আসেনি। ভয় পাচ্ছে, নাকি আমাকে অপছন্দ করে দূরে সরে থাকছে? প্রশ্নগুলো মনের ভিতর বুদবুদ তোলে। আমি জিগ্যেস করি, অপু তপু বসবে না—ওরা গেল কোথায়?

জয়া কাছেই দাঁড়িয়েছিল। জবাব দেয়, খেয়ে গদিতে শুতে গেছে। একবার চুরি হয়েছিল তারপর থেকে ওরা ওখানেই শোয়।
জয়াকেই আবার জিগ্যেস করি, আমরাতো হঠাৎ এসেছি—এতসব আয়োজন হলো কখন?
জয়া বলে, ডিমটাই যা রাড়তি। বেশি পদ নাহলে বাবার চলেই না।
জীবনদার সামনের দাঁত দু'টো নোঙর কাঁটার মতো। দু'ধারে গোটা তিনেক দাঁত নেই। ভাঙা চোয়াল। বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাচ্ছিলেন। রসিয়ে মাছের কাঁটা চিবোতে চিবোতে বলেন, আজকের মতো চালিয়ে নাও হে ভায়রা। বিহারেতো তেমন মাছ পাও না। কাল গঙ্গার ইলিশ আনবো। তাজা গলদা চিংড়ির মুড়ো ভাজা হবে। কই মাছের ঝাল খাওয়াবো। আর—
আরো কত কিযে বলতে যাচ্ছিলেন। আমি থামিয়ে দিয়ে বলি, এতটা বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। এক আধটু সঞ্চয়ের কথা তো ভাবতে হবে।
জীবনদা বলেন, বাড়াবাড়ি আর কী! হিসেব করে চলা আমার বাপ ঠাকুর্দা শেখায়নি।
পারুদি রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। এবার খুব নিম্নস্বরে স্বগতোক্তির মতো মন্তব্য জুড়ে দেন, যা শিখিয়েছে তাহ'ল ব্যবসার মূলধন বউয়ের গহনা পর্যন্ত খেয়ে ফেলাতেই জীবনের যত শান্তি।
কথাটায় জীবনদার পৌরুষে কাঁটা বেঁধায়। আমার সামনে বসে এভাবে শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আমি চোর চোখে জীবনদার মুখে লজ্জা সঙ্কোচ প্রত্যক্ষ করি। সাময়িক চুপসে থেকে জীবনদা চাপা ক্রোধে বাঁকা জবাব দেন, বটেই তো। বেশি তেল নাহলে নাকি রান্নাই জমে না। রাতে রুটি খেতে গেলে অম্বল হয়। রেশনের আতপচালে পেট ভরে না। চুনো মাছ দেখলে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়। অথচ, সব দোষ আমার।
সর্বনাশ! পারুদি যদি বোন মীনার মতো হয়? স্পষ্টত অনুমান করি, জীবনদা আমার মতো নিস্পৃহ নন। রীতিমতো লড়াকু। সংঘর্ষ অনিবার্য। আমি বিব্রত বোধ করি। দোষটা আমারই। সঞ্চয়ের কথা বলাতেই তো এই তিক্ততার সূত্রপাত। সুতরাং, প্রসঙ্গ পাল্টে দেয়া প্রয়োজন। এই মুহূর্তেই। আমি বলি, জয়ার বিয়ের চেষ্টা করছেন কিছু?
মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে যেতে মনে হয়, এই প্রশ্নটাও বোধহয় ঠিক হলো না।
মীনা কাছে নেই। পথের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। খোকনও। জয়া ওর মাসিকে খেতে ডাকার অজুহাতে উধাও হয়ে যায়। তাহ'লে উপায়? পারুদি ক্ষোভ-কণ্ঠে বিদ্রূপ করেন, পড়া ছাড়িয়ে ঝি-র টাকা বাঁচাচ্ছে। ঠোঙা বানিয়ে অর্ডারি সেলাই করে মেয়েযে দু'টো পয়সা রোজগার করছে। বিয়ে দেবে কোন্ দুঃখে।
পারুদির কণ্ঠ ভারি হয়ে আসে। নিজেকে সংযত করে নেন। অস্পষ্ট ভেজা গলায় বলেন, কচি দুধের ছেলে দু'টো—
দিদি তুই থামতো। মীনার কণ্ঠ। সে কখন যেন উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার নিশ্চিত সব মিটে যাবে। দু'জনেরই খাওয়া শেষ হয়েছিল। জীবনদা হাত মুখ ধুয়ে জিবের ডগায় শব্দ তুলে পরম সুখে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে চলে যান। যাবার আগে বলেন, জয়ার বিয়ে নিশ্চয়ই দেব। তবে দাবিহীন পাত্র চাই। জয়া মা আমার লক্ষ্মী প্রতিমা।
নিজেকে ভীষণ একা এবং বোকা লাগে। আমি কী অত সহজে জীবনদার মতো উঠে চলে যেতে পারি? পরিবেশটা কেমন যেন হিমশীতল নিস্তব্ধতায় গ্রাস করে নেয়। বিষণ্ণতার ছায়া নেমে

আসে। মীনার যত শাসন আমার ওপর। আমার দিকে কটমট করে তাকায়। সমস্ত নিস্তব্ধতা চুরমার করে আমার ওপর গজরাতে থাকে। বলে, তোমাকে নিয়ে যত বিপদ। এ সংসারের তুমি কতটুকু জানো? ঘরোয়া ব্যাপারে তোমার নাক গলানোর কি দরকার ছিল!
ঠিকই তো। এখন তো মনে মনে আমিও তাই ভাবছি। আমি অনুতপ্ত। নির্বোধ অপরাধীর মতো চুপচাপ বসে। মীনার ভয়ে কাঁপছি। ওর শাসনে এবার বোধহয় আমার ইজ্জত যায়। সুতরাং, দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে আসি।
জীবনদা বেশ মৌজ করে মশলা চিবোচ্ছিলেন। একটু আগেকার ব্যাপার নিয়ে মুখে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর নেই। আধপোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে বলেন, দাওহে তোমার আরেকটা সিগারেট খাই।
আমার জন্য পরিপাটি বিছানা মশারি সাজানো হয়েছে। শিয়রের কাছে টেবিলে রাখা গেলাসে খাবারের জল ঢাকা। বালিশ দু'টো কাছে টেনে আলতো গা এলিয়ে দেই। তারপর দু'জনে সিগারেট ধরাই। দীর্ঘ টানের মুঠো মুঠো ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে জীবনদা বলেন, আসলে কী জানো ভায়রা, সংসার ছেলেমেয়েদের মায়েরাই নষ্ট করে।
কি বলবো আমি? পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলি সেই ভয়ে বোবা বনে যাই। কোন কথা নয়। দীর্ঘক্ষণ দু'জনে নীরব ধোঁয়া ওড়াতে থাকি। যেন একরাশ লজ্জা বুকে দু'জন পরাজিত পলাতক পুরুষ আমরা। কারও মুখে কোন কথা নেই। কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছি না। একসময় জীবনদা বলেন, অনেক রাত হলো এবার চলি।
জীবনদা ঘুমোতে চলে যান। আমি একা হয়ে যাই। ভীষণ একা। আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। বুকের গভীরে কিসের যন্ত্রণা? খেলা দেখার টিকিটটা টেবিলে রাখি। পেপার ওয়েটে চাপা দেই।
সারারাত আমার চোখের সামনে অপু তপু-র বিষণ্ণ মুখ নিবন্ত চোখ আর ভাঙা চোয়ালের শীর্ণ চেহারা ভেসে বেড়ায়। অস্ফুট ক্ষোভ অভিমান আর বোবা কান্না জমানো ওদের বুক। ওরা কাজ করে। সংগ্রাম করে। ওদের ঘাম রক্ত অশ্রু ঝরে। ওরা কী স্তব্ধ ঝরণা, শীতল আগ্নেয়গিরি, নিস্তরঙ্গ নদী? অথবা অন্য কিছু। খোকনের জন্য আমার ভয় হতে থাকে। খোকন বড় বেশি শান্তশিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাল সকালেই আমি ওদেরকে নিয়ে বারাসত চলে যাব। মীনা তীব্র আপত্তি করবে জানি। তবু, কিছুতেই আমি ওকে আর ভয় পাব না। নির্ঘাৎ দুষ্টু খোকনদের মতো বেয়াদব হয়ে যাব।

নিঃসন্তান জনক

ব্যতিক্রম একমাত্র একলব্য। সারাদিন অক্সিজেন স্যালাইন আর কোমায় থাকার পর আমাদের পিতৃদেব বাসুদেব বাপুলি চিরশান্তির আনন্দধামে চলে গেলেন। আশি বছর বয়স হয়েছিল। এ যাত্রায় তিনি যে আর হাসপাতাল থেকে কাঁথির নিজ আবাসে জীবিত ফিরবেন না তা সবাই অনুমান করেছিলাম। স্বভাবতই মানসিক প্রস্তুতি থাকায় কেউই তেমন শোকাবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়ল না। একমাত্র একলব্য অসহায় আর্তনাদ করে উঠল। দাদাদের পরিবর্তে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ কান্নায় বলল, এখন আমার কি হবে?

কিসের জন্য একলব্যর আতঙ্ক, আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা বুঝতে অসুবিধা হল না। নামটা আমার দেওয়া হলেও একলব্য কিন্তু আমাদের গর্ভধারিণীর গর্ভজাত নয়। আমাদের ছয় ভাইয়ের সর্বকনিষ্ঠা পারুল ছিল বাবার অতিপ্রিয় আদরের একমাত্র কন্যা। ওর বিয়ের পর বাবা দারুণ নিস্তেজ চুপচাপ বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। সেইসময় মাত্র তিনদিনের জ্বর-ভোগে মা অসময়োচিত গঙ্গা লাভ করেন। সেকারণে বাবা দুঃসহ নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেন।

যাট একষট্টি বছর বয়সের সেই মানসিক অস্থিরতা-কালে বাবা অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনায় সবাইকে চমকে হতবাক করলেন। গাঁয়ে বায়ুবেগে ছড়িয়ে পড়া ঘটনাটি হল, চারুলতা নামে এক বাল-বিধবাকে বাবার পুনর্বিবাহ। নিরাশ্রয় সহায়সম্বলহীনা চারুলতা পরিবারের একজনের মতো ব্যবহার আচরণ মর্যাদায় আমাদের বাড়িতে থাকত। আমাদের গর্ভধারিণীর সর্বকালের সহকারী হিসেবে সাংসারিক কাজকর্ম করত।

অপ্রত্যাশিত অস্বাভাবিক হলেও আইন মোতাবেক বাবার এই দ্বিতীয় বিয়েটা আমি ছাড়া অন্য কেউই মনে মেনে নিতে পারেনি। আমার মতে, যথেষ্ট সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বাবা যে শারীরিক চাহিদা আর নিঃসঙ্গতা মেটাতে, কাটাতে অবৈধ কোনও গোপনীয়তা অবলম্বন করেননি সেটা ওঁর চারিত্রিক সততা পরিচ্ছন্নতার পরিচয়। আশ্রিতা এক বাল-বিধবার শূন্যতা পূরণ-প্রয়াসেও মহানুভবতার প্রকাশ।

একলব্য আমাদের দ্বিতীয় মা চারুলতার গর্ভজাত বাবার সন্তান সুবাদে আমরা সাত ভাই চম্পা একবোন পারুল। এমনতর আমি ভাবলেও বাবার চরিত্র সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আর বিচার বিশ্লেষণ বাকি কারও মন ছোঁয়নি। একলব্যকে পারুলসহ দাদারা কেউই সহ্য করতে পারত না। অন্যতম কারণ, স্বীয় স্বার্থজনিত।

আমাদের বাবা ছিলেন বিত্তশালী কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ। ওঁর বিস্তর বিষয় আশয় আর আড়তদারি ব্যবসায় একলব্য আকস্মিক আবির্ভূত অতিরিক্ত একজন অংশীদার অবশ্যই। তাই বলে ওকে অবাঞ্ছিত ভাবতে যাব কেন! জন্ম নেওয়ার মধ্যে ওর অপরাধটাই বা কোথায়?

এরকম আরও অনেক স্পষ্টবাদিতার জন্য আমি ক্রমশ অপ্রিয় হয়ে পড়ছিলাম। একসময় লক্ষ্য করলাম, নামেই একান্নবর্তী পরিবার। বাবা যেন অক্ষম নিস্তেজ এক অধীশ্বর। শাখা প্রশাখাগুলি স্বার্থ হিংসা লোভ লালসা—রোগাক্রান্ত। আমি সেই তিক্ত বিযাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিলাম। পেয়েও গেলাম।

আমার জেঠামহাশয় বঙ্কিমবিহারী বাপুলি চাযআবাদ বিষয়কর্মাদি পরিচালনায় ঠাকুর্দার সহযোগী হিসেবে অধিকাংশ সময় কাঁথি ছেড়ে সাগরদ্বীপে কাটাতেন। ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর পাকাপাকি এখানে

বসবাস শুরু করেন। সেই সময় থেকে বিত্তের পরিবর্তে নানা জনহিতকর কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন! যাত্রা ও সঙ্গীত প্রিয় জেঠামহাশয়ের দেবদ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। মন্দির মসজিদ নির্মাণে অর্থ ও জমিদানে সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল স্থাপন করেছিলেন। নারীশিক্ষা বিস্তারে অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য ওঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম লবণ আইন অমান্য করে তিনি কারাবরণও করেছিলেন। তেজস্বী হয়েও ওঁর ব্যবহার আচরণ ছিল সাধুজনচিত মধুর। জেঠামহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমি সাগরে চলে এলাম। ওঁর স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলাম। পরে হোমিও ডাক্তারি শিখে গরিবদের সেবায় ব্রতী হলাম। সাগরের মানুষের সুখ দুঃখ নিয়ে পত্রিকা প্রকাশনা শুরু জেঠামহাশয়েরই অনুপ্রেরণায়। আমাদের সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়াল গুরুশিষ্যের মতো।

সম্ভবত এসব কারণেই একমাত্র আমাকে একলব্যের বিশ্বাস্য নির্ভরযোগ্য মনে হয়ে থাকবে। আমি তাই ওকে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলাম। মাথার চুলে স্নেহের হাত বুলিয়ে অভয় দিলাম, এতে ভেঙে পড়ার কি আছে। আমিতো আছি।

সেই থেকে নিঃসন্তান আমি একলব্য নামে এক যুবকের জনক হয়ে গেলাম। একলব্যও আমার ভাই হয়ে পিতার মতো সম্মান শ্রদ্ধা করত। আদতে ছিল কৃতজ্ঞতা। সেটা যে নির্ভেজাল তা প্রমাণিত প্রিয় পরিচিত আত্মীয়জনদের জবানী থেকে। তাদের মুখ থেকে অপ্রাসঙ্গিক শোনা কথা, একলব্য বলছিল তুমি নাকি ওর বাবার মতো। ও তোমার সন্তানের চাইতেও বেশি কিছু। সুনাম শুনতে কার না ভাল লাগে! আমি আত্মসুখ অনুভব করতাম। গর্বে আমার বুক টই-টুম্বুর হয়ে যেত। ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আরও বেশি উৎসাহী অনুপ্রাণিত এবং আবেগতাড়িত হতাম।

এখন আমাদের দু'জনের সংসার বেড়ে পাঁচজনের।

স্নেহ ভালবাসা মায়া মমতার সঙ্গে ভাবাবেগ যুক্ত হওয়ায় প্রথম হয়েছিল তিন। নিঃসঙ্কোচে একদিন আমাকে ওদের দু'জনের সম্পর্ক জানাতে বাধ্য হল। মা গর্ভজাত সন্তানের সঙ্গে থাকতে চাইবেন সেটাই স্বাভাবিক। তখন হল চার। আমার স্ত্রী নিশা সহায়সম্বলহীন দরিদ্র চাষীর সন্তান। ওর ধারণা, গরিব-সেবায় ব্রতী আমি সহৃদয়তার সঙ্গে অসম বিবাহ করে সত্যিকার কন্যাদায় মুক্ত করেছি। কাজেই আমি অবতার নাহলেও মহানুভব মানুষ। এহেন মানুষের যে কোনও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সদা নির্বাক সমর্থক অনুগত থাকা যথার্থ ধর্ম। কাজেই দ্বিতীয়া মা ও একলব্যর একান্ন অবস্থান খুশি মনেই গ্রহণ করেছে।

চারজনের সংসার সুখ ও শান্তিরই ছিল। কিন্তু কথায় আছে যে, আদরে বাঁদর হওয়া। একলব্য লাগামহীন প্রশ্রয় আর আদরে তেমন লেখাপড়া করল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে মন মানসিকতার যে পরিপক্কতা আসে তা ওর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল না। না পারল চারিত্রিক শক্তি সামর্থ্য তৈরি করতে। তো নিজের পায়ে দাঁড়াবে কেমন করে।

আমার কিন্তু আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিন্দুমাত্র খামতি ছিল না।

অগত্যা উপায়ন্তর না দেখে আমার পত্রিকা প্রকাশনা কাজে ওকে নিযুক্ত করলাম। তাতে যা ঘটল তাকে অঘটন বা বিপত্তি বলা যেতে পারে।

আমার অনুপস্থিতিতে গরিব ঘরের সংগ্রামী মেয়ে নন্দিনী যে কিনা আমার প্রকাশনা সংস্থায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে প্রুফরীডারের কাজ করে একলব্য ওর প্রেমে পড়ল। প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে আমার ভাবনাচিন্তা অনেক উচ্চমানের। অপরিপুষ্ট চরিত্র গঠনে একলব্যর প্রেম সেই উচ্চমানের

ছিল না। ছিলমাত্র যৌবন বয়সোচিত জৈবিক তাড়নামুক্ত। ফলশ্রুতি, নন্দিনী নিঃসঙ্কোচে একদিন আমাকে ওদের দু'জনের সম্পর্ক জানাতে বাধ্য হল।

এখন কি চাও তুমি? আমি প্রতিক্রিয়াহীন সরল প্রশ্ন করলাম।

আপনার কাছ থেকে চাওয়ার মতো সাহস আমার নেই। নন্দিনী অপরাধিণীর মতো মুখ না তুলে অস্ফুট স্বরে বলল, ভেবেছিলাম একলব্য নিজেই আপনাকে জানাবে।

হয়তো তোমার মতো ওরও সেই সাহসটুকু নেই।

তাহলে? নন্দিনী বিষণ্ণ চোখ চেয়ে আমার দিকে তাকালো। ওর দৃষ্টির মধ্যে আমি যে অসহায়তা প্রত্যক্ষ করলাম তাতে বেশ দুর্বল হয়ে পড়লাম। সাময়িক বরফশীতল নিস্তব্ধতার পর ফের প্রশ্ন করলাম, একলব্যকে তুমি কতটুকু জান?

তেমন কিছু না। এটুকু বুঝেছি, আপনার মতো দেবতুল্য মানুষের ভাই কখনও অমানুষ হতে পারে না।

পারে। এরকম দৃষ্টান্ত আছে। তাছাড়া 'জিন' বলে একটা বিষয় আছে। একলব্য আমার বাবার ঔরসজাত হলেও একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান নয়।

সেটা অবশ্য একলব্য আমাকে বলেছে।

'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল/মেঘেই ফলুক খাতেই ফলুক দিলেই হল আলো'—আমি এই মতে বিশ্বাসী। একলব্যর আলোর বড় অভাব যে। তোমার সারা জীবনের সুখ দুঃখের ব্যাপার। কাজেই এই দিকটা তোমাকে ভাবতে হবে। আমি যা পারিনি তুমি পারবে সেই ঘাটতি পূরণ করতে?

আপনার আশীর্বাদ সহযোগিতা পেলে নিশ্চয়ই পারব।

তাহলে তো আর কোনও সমস্যাই থাকছে না।

আছে দাদা।

বিয়ে দেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ তোমার বাবার নেই এইতো?

সেটা তো আছেই। তারচেয়ে বড় বাধা হল, আমার বাবা একজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। জাতপাত বর্ণ নিয়ে বড্ড বেশি ছুৎমার্গ আছে।

আশাকরি, আমি নিজে গিয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারলে উঁনি আর অতটা গোঁড়ামিতে অনড় থাকতে পারবেন না।

আপনি সত্যিই যাবেন! নন্দিনীর চোখমুখ বিস্ময় কৃতজ্ঞতায় মাখা অবর্ণনীয় এক উজ্জ্বলতায় ভরে গেল।

নন্দিনী আনত হয়ে সাষ্টাঙ্গে আমাকে প্রণাম করল।

আমি ওর মাথার চুলে হাত রেখে অভয় দিলাম, নিশ্চন্তে থাক। এই বিয়ে হবেই।

এখন অমাদের সওয়া পাঁচজনের সংসার।

একলব্য-নন্দিনীর বিয়েটা সহজ সরল ছিল না। আমার অনেক লড়াই একাগ্রতা আর কষ্টের ফসল বলা যেতে পারে।

কিন্তু তাতে জীবন সুখের হয় কখনও। অনায়াসলভ্য প্রাপ্তির মধ্যে পরমানন্দ থাকে না। এই পরমানন্দ থেকে আজকের দিনের অধিকাংশ সন্তানেরাই বঞ্চিত। কেননা, সব কিছু প্রয়োজন যদি অভিভাবক মিটিয়ে দেয় তাহলে কষ্টার্জিত নিজের প্রাপ্তি আনন্দ আসবে কোথা থেকে! আমারতো দিতে আপত্তি নেই, দিচ্ছিও। কিন্তু বিয়ে করব অথচ স্ত্রীর ভরণপোষণের চিন্তা করবে অন্যজনে। সন্তানের জন্ম দেব, তার চাহিদার যোগান আসবে অন্যের কাছ থেকে। তাহলে সত্যিকার স্বামী বা বাবা হলাম কতটুকু?

এই সারবস্তুটা একলব্যর মগজে ছিল না। যা ছিল নন্দিনীর। সেটা প্রকাশ পেয়েছিল নানা প্রতিবন্ধকতায় যখন আমার পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল তখন।

সেই সময় কার্যত একলব্য আর নন্দিনী দু'জনেই বেকার। ওদের সন্তান চিরন্তন বেড়ে উঠছে আমার কেনা দুধ পান করে।

অথচ, একলব্য প্রতিক্রিয়াবিহীন। দিব্যি খায়দায় ঘুমায়। চড়েবড়ে বেড়ায়। প্রয়োজনে বাড়ির সকলের খিদমদগিরি করে। বিশেযত আমার ক্ষেত্রে আচরণটা অনেকটা অনুগত অনুচর বা চাকরের মতো হয়ে দাঁড়ায়—যা আমার বিলকুল অপছন্দ। আমি সেই ছোটবেলা থেকেই মোটামুটি স্বাবলম্বী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। জামাকাপড় কাচাকুচি ইস্তিরি থেকে চটিজুতো পালিশ করে গুছিয়ে রাখা কুয়ো থেকে জল তুলে স্নান করা ইত্যাদি কাজগুলি কোনদিনই নিশাকে করতে দেইনি। অথচ তা কিনা একলব্য নিজে থেকেই করে রাখবে মেনে নিতে আমার সায় ছিল না। বারণ করেও কাজ হতো না। বললামও একদিন, তুইতো আমার ভাই। পরগাছা ভাবিনা। তবু আগ বাড়িয়ে এসব করিস—আমার ভাল্লাগে না।

বেকার বসে আছি, তাইতো করি। একলব্য নিষ্পাপ খোলামনে বলল।

সাকার হওয়ার চেষ্টা করছিস কিছু? সেটা করা তোর উচিত। সামনের খোলা জমিতে অন্তত কিছু সব্জিতো ফলাতে পারিস। আমি তোর জায়গায় থাকলে তাই করতাম।

জানিনা আমার উপদেশটা নন্দিনীর বুকে বিদ্রূপ হয়ে বিঁধেছিল কিনা। সেই থেকে দু'জনের মধ্যে বাক বিতন্ডা খিটিমিটি লেগেই থাকত। ব্যাপারটা যদিও ঘটত রাতে দরজা বন্ধ ওদের শোওয়ার ঘরে তবু আমি টের পেতাম।

একসময় ওদের আচরণে অনুমান হল, দু'জনের মধ্যে বনিবনা আর শান্তির সম্পর্কটা ক্রমশ যেন উধাও হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতি, মা-র অনেক মন্তব্য আর বাতাসে ভাসিয়ে দেয়া সংলাপ শুনে মনে হতো নিশা আর আমার সম্পর্কে ওঁর ধারণাটা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। মা-র কাছে আমরা দু'জনে অতিদ্রুত অপরাধীর পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছি।

তোমার কি মনে হয় আমার অনুমানটা ভুল? নিশাকে জিগ্যেস করলাম একদিন।

তুমি দায়ীতো বটেই। নিশা আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিল অন্যভাবে, তুমি অতি উৎসাহী উদ্‌যোগী হয়ে ওভাবে বিয়েটা না দিলেই পারতে।

যেখানে পরস্পর ভালবাসা-বাসি, সঠিক পরিণতি তো বিয়েতেই। সেই কাজটাইতো আমি করেছি।

পরেও তো হতে পারত। নিশা বাস্তব দিশা শোনাল, তার আগে ওর নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার ছিল।

মানছি। আমি আত্মপক্ষ সমর্থনে বোঝাতে সচেষ্ট হলেন, অনেক মানুষ আছে যারা বেশি বয়সে প্রতিষ্ঠিত হয়। ততদিনে যে যৌবন পেরিয়ে যায় তাকেতো ফিরে পাওয়া যায় না। আমি ভেবেছিলাম,

চাপে পড়ে একলব্য আলস্য ঝেড়ে ফেলে দ্রুত বাস্তবমুখি হয়ে উঠবে। নৈলে আজীবন হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো অভ্যাসটাই থেকে যাবে।

নন্দিনীর দিকটাও তোমার একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

ভাবিনি কে বলল। আমার ভাইকেতো চিনি জানি। নন্দিনীর নিরাপত্তার দিকটা তাই বেশি করেই ভেবেছি। খবরের কাগজে তোমারও নিশ্চয়ই নজরে পড়ে। চারদিকে কত যে অঘটন ঘটে যাচ্ছে। বিয়ে করবে প্রতিশ্রুতিতে ভুলে মেয়েরা আজকাল আকছার প্রতারিত হচ্ছে। তারপর সেই কোর্টকাছারি আইন আদালত। এইসব সাতপাঁচ ভেবেছি বলেই না সাত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করেছি।

নিশা এবার নিরুত্তর রইল।

অনুমানে আশ্বস্ত হলাম, নিশা অন্তত আমাকে আর অপরাধী ভাবছে না।

ক্ষুদ্র তুচ্ছ এমন অনেক ক্রিয়া আছে যার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। এমন অনেক শব্দ আছে যা বড় ব্যথা হয়ে বুকে বাজে। এমন অনেক ছোট কাঁটা আছে যার জ্বালা দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমার কোন শব্দ বাক্য ক্রিয়া কাঁটা-কথা কখন কেমনভাবে নন্দিনীর কাছে পৌঁচেছিল জানিনা যার জন্য গোপনে সে নিজে কোনও কাজের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

একদিন শুনলাম, নন্দিনী নাকি আমার অনুপস্থিতিকালে রোজ কোথায় বেরিয়ে যায়। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসায় বলে, একটু দরকার আছে।

রোজ কোথায় যাও তুমি? আমি একদিন জিগ্যেস করলাম।

সেলস্ গার্লের কাজ করছি। নন্দিনী নির্ভীক সপ্রতিভ জবাব দিল।

আমাকে আগাম জানানো উচিত ছিল তোমার। নন্দিনীকে অভিযুক্ত করে বললাম, এই কাজে লাগার আগে আমার অনুমোদন নেয়া দরকার মনে করলে না?

আপনি অনুমতি দিতেন না জানি বলেই বলিনি।

অর্থাৎ কিনা আমার অপছন্দ। তাহলে সেই অপছন্দের কাজটা তুমি করছো কেন?

আপনার ভাইকে শিক্ষা দিতে।

একলব্য জানে?

বোধহয় না।

তাহলে ওর শিক্ষাটা হবে কেমন করে?

নন্দিনী অপরাধীর মতো নিরুত্তর।

কাজটা তোমার অন্যায় হয়েছে বুঝতে পারছো বলেই কোনও উত্তর দিতে পারছো না। আমি নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কি জিনিস বিক্রি কর তোমরা?

বরোজের পানে ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের রোগের ওযুধ।

এই কাজ পুরুষেরা করে না?

হ্যাঁ।

তাহলে একলব্য নয় কেন?

বলেছিলাম। বলল, দাদার অসম্মান হবে এমন কোনও কাজ আমি করতে পারবো না।

বাজে অজুহাত। আসলে একলব্য কামচোর। বসে বসে খেতে ভালবাসে। এখানেই আমার আপত্তি। কোনও কাজই একজন বেকার পুরুষের কাছে সম্মান হানিকর হওয়া উচিত নয়। এতো আর চুরি ডাকাতি স্মাগলিং বা অপরাধ জগতের কাজ নয়।

তাহলে আমার বেলায় আপনার আপত্তি কিসের?

একলব্য ঘরে বসে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে আর তুমি সংসারের কাজ ফেলে খেটে রোজগার করে আনবে তা হতে পারে না। আমার আপত্তি সেইখানে। তাছাড়া, তোমার ছেলের এখন বয়স কত? একবছর সবে পেরিয়েছে। ওকে দেখভাল করা তোমার এখন প্রধান দায়িত্ব। কাল থেকে তুমি বের হবে না। নাম ঠিকানাটা লিখে দিও। একলব্য যাতে ওই কাজটা করে সে ব্যবস্থাই আমি করব।

যদি রাজি না হয়?

সে দায়িত্ব আমার।

এমন সময় আচমকা একলব্য ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে শুনিয়ে আমি বললাম, এই কাজটা কাল থেকেই তুই করবি। যদি না পারিসতো নিজের পথ দেখে নিবি। বউমা আর খোকনের দেখভালের দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণভাবে নেব। ওরাতো কোনও দোষ করেনি। আসল আসামি তুই। তোকে আর কোনও আশ্রয়ই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না।

ওরা আমাকে মেনে নেবে কেন? একলব্য ছাড় পেতে প্রশ্ন তুলল, কাজটাতো সেলস্ গার্লদের।

কাজটা পানরোগের ওযুধ বিক্রি। মেয়ে পুরুষ কোনও ব্যাপারই নয়। যে কোনও মাধ্যমে বিক্রি হলেই হল। ওসব অজুহাত দিয়ে আমার কাছ থেকে ছাড় পাবি না।

বলছো যখন যাব।

শুধু যাতায়াত করলেই হবে না? রোজগার করতে হবে। সেইসঙ্গে রোজগারটা বাড়াতে হবে— এই মানসিকতা তৈরি করতে হবে। শুধু তাই নয়। এবার থেকে অল্পবেশি হোক ফি মাসে কিছু টাকা অন্তত তোর তরফে সংসার খরচ দিতেই হবে।

একলব্য আকস্মিক আমার এমন ব্যবহারে অবাক দৃষ্টি মেলে বলল, বেশ।

এই নিয়ে চারবার ফিমাসে একলব্য সংসার খরচ বাবদ আমার হাতে পাঁচশ টাকা দিয়েছে। সময় বা টাকার অংকটা এমন কিছু বেশি নয়। তবু এই সামান্যতেই সংসারে যে বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং যাচ্ছে তা দুর্ভাগ্যজনক পীড়াদায়ক।

একলব্য-নন্দিনী এখন একান্নবর্তী পরিবারের অন্যতম অংশীদার হিসেবে নিজেদেরকে ভেবে থাকে। বিন্দুমাত্র হীনম্মন্যতায় কুঁকড়ে থাকে না। নির্ভেজাল নিঃশর্ত আনুগত্যতো দূরের কথা অকারণ অযথা স্পষ্টবাদিতার আগমনে প্রায়ই সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, পারস্পরিক হিংসা অসহনশীলতা আর বিদ্বেষের চোরা স্রোতে একদিকে নিশা আর আমি অপরদিকে মা একলব্য-নন্দিনী, এই দু'টি প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছি।

আমি আশঙ্কিত হচ্ছিলাম এই ভেবে যে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ প্রকাশ্য তিক্ত বিরোধ বিতর্কে রূপান্তরিত হতে পারে। হলোও তাই।

একদিন একলব্য আমার কাছে নিশার বিরুদ্ধে গুচ্ছের অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো। অভূতপূর্ব কণ্ঠে জিগ্যেস করল, আচ্ছা দাদা নন্দিনীও তো বউদির মতো এবাড়ির একজন বউ। মানুষতো বটে। হাড়ভাঙা খাটুনিতে দিনকে দিন ওর শরীর স্বাস্থ্যটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাকি দেখবে না!

আর কোনও অভিযোগ? আমি নিরাসক্ত জবাব দিলাম, সবগুলি শোনার পর জবাব দেওয়া যাবে। বল আর কি বলতে চাস তুই।

ন্নাহ্। একলব্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নিম্নস্বরে বলল, আর কিছু বলার নেই।

আমি লক্ষ্য করলাম, একলব্য পর্দার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। বুঝলাম, নন্দিনী অন্তরালে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি নন্দিনীকে ভেতরে আসতে বললাম।

তোমার কিছু বলার থাকেতো নির্ভয়ে বল। আমি অভয় দিয়ে বললাম, খোলাখুলি আলোচনায় সব সমস্যার সমাধান সম্ভব।

আমার একটিই আবেদন। নন্দিনী যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে নিবেদন করল, যদি সেল্সের কাজটা আমিও করিতো আরও একটু ভাল থাকা চলে।

বুঝলাম, সংসারের খাটুনি থেকে মুক্তি চাইছে নন্দিনী। চাইছে, অবাধ স্বাধীনতার দিনযাপন। জিগ্যেস করলাম, আর কিছু বলবে?

আপনার ভাইকে মা যে কতটা বেশি ভালবাসেন তাতো জানেন। মা বলছিলেন—

থাক। নন্দিনীকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, মা-র মুখ থেকেই শুনব।

মা-র ডাক পড়ল। মা এলেন।

একলব্যর হয়ে নন্দিনীকে কি বলতে বলেছিলে তুমি? যথেষ্ট বিনম্র বললাম, নিজে বলতে কি অসুবিধা ছিল তোমার? আমার কাছে তোমার তো কোনও ভয় সমীহ্ থাকার কথা নয়। একলব্যতো আমারও ছেলের মতো। বল কি বলতে চাইছো তুমি।

তেমন কিছু না। মা আমতা আমতা করে বললেন, ছোটবেলা থেকেই দুধ ওর খুউব প্রিয়। সেখানে গাইগরু ছিল, তাই অসুবিধা ছিল না। এখনতো মাসে ও কিছু টাকা দিতে পারছে। সারাদিন রোদ্দুরে টো টো ঘুরে কাজ করে। পরিশ্রমতো হয়। দুধতো বাড়িতে আসেই। খোকা তুই খাস। আর একটু বাড়িয়ে দেয়া যায় কিনা দেখিস।

আর কিছু বলবে?

না না। আর কি বলব? মা ঝটিতি চলে গেলেন। সঙ্গে নন্দিনীও। একা একলব্য সুমুখে দাঁড়িয়ে। একলব্য নন্দিনী মা—তিনজনকেই আমি আরও কিছু বলতে চায় কিনা জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখনই তেমন কিছু আর বলেনি। কিন্তু আমি জানি, ভবিষ্যতে এরকম আরও অনেক কিছু বলবে। সংসার খরচ বাবদ দেয়া টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সমতালে।

এখন পর্যন্ত যা কিছু বলল তা শুধু ওই পাঁচশ টাকার জন্য।

আমি সুস্পষ্ট বুঝতে পারলাম, নিঃসন্তান আমার ললাটে আর অধিকদিন একলব্যর জনক লিখন নেই।

ঋষির চেয়ে বড়

দোষগুণ কমবেশি সকলেরই থাকে। বাবার ছিল, আমারও আছে। বাবা ছিলেন আবেগপ্রবণ, দয়ালু, উদারচেতা, পরোপকারী, সদা আনন্দে থাকা মানুষ। আরও এমন অনেক কিছু চারিত্রিক বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য ছিল যা সেই ছোটবেলা থেকেই আমাকে আকৃষ্ট অনুপ্রাণিত করত। সে কারণে আমার বড়বেলাকার আচরণে অনেকে নাকি বাবার সঙ্গে অল্পবিস্তর সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়ে থাকে। শুনে আমি রীতিমতো গর্ববোধ করি।

আমার বাবা রমণীমোহন গুহ ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমী। সম্ভবত সেজন্য বনবিভাগের চাকরিটা পছন্দ করেছিলেন। নইলে বিয়ের পরও স্ত্রীসন্তানাদি ছেড়ে একা বনজঙ্গলে থাকতে যাবেন কেন! বিশেষত চাকরিটা যখন একই জায়গায় স্থায়ী নয়। নিয়মমতে নিকটদূরের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বদলির। তাছাড়া, বাবার তো চাকরি করার কোনও দরকারই ছিল না। বাবা ছিলেন ঠাকুর্দা অবনীমোহনের একমাত্র পুত্রসন্তান। পৈত্রিক বিষয় আশয় আর ব্যবসা ধরে থাকলে বনবিভাগের মাস মাইনের দশগুণ বেশি রোজগার করতে পারতেন।

বাড়ির সকলে একরকম নিশ্চিন্ত ছিল, ঠাকুর্দার মৃত্যুর পরে বাবা অবশ্যই চাকরিটা ছেড়ে দেবেন। ফিরে এসে সবকিছুর হাল ধরবেন। অথচ, বাবা তেমনটি করেননি। স্বভাবতই হতাশ সকলে কমবেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বিশেষ করে ঝক্কি ঝামেলায় নাজেহাল সৌমেন শিবেন বড় দু'দাদা। ওদের মনে চাপা অভিমানও ছিল।

ব্যতিক্রম একমাত্র সর্বকনিষ্ঠ জীবেন আমি। বাবা চাকরিটা না ছাড়ায় আমি খুশি হয়েছিলাম। কেননা, আমিও প্রকৃতি-প্রেমী। বেড়াতে ভালবাসি। ছাত্রজীবনে সময় সুযোগ পেলেই বাবার কাছে চলে যেতাম। দু'চারদিন কাটিয়ে ফের ফিরে আসতাম। বাবা মনে করতেন, সাকুল্যে পাঁচ পুত্রকন্যার মধ্যে নিশ্চিত আমিই ওকে সবচাইতে বেশি ভালবাসি। বাড়ির সকলেও সম্ভবত তেমনটি ভাবত। আমাকে কাছে পেলে বাবা খুব খুশি হতেন। আমাকে নিয়ে আনন্দ উৎফুল্লে মেতে থাকতেন। ফিরতিকালে যাতায়াত ভাড়া ছাড়াও বেশ কিছু বাড়তি টাকা পকেটে গুঁজে দিতেন। সতর্ক করে বলতেন, বাড়ির কাউকে যেন বলিস না আবার।

বাবার এই গোপনীয়তার কারণটা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার ছিল। সুতরাং, বলতে যাব কেন? বরং বাবার দুর্বলতার সুযোগ ষোল আনা নিতাম। টাকার দরকার হলেই হঠাৎ গিয়ে হাজির হতাম। অনেক সময় চাহিদার অংকটা আগেভাগে নিজেই বলে দিতাম।

আমার এই অভ্যাসটা বন্ধ হয়েছিল নিজে চাকরি পাওয়ার পর। চাওয়া তো দূরের কথা বাবার দেয়া টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, দরকার নেই। এখন তো আমি রোজগার করছি।

বাবা তবু বললেন, কোনও সময় দরকার হলে কিন্তু চাইতে দ্বিধা করিস না।

নিশ্চয়ই না।

আমাদের সংসারে আর্থিক অভাব ছিল না। তবু মা-র হাতে আমি মাইনে পেয়ে কিছু টাকা দিতাম। আমার তেমন কোনও বিলাসিতা ছিল না। উদ্বৃত্ত টাকাটা নেশায় খরচ করতাম। নেশা বলতে ভ্রমণ। ফি বছর পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া চাই-ই-চাই। এছাড়া, মাঝেমধ্যে এক দুই তিন দিনের ছুটিতে কোথাও যাওয়া তো থাকতই। বিয়ের আগে বন্ধুদের সঙ্গে যেতাম। পরে সঙ্গে সোনালি থাকত। কোনও কোন ক্ষেত্রে মা-ও সঙ্গে যেতেন। সে এক সময় গেছে বটে!

হঠাৎ কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। সময় তো আর মানুষের চিরকাল একরকম যায় না। আমাদের বেলাতেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন?
বর্ষার সময় দীর্ঘদিনের ছুটিতে বাড়িতে আসা বাবার বাঁধা ছিল। সেবারও এসেছিলেন। ফিরে যাওয়ার আট দিন পরে ফের জ্বর নিয়ে বাড়িতে এলেন। জ্বরের তো আবার নানা চরিত্র আছে। ডাক্তাররা ধরতেই পারল না কোন শ্রেণীর জ্বর। কাজেই অনুমানভিত্তিক ওষুধ প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেল না। বাবা অকালে চিরমুক্তির আনন্দধামে চলে গেলেন। নিরানন্দ আমাদের কার মনে কতটা কি এবং কোনপ্রকার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমার জানাবোঝার কথা নয়। আমি শুধু নিজের সম্পর্কেই বলতে পারি। আমার মনে হয়েছিল, মাথার ওপর থেকে যেন আচমকা ছাদ আর বৃক্ষছায়া উবে গেল। কেন জানিনা সেইসময় নিজেকে একজন অনাথ মনে হয়েছিল।

বিষয় আশয় ব্যবসা অর্থ বিবাহ বউ সন্তান ইত্যাদি সূত্রেই সাধারণত একান্নবর্তী পরিবারে বিরোধ বাধে, ফাটল ধরে, বিচ্ছিন্নতা আসে। বাবার মৃত্যুর শোকপর্ব অন্তে আমাদের পারিবারিক বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রায় সবগুলি সূত্রই একত্রিত হয়েছিল। তিক্ততার পরিবর্তে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনায় সবাই সহমতে পৌঁচেছিলাম। কিন্তু পৃথকান্নে মা থাকবেন কোন পুত্রের সঙ্গে? সমস্যাটা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। অধিকাংশ পরিবারের বিভাজন কালে কেউই মা-র দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক থাকে। আমাদের বেলায় কিন্তু সবাই মা-কে ছাড়তে নারাজ। ফলে স্বয়ং মা-কে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হলো। মা সবাইকে অবাক করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সর্বকনিষ্ঠ আমাকে বেছে নিয়েছিলেন। আমি নিজেকে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করে পরম আহ্লাদিত হয়েছিলাম।
মা একদিন আমাকে বললেন, হ্যারে জীবু, শেষকালে তোদের বাবা যেখানে ছিল গেলি না তো একবারও! যাওয়া তো দরকার।
কিসের জন্য? আছে তো শুধু কিছু জামাকাপড় আর বিছানাপত্তর। বিছানার নিচে নিশ্চয়ই গুপ্তধন রেখে যাননি। সবকিছুই তো এখানে।
ধনদৌলতের জন্য বলছি না। মানুষটাই যখন চলে গেল, ওসব নিয়ে ভাবতে যাব কেন!
তাহলে?
হঠাৎ ওভাবে চলে আসায় কারও কাছে ধারদেনাও তো থাকতে পারে। তাছাড়া, কাজের লোকজনের পাওনাও নিশ্চয়ই মিটিয়ে আসে নি। পিতৃঋণ শোধ করা দরকার। নইলে ওর আত্মা শান্তি পাবে কেমন করে?
হক কথা। মা-র পরামর্শ মতো আমি গিয়েছিলাম। জায়গাটা আমার কাছে নতুন নয়। পাহাড়ি নদীর ধারে কাঠের বিট অফিস। চারদিকে চূড়ান্ত নৈঃশব্দ্য। একদিকে চা বাগিচা। বাকিটা ঘন জঙ্গল। সেগুন গাছের আধিক্য। হাজারো চেনা অচেনা গাছ পাখি লতাপাতা ফুল। নির্মেঘ আকাশ। ফরেস্ট ক্যাম্পাসের ফুল বাগিচা পেরিয়ে চড়াই উতরাই পথ। তারপর ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। সেখানে মোতির মা-কে পেলাম। মোতির মা বাবার রান্না করা থেকে শুরু করে সবদিক দেখভাল করত।
হাউমাউ কান্নায় ভেঙে পড়ে মোতির মা ফুলমতিয়া বলল, আমার মোতির কি হবে ছোটবাবু? কি হয়েছে তোমার মোতির?

নিভৃতে ডেকে নিয়ে ফুলমতিয়া যে বৃত্তান্ত শোনাল তাতে আমি রীতিমতো হতবাক। প্রয়াত পিতাকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম আমি। পিতৃঋণ সংক্রান্ত মা-র নির্দেশ মনে পড়ে গেল। ফুলমতিয়াকে অভয় দিয়ে বললাম, বাবার প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করব। মোতির পড়াশুনো বন্ধ হবে না। আমি ফি মাসে টাকা পাঠিয়ে দেব। আগামী বর্ষার আগে ঘর সারানোর টাকাও পেয়ে যাবে তুমি।

পরবর্তী বর্ষা আসার আগেই ধর্ষিতা ফুলমতিয়াকে চা বাগিচার ভেতর রক্তাক্ত আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। বিটবাবুর মাধ্যমে খবর পেয়ে আমি শেষ সময়ে হাসপাতালে পৌঁছেছিলাম। বাবার প্রতিশ্রুতি পালনে মোতির দায়িত্বভার নিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলাম। মা-কে বোঝালাম অন্যরকম। বললাম, আমার তো সন্তান নেই। হবেও না। পিতৃমাতৃহীন এক গরিবকে না হয় মানুষই করলাম। বাবা বেঁচে থাকলে এমনটিই করতেন।

হ্যাঁ, তোর বাবা গরিব দুঃখীদের খুউব ভালবাসত বটে।

বাবা ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দেবে বলেছিলেন। শুনেছি, বড্ড ভালবাসতেন ছেলেটাকে। আমি বাবার অপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করলে নিশ্চয়ই ওর আত্মা শান্তি পাবে।

মোতিকে আদরে কাছে টেনে নিয়েছিলেন ছুৎমার্গী মা আমার। কিন্তু কি বুঝলেন জানিনা। স্বগত বললেন, দেখলে মনেই হবে না ছোটজাতের ঘরের ছেলে।

ঔদার্যে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে সোনালি বলল, জাতপাত আবার কি? সবাই ঈশ্বরের পুত্র। দেবশিশু। ওদের সম্পর্কে আলাদা কিছু ভেবে মনকে কলুষিত করা উচিত নয়।

কিন্তু, স্কুলে ভর্তির সময় পার্থিব পরিচয় তো লিখতেই হয়। মোতির পিতৃমাতৃ পরিচয়ে আমার আর সোনালির নাম লেখা হলো।

এরপরও সমাজ আর আইন আছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মোতিকে আমরা আইনসম্মতভাবে দত্তক নিলাম।

জল বায়ু খাদ্যই যথেষ্ট নয়। বীজ আর ভূমিও দরকার হয়। ভূমিকাটা সম্ভবত ওই দু'টিরই সবচাইতে বেশি। তা নাহলে মোতি যথার্থ মানুষ হয়ে উঠল না কেন? লেখাপড়ায় তেমন চৌকস তো নয়ই, আচার আচরণেও মোতি আমাদের বংশের কারও ধারে কাছে গেল না। ওর উগ্র মেজাজ কদর্য বাচনভঙ্গি অশালীন আচার আচরণে আমরা যথেষ্ট হতাশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লাম।

সেই সময় মোতি একদিন সরাসরি বলে বসল, তোমরা তো আমার মা বাবা নও। আমার মা-র নাম তো ফুলমতিয়া।

আর বাবার নাম? বুক ধুকপুক আশঙ্কিত আমি জিগ্যেস করলাম।

তাতো জানি না। তবে মা বাবা কেউ যে বেঁচে নেই তা জানি।

কে তোর মাথায় এসব ঢুকিয়েছে? সোনালি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, সে তোর মঙ্গল চায় না। নির্ঘাৎ শত্রু।

শত্রু মিত্র যাই হোক না কেন, তথ্যটা সত্যি কিনা বল।

হ্যাঁ সত্যি। আমি নিরুদ্বেগ বললাম, আমরা তোকে দত্তক নিয়েছি। আইনসম্মতভাবে এখন আমি তোর বাবা। সোনালি তোর মা।

প্রমাণ দেখাতে পারবে?

হ্যাঁ পারব। সোনালি রাগত ছুটে গিয়ে প্রমাণপত্র এনে দেখাল।
এরপর থেকে মোতির চাহিদা ক্রমশ আকাশমুখি হয়ে পড়ল। শরীর স্বাস্থ্য মুখশ্রীতে বিসদৃশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। গোপন নজরদারিতে টের পেলাম, সে শুধু ধূমপান সুরাপানেই সীমাবদ্ধ নেই। ড্রাগ আসক্ত হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতি, মা ক্ষুব্ধ সোনালি হতাশ আমি তিতিবিরক্ত। আমাদের মন মানসিকতার দুরবস্থায় সান্ত্বনা বলতে জেনেশুনে বিষ করেছি পান গানের কলি।
কিন্তু স্নেহ যে অতি বিষম বস্তু। তা নাহলে মোতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে দেড় লক্ষ টাকার পেসমেকার ওর বুকে বসালাম কেন! অনায়াসেই হাত গুটিয়ে থেকে ওকে মরতে দিতে পারতাম। তাতে নিশ্চিত কেউ আমাদেরকে খুনী বলতে পারত না।
মানুষ ঠকে শেখে। আঘাত পেয়ে ভ্রান্ত পথ ছাড়ে। বোঝালে বোঝে। আসলে চাই হৃদয়ের পরিবর্তন। এই পরিবর্তনটা পেসমেকার বসিয়ে সম্ভব নয়। মোতি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন। অমানুষও বটে। নইলে মা মারা যাওয়ার পর বিষয় আশয় ভাগ বাটোয়ারার সময় স্বয়ং দাবিদার হয়ে দাঁড়ায় কখনও! এই নিয়ে দাদাদের সঙ্গে যখন বাকবিতণ্ডা তিক্ততার চূড়ান্ত, সোনালি বোঝাল, বাবার অংশ তো উত্তরাধিকার সূত্রে তুইই পাবি। সুতরাং, অযথা অশান্তি কেন! তোর অভাব কিসের?
অভাব টাকার। অনেক টাকা চাই আমার।
কিসের জন্য টাকার দরকার? আমি জানতে চাইলাম।
আমার দ্বারা আর লেখাপড়া হবে না। ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। ওদের ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁচতে হবে। ওরা যে আমাকে অনেক খাটো চোখে দেখে। আজকাল অগাধ টাকা ঠাটবাট না থাকলে কোথাও সম্মান পাওয়া যায় না।
তুই ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হতে চাস সে তো ভাল কথা। কিসের ব্যবসা?
ভাবছি, প্রমোটারি শুরু করব।
সে তো মস্তান মাফিয়া নাহলে সফল হওয়া যায় না। দেখছি শুনছি পড়ছিতো সব। অন্য কিছু ব্যবসা চিন্তা কর। আমারতো রিটায়ারমেন্ট এগিয়ে আসছে। স্বেচ্ছায় আগেই নাহয় নিয়ে নেব। তারপর বাপ-ব্যাটায় লেগে পড়া যাবে।
পার্টনারশিপ বিজনেস? মোতি মুখ বিকৃত করে হাসল, ওতে আমি নেই। তার চাইতে যা করব একার হিম্মতে।
বেশ তাই হবে। কিন্তু, ব্যবসাটা আমার মনের মতো হওয়া চাই।
তাহলে আপাতত একখানা মারুতি গাড়ি কিনে দাও। ভাড়া খাটাব। পরে নাহয় অন্য কিছু ভাবা যাবে। শুরু তো করি আগে।
একটু ভাবতে দে।
আসলে একান্তে সোনালির সঙ্গে আলোচনা করার সময় চাইলাম। সোনালিকে বোঝালাম, দেখ এই গাড়িটাড়ির ব্যবসাও আমার পছন্দ নয়। অথচ একের পর এক ওর প্রস্তাবে সায় না দিলে ক্ষেপে যেতে পারে। তাছাড়া, উড়নচণ্ডী হয়ে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে কিছু একটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে হয়তো অতীতের দোষগুলি শোধরাতে পারে।
কিন্তু গাড়ি হলেই ওর জীবনে নারী আসবে। সোনালি ওর আশঙ্কা জানাল, তখন তো বিপদ আরও বাড়বে।

সেটা কিরকম? আমি সঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, একটু খোলসা করে বল।
আজকাল কারও মোটরবাইক থাকলেই মেয়েরা জুটে যায়। অটো রিকশার মালিক হলে প্রেমে পড়ে। মারুতির মালিক হলে তো বিয়েই করে বসবে।
মোতিকে বিয়ে? আমি হো হো হেসে বললাম, কোন্ মেয়ে বিয়ে করবে ওকে! রোজগারপাতি দেখবে না? মেয়েদেরকে অত বোকা ফালতু ভাবছো কেন!
যা দেখছি, তাই বলছি। সোনালি দৃষ্টান্ত দেখাল, পাড়ার অবনী গুঁইনের ছেলে নবনী বেকার ছেলে। স্রেফ চেহারার চমকে অখিলেশ চ্যাটার্জির মেয়ে বিন্দিকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে।
তাই নাকি?
অবাক হচ্ছো? সোনালি ফের শোনাল, সারদা সেকেণ্ডারি গার্লস্ স্কুলের টিচার প্রিয়ব্রত চৌধুরী যে কেন আত্মহত্যা করেছে জান?
কে প্রিয়ব্রত তাই জানি না। আমি সরল স্বীকার করে জিগ্যেস করলাম, কি হয়েছিল ভদ্রলোকের?
বউ আধ-পাগল। নিজের বুকে দোষ। বিয়ের বয়সী দু'টি সোমত্ত মেয়ে। বড় ছেলে ভোম্বল গোছের। গ্র্যাজুয়েট হয়ে চাকরি জোটাতে পারেনি। টিউশনি করে হাজার দু'য়েক রোজগার করে। ছোট ছেলেটা বখে গিয়ে কলেজ অব্দি পড়েনি, কিন্তু বেশ চালাকচতুর। পার্টি-ফার্টি করে কেমন করে যেন একখানা অটো রিকশা কিনে ফেলেছে। ব্যস্, অম্নি প্রেম করে বউ বানিয়ে ফেলল! তা কিনা আবার বাপের স্কুলের সেক্রেটারির মেয়েকে।
তারপর?
যেদিন গোপন বিয়ের বউ এসে ঘরে উঠল, পরদিনই প্রিয় স্যারের স্কুল টিচারির চাকরি নট। তারপর ওই আত্মহত্যা। আরও শুনবে?
ন্‌নাহ্। জানি এরকম আরও কয়েকটি ঘটনা তোমার জানা আছে। বিচ্ছিন্ন এমন কিছু ঘটনা দিয়ে সমগ্রকে বিচার করা উচিত হবে না।
আমি নানাভাবে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে শেষমেশ সোনালির সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হলাম। মোতিকে মারুতি কিনে দিলাম।

এখন আমি যখন অফিস যাই মোতি তখন ঘুমায়। আর আমি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার পর মোতি নেশা করে বাড়িতে ফেরে। ছুটির দিনে অপেক্ষাকৃত দেরিতে বিছানা ছেড়ে জানতে পারি, মোতি সাতসকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ হয়ই না। সুতরাং, লাভ লোকসান রোজগারপাতি সম্পর্কে সবকিছু অজ্ঞাতই থেকে যায়।
একদিন সোনালিকে জিগ্যেস করলাম, মোতিকে যে গাড়ি কিনে দিলাম তার রোজগারপাতি সম্পর্কে তুমি জান কিছু?
না বললে জানব কেমন করে? সোনালির মেজাজটা তিরিক্ষি।
তুমি তো মা। জিগ্যেস করতে পার না?
টাকাটা তো তোমার। গ্যারাণ্টারও তুমি। মাথাব্যথাও তোমারই হওয়া উচিত। এসবের মধ্যে আমাকে জড়িও না। প্লীজ।

এমন সময় আচমকা মোতি এসে হাজির।
অসময়ে তুই এখন বাড়িতে এসেছিস! অবাক আমি জিগ্যেস করলাম।
তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। মারুতির চাবি দুলিয়ে মোতি সুমুখে বসল।
তোমরা কথা বল, আমি যাই। সোনালি এড়িয়ে পালাতে চাইল।
না যাবে না। মোতি গম্ভীর স্বরে বলল, তোমারও থাকার দরকার আছে।
ইজ দেয়ার এনি প্রব্লেম? আমি গভীর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকালাম।
ছিল, এখন আর নেই। মোতির ঠোঁটে একচিলতে হাসি, সব প্রব্লেম সলভ্ করে তবেই তোমাদের কাছে এসেছি। এখন সবকিছু তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। তোমরা রাজি না হলে তবেই প্রব্লেম।
কি হেঁয়ালি করছিস? সোনালির যা আশঙ্কা সেইমতে বলল, বিয়ে করেছিস?
আমি জানতুম তুমি এমনটিই ভাববে। মোতির ঠোঁটে মিটমিট হাসি।
তাহলে কি সেটা বলবি তো। আমি চাপা উত্তেজনায় বললাম, নির্ভয়ে বল।
শুধু মারুতিতেই জীবন চলবে? খোলস থেকে বেরিয়ে উৎফুল্ল মোতি বলল, এবার আমার মিনিবাস হবে। চেসিজ বডি লাইসেন্স টাকা—সবকিছুর দায়িত্ব আমার। তোমাকে শুধু একটা বড় কাজ আমাকে করে দিতে হবে। তোমরা রাজি নাহলে আমার সব চেষ্টা সাফল্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।
কি সেই বড় কাজ?
মা একদিন বুঝিয়েছিল, তোর বাবার অংশের সম্পত্তি তো উত্তরাধিকার সূত্রে একদিন তোরই হবে। সেই পাওয়াটা আমার এখনই দরকার। আমার নামে নাহলে বন্ধক রাখব কেমন করে। কিসের বিনিময়ে আমি লোন পাব?

সোনালি যেন পাথর প্রতিমা। আমি বিস্ময়ে হতবাক। ঘরময় সুচপতন-শব্দশূন্য হিমশীতল নিস্তব্ধতা। আমার মস্তিষ্ক জুড়ে চিরন্তন সত্য সেই মুনি মুষিকের গল্পটা। সুমুখে নাগালের মধ্যে একদা মুষিকসম মোতির বুকে আমার আশিসে প্রোথিত আছে দেড় লক্ষ টাকার পেসমেকার। অথচ আশ্চর্য, আমাকে সার্বিকভাবে গিলে ফেলতে উদ্যোগী মোতির বুকের ভেতরকার সেই যন্ত্রটা আমি কিছুতেই স্তব্ধ করব না।

বুকের মধ্যে বাবা

একটি কবিতা লেখার দায়ে আমি অভিযুক্ত। আমি শ্রী ভবেশ গুপ্ত আধা সাহেবি একটি জুতো কারখানা অফিসের একজন তরুণ করণিক । অফিসে বসে মাঝে মধ্যে কবিতা লিখে থাকি। একটি কবিতা অনবধানবশত জরুরি একটি ফাইলের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। ফাইলের পাতা ওলটাতে বড়সাহেবের নজরে পড়ে যায়। ব্যস, তিনি দারুণ চটে আগুন। ইয়েসম্যান নির্বিরোধ নিরীহ ভালমানুষ বড়বাবু। সেই বড়বাবুকে জরুরি ডাক পাঠিয়েছিলেন। ওঁকে ভালমন্দ নরম গরম কথার চাবুক মেরে নাস্তানাবুদ করা হয়েছে। অথচ, অপরাধটা আমার।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস বড়বাবু বেজায় বকুনি খেয়ে বেজার মুখে ফিরে এলেন। অথচ আমাকে কিছু বললেন না। ক্ষুণ্ণ মনে নিজের টেবিলে চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছিলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতে মুখ তুললেন। নাকের ডগায় চশমাটা ঠিক করে নিলেন। তারপর আমার দিকে চোখ চেয়ে তাকালেন। মুখে কিছু বললেন না। চোখ মুখে বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই। চোখের ভাষায় যেন জানতে চাইলেন, কিছু বলবে তুমি?

কি বলব আমি? বলার কি মুখ আছে। আমি বরং কিছু শুনতেই চাইছিলাম। বুকের ভিতর দারুণ আশঙ্কা এবং ভীতি। নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছিল। বড়বাবু কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামালেন। ফাইলে কলম চালাতে চালাতে বললেন, তোমার এখন অশৌচের বছর চলছে ভবেশ।একটু বুঝেশুনে সাবধানে চলা দরকার। অনেক দিন থেকেই তুমি বড়সাহেবের বিষ-নজরে আছো।

আমি পরম বাধ্য ছেলের মতো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। নিজের টেবিলে ফিরে এলাম। সর্বক্ষণ মনে হল, একটি বছর আমাকে সাবধানে থাকতে হবে। আমি বড়সাহেবের বিষ-নজরে আছি, কিন্তু কেন? কারণগুলো আমার মনের ভিতর ঘুরপাক খায়, খোঁচায় এবং যন্ত্রণা দিতে থাকে।

আমার ধুতি পরে কাজে আসা বড়সাহেব মোটেই পছন্দ করেন না। অপছন্দের কথাটা নানাভাবে জানিয়েও কোন ফল পাননি। সাহেব তোযামোদে আমার দারুণ অনীহা। আমার কণ্ঠ কোনমতেই আর দশজনের মতো 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' হতে পারেনি। বড় সাহেব আমাকে মডেল ডিপার্টমেন্টে লোভনীয় পদে পাঠাবার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। জুতার নকশা আঁকার কাজ। সে প্রস্তাব প্রত্যাখানে তিনি খুশি হননি। শোনাকথা, অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবে মঞ্চস্থ আমার লেখা নাটক দেখে ওঁর ধারণা, চুরুটচোযা ডবল প্রমোশন পাওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত সুনীতিশঙ্কর সমাজপতি এবং চরিত্রহীনা মঞ্জুলিকা মজুমদার চরিত্র দু'টি নাকি ওঁকে এবং ওঁর একান্ত নিজস্ব স্টেনোকে ব্যঙ্গ করে গড়া। উদ্দেশ্য, শ্রমিক কর্মচারীদের কাছে ওদেরকে হেয় করা।

আর ফাইলের ভিতরকার কবিতা? ওঁর মতে, কবিতাটিনাকি শ্রমিক শ্রেণীকে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট প্ররোচনামূলক।

সুতরাং , এহেন গর্হিত অপরাধের জন্য অফিস ছুটির কিছুক্ষণ আগে স্টেনো মিস ম্যানিলা মারফত্ আমাকে লিখিত কড়া নির্দেশ দেয়া হল, অফিসের কাজে ফাঁকি দিয়ে কর্তৃপক্ষ বিরোধী কবিতা লেখার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই। কৈফিয়ত সন্তোষজনক নাহলে ক্ষমা চেয়ে হলফনামা দিতে হবে। অন্যথায়, কর্তৃপক্ষ কঠোর শাস্তি দিতে বাধ্য হবে।

শাস্তি কি এবং কতদূর কঠোর হতে পারে? অনেক ভেবে কিছুতেই কোন কিনারা খুঁজে পেলাম না। অফিস ছুটির পর পথ চলতে চলতে সারাক্ষণ মনে হল, বড়সাহেবের বোঝা উচিত ছিল যে কবিতা কষ্টের ফসল। কবিরা কবিতার জন্য রক্ত দিতেও প্রস্তুত থাকে। কিন্তু চাকরি? প্রশ্নটা আমাকে ভীষণভাবে বিব্রত করে তুলল।
দু'মাস আগে হলে বিন্দুমাত্র পরোয়া ছিল না। মাত্র দু'মাস আগে বাবা চিরমুক্তির আনন্দধামে চলে গেছেন। অর্থাৎ, এখন আমি আর সেই পরম নির্ভরযোগ্য গাছের ছায়ায় নেই।

বৈঠকখানার দেওয়ালে তেলরঙের ঝুলন্ত প্রতিকৃতিটা বাবার। আমার নিজের হাতে আঁকা। নিচে চার লাইনের ছোট্ট একটি কবিতা আমার লেখা। বাবার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। মাসের ঠিক এই দিনটিতে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। অফিস ফিরতি পথে কিছু ফুল মালা এনেছিলাম। একটু আগে প্রতিকৃতিটায় মালা পরিয়েছি। ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ধূপদানিতে ধূপ জ্বালছিলাম। দাদা এলেন। প্রতিকৃতিটার ঠিক পাশে ঘড়িটা টাঙিয়ে দিলেন। অনেকদিন পর ঘড়িটা আবার বৈঠকখানায়। ঘড়িটা বাবার। যৌবনকালে নাকি দীর্ঘদিন রেঙ্গুন-এ ছিলেন। রেঙ্গুন থেকে কেনা। শুনেছি, তখনকার দিনে দাম ছিল তের টাকা। আজকের দিনে মাত্র মনে হয়। যখন আমরা নিতান্ত ছোট ছিলাম ঘড়িটা হয়তো বাবার বৈঠকখানায় বেমানান ছিল না। বরং বোধহয় আভিজাত্য বজায় রাখত, এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ঠিকঠাক সময়ও দিত।
কিন্তু, কালে সবকিছুই পাল্টে যায়। বোধকরি রুচিও। সেকারণে ক্রমশ বড় হতে আমাদের নজরে ঘড়িটা মোটেই সুন্দর লাগত না। বেজায় বেঢপ মনে হতো। পেল্লাই একটা পেণ্ডুলাম। রাতভোর শ্রুতিকটু টিক টিক শব্দ করে। মাঝে মাঝে ছড়্-ড়্-ড়্-ড়্-ঢং ঢং ঘন্টা বাজায়। সুতরাং, ঘড়িটা আমাদের অপছন্দ।
কিন্তু, বাবা তখন সংসার সাম্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতাপশালী সম্রাট। দীর্ঘ ছ'ফুট বলিষ্ঠ সুস্বাস্থ্যের শরীর। মোটা গোঁফ। মাথা ভরা ঘন চুল। দরাজ কন্ঠস্বর। তীক্ষ্ণ নাক মুখ চোখ। সেই ছোট্ট বয়স থেকেই দূর থেকে বাবার পায়ের গ্লেসকিট জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ শুনলেই আমরা রীতিমতো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম। এ্যাটেনশান পজিশনে পৌঁছে যেতাম। সুতরাং পছন্দ অপছন্দের কথা বলার সাহস পাব কোথায়!
জোড়াসনে চুপচাপ বসে আছেন দাদা। মুন্ডিত মস্তকে এখনো তেমন চুল হয়নি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। ঈষৎ গৈরিক রঙের হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি পরেছেন। দেখতে সাধুসন্তের মতো লাগছে। পাশে বউদি বসেছিলেন। খোকন জ্বালাতন করতে ওকে নিয়ে বাইরে গেলেন। ঘড়িটার দিকে অপলক চোখ চেয়ে তাকিয়ে আছেন দাদা। কী ভাবছেন।
চাকরি পেয়ে দাদা একবার সাহস দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। বড় অংকের পদস্থ চাকরি পাওয়ায় নতুন করে ঘরবাড়ি সাজাচ্ছিলেন। হাল ফ্যাসানের বৈঠকখানা সাজাতে সাজাতে ঘড়িটার দিকে থমকে দাঁড়ালেন। সম্ভবত পুরনো অনেক কিছুই হটিয়ে দেওয়ার মতো ওটাকেও সরানো যায় কিনা ভাবছিলেন। কাছেই বাবা দাঁড়িয়ে। বৈঠকখানার নতুন সাজগোছ নিরীক্ষণ করছিলেন। সম্রাটের তরবারির মতো হাতে ছড়ি। চোখ দু'টো দুর্দান্ত জ্বলন্ত। দাদা দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবার সাহস পর্যন্ত করলেন না। সুতরাং, ঘড়িটা যথারীতি যথাস্থানেই থেকে গিয়েছিল। বুঝেছিলাম, দাদা ভীষণভাবে পরাজিত।

আমার স্ত্রী লীনা এলো। মাথায় ঘোমটা। হাতের প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল জড়ালো। তারপর উবু হয়ে বাবার প্রতিকৃতিতে প্রণাম করল। বসল। লীনা কি দেখছে, প্রতিকৃতি নাকি ঘড়িটাকে। দাদা এবং আমার মতো কিছু ভাবছে কী?
বৈঠকখানার পাশেই আমাদের শোওয়ার ঘর। বিয়ের পর প্রথম দিকে লীনা প্রায়শই শোনাত, ঘড়িটার বিশ্রী আওয়াজে ওর নাকি ভাল ঘুম হয় না। মাথার মধ্যে খটাস্ খটাস্ শব্দ এবং বুকের মধ্যে কষ্ট হয়। সূক্ষ্ম ধীর শান্ত রাগের গান বাজনা শুনতে বাধা সৃষ্টি করে। এমনকি খুব নিম্ন স্বরে বলা আমার হৃদয়গত কথাগুলিও সব সময় যথার্থ কানে যায় না। আরও কত কী যে। আমি বলতাম, কি করা যাবে ঘড়িটা বাবার যে।
ভালবাসার প্রিয়জনেরাওতো এক সময় চলে যায়। বিচ্ছেদ বিয়োগ ব্যথা আর কত দিন স্থায়ী হয়। বাবা বুড়িয়ে গিয়েছিলেন। ঘড়িটার বয়স বেড়েছে। আমাদেরও। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই বর্ণ কণ্ঠ কর্মক্ষমতা পাল্টে যায়। কোন একদিন দেখা গেল, ঘড়িটা ঘুমিয়ে আছে। মৃতের মতো স্পন্দনহীন। ঠিক বারোটার ঘরে ছোট বড় কাঁটা দু'টো একত্রে স্তব্ধ। যুগল মৃত্যুর মতো। দাদা দেখে বললেন, বারোটা বেজে গেছে। এবার ওকে মুক্তি দেয়া দরকার। তেরো টাকার উশুল তেত্রিশ বছর আগেই হয়ে গেছে।
মন্তব্যটা বাবার কানে গিয়েছিল। ভিতর বারান্দা থেকে ছুটে এসে দরজায় দাঁড়ালেন বাবা। আমি ত্রিভুবন কেঁপে ওঠার আশঙ্কায় ঘর ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজছিলাম। অথচ আশ্চর্য, বাবা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হলেন না। সম্রাটের মতো চোখ চেয়ে তাকালেন না। বরং, বাবাকে কেমন যেন ম্লান বিষণ্ণ এবং করুণ দেখাচ্ছিল। চোখ দু'টো নিস্তেজ রোদ্দুরের মতো। সাজাহান যাত্রা দেখেছিলাম। বাবাকে ঠিক যেন শেষ বয়সের সেই বৃদ্ধ বন্দী সাজাহানের মতো মনে হলো। বাবা খুব শান্ত সংযত স্বরে বললেন, সময়মতো রসদ না যোগালে যন্ত্র এবং জীবন- সবই অচল হয়ে যায়।
এবার পরাজিত আমরা দু'জনেই।
ফি রবিবার বাবা সকালে ঘড়িটাতে দম দেওয়ার কথা দাদাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। দায়িত্ব সম্পর্কে এভাবে সচেতন করিয়ে দেওয়ার মধ্যে দাদা অপমান বোধ করতেন। বাবা জানতে পেরে আর মনে করিয়ে দিতেন না। কোন কোন রবিবার দাদা ডিউটিতে যেতেন। সেসব রবিবার দায়িত্বটা আমার ওপর বর্তাতো। স্মরণ হাতড়ে দেখলাম, সেই রবিবার দাদার ডিউটি ছিল। লীনার বাপের বাড়ির লোকজন আসায় ভুলে ঘড়িটাতে দম দেয়া হয়নি।
দাদা ঝটিতি ঘড়িটাতে দম দিয়ে কাঁটা দু'টো যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। ঘড়িটা চলতে থাকল। কিন্তু সেই থেকে গণ্ডগোল শুরু। সপ্তাহের প্রথম দিকে ঘড়িটা ঠিকঠাক সময় দিত। তারপর ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে পড়তে শুক্র শনিবার স্তব্ধ হয়ে যেত। বাবাকে উদ্দেশ করে দাদা শোনালেন, সময় মতো দম দিয়েওতো দেখা গেল । ওর এবার যাওয়ার সময় হয়েছে।
সম্রাটের সংসারে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল অনেকদিন আগে থেকেই। শুনেছি, ঠাকুরদা মারা যেতে বাবা ওঁর নাবালক ভাইবোনেদের প্রতি পিতৃকর্তব্য পালন করেছেন। দেখেছি, দেশ বিভাগের পর ভিটেমাটি ছেড়ে এসে এপারে আমাদের জন্য কঠোর সংগ্রামে দিন কাটিয়েছেন। দিদি এবং আমাদের দু'ভাইকে বিয়েও দিয়েছেন বাবা। দাদা এবং আমি সক্ষম উপার্জনশীল হওয়ার পর থেকেই বাবাকে রিলিফ দিতে চাইছিলেন দাদা। বাবা কিছুতেই রাজি হননি। আশি ছুঁই ছুঁই বয়সেও বাবা ট্রাম বাসে ঝুলে কোর্টে যেতেন। বাজার রেশন দুধ আনতেন। রাত জেগে আইনের

বই পড়তেন। উীড ড্র্যাফট্ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মর্নিংওয়াক করতেন এবং খালি গলায় বেসুরো গান গাইতেন। যেন চিরতারুণ্যে ভরা পুরুষ।
দাদা একদিন অনুযোগের সুরে মা-কে বললেন, বাবাকে একটু বোঝাও মা। বাবা জীবনভর যথেষ্ট কষ্ট করেছেন। এখন বিশ্রাম নিলেই তো পারেন। আমাদের অভাব কীসে?
মা বললেন, অভাব নেই বটে। তবু, সন্তানদের প্রতি বাপ মা-র দায়িত্ব কর্তব্য আজীবন থেকেই যায়।
কথাটা দাদার পছন্দমতো হয়নি। তাই ক্ষোভের সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, কি জানি-তোমাদের মনের আসল কথাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।
দাদা না-বুঝলেও আমি ঠিক বুঝতাম। মৃত্যুদিন পর্যন্ত সংসার সাম্রাজ্যের অপরাজিত সম্রাটের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার বাসনা ছিল বাবার। মা নিজেও চাইতেন, বাবা আজীবন উপার্জনশীল কর্মক্ষম থাকুন। বাবার সম্রাট-অহং উত্তাপে মা পরম খুশি হতেন। সম্রাজ্ঞীর সুখ পেতেন।
মা এসে আমাদের সকলের মাঝখানে বসেছেন। প্রশান্ত পবিত্র মূর্তির মতো দেখতে লাগছে। আজকাল আত্মীয় প্রিয় আপনজনেরা বলে থাকেন, মা-র ওপর তোমরা একটু বেশি নজর রেখো। অথচ আশ্চর্য, সরল সোজা নরম মনের মা আজকাল সর্বক্ষণ আমাদের ওপর নজর রাখেন। ভরসা দেন। সাহস যোগান। মা আজকাল আমাদের বাবা হয়ে গেছেন।
আত্মমগ্ন মা যেন এই মুহূর্তে ধ্যানস্থ অন্য জগতে। মা কী বাবার সেইসব কথা ভাবছেন? বাবা প্রায়শই আমাদেরকে উদ্দেশ করে বলতেন, আজকালকার ছেলেরা বড় অল্পতেই অন্ধকার দেখে। ধৈর্য হারায়। ক্লান্ত নিরাশ হয়ে পড়ে। অথচ, আই ক্যান স্টিল স্ট্রাগল ফর লাইফ। আপ টু লাস্ট ডে অফ লাইফ।
একারণে আমি নিশ্চিত জানতাম, বাবা ওঁর বিগড়ে যাওয়া ঘড়িটাকে কোনমতেই দাদার কথায় মুক্তি দেবেন না।
বাবার নির্দেশমতো বেঢপ ভারি ঘড়িটাকে প্রায়ই বগলবন্দী করে আমাকে ঘড়ি ডাক্তারের কাছে ছুটতে হতো। চিকিৎসার পর কিছু দিন ঠিকঠাক চলত। আবার যে কে সেই। আমার কষ্ট হতো। লজ্জা করত। রাগও হতো। কিন্তু উপায় কী। আমি আদপেই দাদার মতো সাহসী নই। বরং দুর্বল ভীতু প্রজার মতো।
একদিন সকলকে সমবেত করে দাদা হিসাব জুড়ে দেখালেন, তের টাকার ঘড়িটার পিছনে গত একবছরে ইতিমধ্যেই তিনশো বত্রিশ টাকা খরচ হয়ে গেছে।
মা বললেন, টাকাটা তোদের বাবা খরচ করেছেন। তোদের লাগছে কীসে?
দাদা বললেন, ওই টাকায় সুন্দর একখানা মডার্ন ঘড়ি কেনা হয়ে যেত। বৈঠকখানায় বিউটি স্পটটাও আর থাকত না। সকলের সমর্থন প্রত্যাশায় দাদা জিগ্যেস করলেন, ঠিক কিনা?
বাবা ছাড়া আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম। কেউ কোন মতামত ব্যক্ত করল না। সকলেই নীরব। আমাকে উদ্দেশ করে দাদা বললেন, তুই অন্তত কিছু বল। এত ভয় কীসের!
দাদার উসকানিতে আমি মুখ ফসকে বলে ফেললাম, অতবড় ঘড়িটাকে নিয়ে রোজ রোজ ছুটতে আমার মোটেই ভাল্লাগে না । লোকেরাইবা কি ভাবে।
বাবা কখন বাড়ি এসে গিয়েছিলেন তা কেউই টের পাইনি। আমাদের সব কথা অন্তরালে শুনেছেন। ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন বাবা। হিমেল হাওয়ার মতো সকলকে কাঁপিয়ে দিয়ে বললেন, আমিওতো

বুড়ো হয়েছি। ওল্ড মডেল ম্যান; এ্যাণ্ড এ ফুল। আমাকেও ফেলে দিলেই তো হয়। সংসারের বিউটিতে কোন স্পটই আর থাকবে না। আমরা সকলেই অপ্রস্তুত। চূড়ান্ত অসহায় এবং বেয়াকুব বনে গেলাম।
পরের দিন সাতসকালে বাবা কোথা থেকে এক বুড়ো রিটায়ার্ড ঘড়ি-ডাক্তার নিয়ে এলেন। মাদুর পেতে লোকটাকে বারান্দায় বসালেন। চা বিড়ি জলখাবার খাওয়ালেন। দুপুরে ভোজন করালেন। নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে লোকটা ঘড়ির বুক পেট মাথা খুলে সকাল সন্ধ্যা কিসব ঠুকঠাক হাতুড়ে ডাক্তারি করল। অথচ আশ্চর্য, সেই থেকে ঘড়িটা ঠিকঠাক চলছে। একদিনের জন্যও স্তব্ধ হয়নি। ঘড়িটা চলে গেল বাবার একান্ত নিজস্ব ঘরে।

জীবনকে বাদ দিয়ে জীবন্তচিত্র সম্ভব কি? সম্প্রতি মন বলছিল, এতকাল আঁকা আমার সব ছবিগুলিই বর্ণাঢ্য উচ্চবর্ণের। নিতান্তই নয়নশোভা। স্বপ্ন-মগ্নে আঁকা সেসব ছবিতে সমকালীন মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা এবং সংগ্রাম ধরা পড়েনি।
ভাস্কর এবং শিল্পীদের নাকি বড় বেশি পিতৃভক্তি থাকে। বাবা মারা যাওয়ার পর সাদা কালো একটি ছবি আঁকা শুরু করেছি। একটি চেয়ার । চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একখানা ছড়ি। ছবিটা আঁকা এখনও শেষ করা হয়নি।
অসমাপ্ত ছবিটার সামনে বসে বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক নিরক্ত ক্ষত বাড়ছে। মাথার ভিতর দারুণ দুশ্চিন্তা। মনের ভিতর নির্মম লড়াই চলছে। ঘরময় সিগারেটের ধোঁয়া। চূড়ান্ত অস্থিরতা।
রাতে খাবার টেবিলে বসে দাদাকে অফিসের সব কথা বলেছিলাম। শুনে দাদা কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। তারপর রায় দিয়েছেন, আজকের জগতে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেই বাঁচতে হচ্ছে। বাঁচতেও হবে। চাকরির বাজারে বড় দুর্দিন চলছে যে।
আমি সভয়ে মৃদুস্বরে বলতে যাচ্ছিলাম, চাকরির বদলে যদি—সবটুকু ব্যক্ত করার আগেই দাদা থামিয়ে দিয়ে বললেন, স্বাধীন কিছু? বর্তমান প্রফেশনাল রাজনীতির জন্য কোথাও স্বাধীনতা নেই। বলতে পারিস, চারদিকে যে চূড়ান্ত অন্যায় অরাজকতা চলছে তার বিরুদ্ধে ক'জন সাহিত্যিক কলম ধরেছেন? ধরছেন না কেন?
আমি কোন জবাব দিলাম না। দাদা খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, গুণ নয়- গণেতেই এখন যত শক্তি। বরং যদি পারিস ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে একটু সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করিস। তাহলে বড়সাহেবের বাবাও ভয় পাবে।
অতএব, আমার হাতে কাগজ কলম। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লিখিত কৈফিয়ত দিতে হবে। অর্থাৎ, আগামীকাল অফিস ছেড়ে আসার আগেই। কিন্তু কি লিখব আমি? তবু, কিছু একটা লিখতেই হলো। বার কয়েক পড়ে আমি বুঝতে পারলাম , কৈফিয়তটা মোটেই সন্তোষজনক হল না। সুতরাং পরক্ষণেই লেখাটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম। ভাবলাম, তারচেয়ে বরং আগাম ক্ষমা চেয়ে হলফনামা দেওয়াই ভাল। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভব কী?
কেবলি মনে হচ্ছে, বড় সাহেবের বোঝা উচিত ছিল- কবিতা কষ্টের ফসল। কবিরা কবিতার জন্য রক্তও দিতে পারে। কিন্তু চাকরি? প্রশ্নটা আমাকে ভীষণভাবে বিব্রত করে তুলছে। কেননা,

এখন আর আমি আগেকার মতো পরম নির্ভরযোগ্য গাছের ছায়ায় নেই। বাবা বেঁচে থাকলে নিশ্চিত বলতেন, তোর এই চাকরিটা আমার মোটেই পছন্দ ছিল না ভব। কোনরকম ক্ষমা না চেয়ে বরং ছেড়ে দে।

বললেই কি আর ছাড়া যায়? বাবা অনেকবার আমার এই কেরানির চাকরিটা ছাড়তে বলেছেন। প্রায়শই বলতেন, শিল্পী সাহিত্যিকদের একটা অহং থাকে। তোর নেই। সেজন্য তোর প্রতিভা থেকেও নেই। সাধারণ দশজনের মতো জুতোর ফাইলে কলম চালিয়ে যাচ্ছিস।

বাবার কথা শুনে আমি মনে মনে হাসতাম। ভাবতাম বলেই ফেলি, কেনযে বোঝনা- শিল্পী সাহিত্যিকদেরও আজকাল বেলাইনে চাকরি করতে হয়। তা নাহলে অন্ন জোটেনা।

অথচ, বলতাম না। বাবাকে আমার ভীষণ ভয়। সবকিছুতেই বাবা বড় বেশি ওজনের তত্ত্বকথা শুনিয়ে থাকেন। আমার মন্তব্য শুনে হয়তো বলেই বসতেন, স্ট্রাগল ছাড়া বড় জাত শিল্পী বা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। যেকোন সৃষ্টির জন্য অনেক কঠিন মূল্য দিতে হয়-বুঝলি।

অন্তত এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি। কিন্তু, কিছুতেই সাহস পাচ্ছি না। কোন এক প্রদর্শনীতে দেখা একটি ছবির কথা মনে পড়ছে। নুড়ি কাঁটা কাঁকর বিছানো দীর্ঘ একটি পথ। একজন বৃদ্ধ লোক সেই পথের তিন চতুর্থাংশ পেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তাঁর একটি লাঠি। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। দীর্ঘছায়া পড়েছে পথের ওপর। ঠিকরে পড়া আলোয় বাকি পথটা উজ্জ্বল।

ক্রমশ রাত গভীর হচ্ছে। সমস্ত পাড়াটা নিস্তেজ। বিছানায় লীনা ঘুমিয়ে আছে। ওর গর্ভে আগামী দিনে যে আসবে তার চরিত্রে কার প্রতিফলন পড়বে? কিছুতেই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ লোডশেডিং হল। ঘরময় গাঢ় গভীর অন্ধকার। নিঃচ্ছিদ্র জমাট অন্ধকারে বসে থাকা আমার বুকের ভিতর অস্থির দ্রুত হৃদস্পন্দন হচ্ছে। সর্বশরীরে দারুণ একটা যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটা মানসিক দ্বন্দ্বের। কিছুতেই সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না।

হিমশীতল নিস্তব্ধতার বুক চিরে বৈঠকখানা থেকে ঘড়িটার শব্দ ভেসে আসছে। টিক্-টিক্-টিক্-টিক্। শব্দের মধ্য দিয়ে বাবা যেন নিরন্তর বলে যাচ্ছেন, আই ক্যান স্ট্রাগল ফর লাইফ ...আই ক্যান স্ট্রাগল ফর লাইফ।

আজ এই চরম অস্থিরতার মধ্যে ঘড়ির শব্দটা বড় শ্রুতিমধুর লাগছে। শব্দটার মধ্যে এতযে সঞ্জীবনী শক্তি ছিল- কে জানত। ক্রমশ আমার সব অস্থিরতা ক্লান্তি দ্বিধা এবং দুশ্চিন্তা কেটে যাচ্ছে। চোখের পাতায় শান্ত সবুজ ঘুম নেমে আসছে। আমি অনায়াসে সহজ সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, এবার ঘড়িটা স্তব্ধ হলে অনেক বড় ঘড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। বগলবন্দীর পরিবর্তে পরম যত্নে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে নেব।

এক একজন শহিদ

স্বপ্নময়ের বেশ কিছু সংস্কার আছে। যেমন একটা, সকালে ঘুম-চোখ খুলে প্রথমেই দেয়ালে টাঙানো মা কালীর মুখ দর্শন চাই। কেউ কোনওদিন সুমুখে বাধা হয়ে দাঁড়ালে দারুণ মুষড়ে পড়ে। কিন্তু, মেজাজ ঠিকঠাক রাখতে সচেষ্ট থাকে। ওর বিশ্বাস, সাতসকালে মেজাজ বিগড়ালে দিনভর খিটিমিটি অশান্তি লেগেই থাকবে। তা বাড়িতে অফিসে চলতি পথে—সর্বত্র।

স্বপ্নময় আজও যথারীতি শয্যা ছেড়েছে। টয়লেট সেরে খবরের কাগজ পড়ছিল। সুমি চা জলখাবার নিয়ে এসে বসল। এগিয়ে দিয়ে বলল, খারাপ খবরটা এক্ষুণি তোমাকে শোনানো উচিত হবে কিনা ভাবছি।

কিসের খবর? মাখন-টোস্ট দাঁতে কেটে স্বপ্নময় অনুৎসাহী প্রশ্ন রাখল। দৃষ্টি খবরের কাগজে যথাপূর্ব।

মরা-কান্না শুনতে পাচ্ছ না?

এতক্ষণে স্বপ্নময়ের কানে পাড়া জাগানো বুক ফাটানো কান্নার আওয়াজ ধরা পড়ল।

স্বপ্নময়ের প্রকৃতি এরকমই। জেনারেটর, গম ভাঙানো কল, জলতোলা পাম্প ইত্যাদির শব্দ শুনেও শোনে না। ড্রেন ডাস্টবিন ভাগাড়ের দুর্গন্ধ নাকে ঢোকে না। দেহের কোথাও মশা বসলে টের পায় না। রক্ত চোষে। ঢোল হয়ে ফেটে যায়। পোশাকে দাগ ধরে। হঠাৎ নজরে পড়লে অবাক ভাবে, রক্ত এলো কোত্থেকে। অর্থাৎ কিনা, অনেক কিছুই আজকাল ওর চোখ কান গা—সহা হয়ে গেছে। বোধনে আনন্দ নেই। না হয় বিসর্জনে দুঃখ।

কে আবার মরল? স্বপ্নময় প্রতিক্রিয়াহীন প্রশ্ন রাখল।

বিপ্রদাস ভৌমিকগো। সুমির গলায় সমবেদনা ফুটে উঠল, আহা বেচারা। কাল রাত্তিরে বরকর্তা হয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে ফিরলেন। বাড়ির উঠানে বউভাতের ম্যারাপ বাঁধা। ভোর রাত্তিরে স্ট্রোক। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। ডাক্তার হাসপাতাল করার সময়টুকু পর্যন্ত দিলেন না।

ভাগ্য বলতে হবে। স্বপ্নময় যেন হাতপাখার বাতাস ছুঁড়ল।

কার ভাগ্য দেখলে তুমি? সুমি মনক্ষুণ্ণ হল।

যিনি গেলেন আর যাদেরকে কানাকড়িও খরচ করতে দিলেন না—দু'তরফেরই।

কত সহজে বলে ফেলতে পারলে! অবাক সুমি অভিযোগ জানাল, দিন কে দিন তুমি যেন কেমন হৃদয়হীন হয়ে পড়ছো।

হৃদয়কে খামকা বিব্রত করে লাভ কী? রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে নিরুত্তাপ স্বপ্নময় খবরের কাগজখানা পরিপাটি ভাঁজ করে রাখল। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ফের বলল, আসলে আকছার খুনখারাপি দুর্ঘটনায় মৃত্যু আত্মহত্যা ইত্যাদি দেখে-শুনে-পড়ে চিত্ত অসাড় হয়ে গেছে। এখন সার বুঝেছি, যার যখন সময় হবে, আসবে যাবে। অযথা মাথা না ঘামিয়ে স্রেফ কাটিয়ে দাও আনন্দে।

একজন পরিচিত পড়শি অকালে মরলেন, আর তুমি কিনা বলছো আনন্দে কাটিয়ে দিতে? সুমি গলা চড়িয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল।

বেশ জম্পেশ করে শীত পড়েছে। স্বপ্নময় পরিস্থিতি সামাল দিতে কৌতুক করল, আমার যাবার সময় হল দাও গরম জল।

অন্যসময় হলে সুমি নির্ঘাত দু'দশটা কটু কথা শোনাত। কিন্তু, সংস্কারের কথা মগজে ধরে নির্বাক জলের যোগাড়ে গেল।

সরকারি সাব-অফিসের প্রধান করণিক স্বপ্নময় আজ অপ্রত্যাশিত আগে দপ্তরে এসে পড়েছে। এরকম অসময়ে সাধারণত কারও পৌঁছানোর কথা নয়। যানবাহনের গোলযোগে না পড়লে ব্যতিক্রম একমাত্র টাইপিস্ট যমুনেশ পোদ্দার। তাই বলে আজও যমুনেশ ফার্স্ট কামার! স্বপ্নময় হতাশ হল।

যমুনেশও হকচকিয়ে গেল। টেবিলের অপর প্রান্তের চেয়ারে দু'পা তোলা। মৌজ করে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল। রীতিমতো অপ্রস্তুত। ঝটিতি সিগারেট লুকিয়ে উঠে দাঁড়াল। ধোঁয়া তাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, এত তাড়াতাড়ি? জরুরি কিছু টাইপ করতে হবে?

নাহ্। একগাল হেসে স্বপ্নময় বলল, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া ব্যাপার আর কী! চেনাজানা একজনের গাড়িতে লিফট পেয়ে গেলাম তাই। পরে আপশোশ করল, তাতেও তোমাকে বিট করতে পারলাম না, আশ্চর্য।

যমুনেশের ঠোঁটের কোণে আত্মসুখের একচিলতে হাসি ঝিলিক মারল। স্বপ্নময় নিজের টেবিলের পাশের স্তম্ভে ঝুলন্ত ক্যালেন্ডারে মা কালীর ছবিতে প্রণাম সেরে যমুনেশের পাশে এসে বসল। বয়সের বিস্তর ব্যবধান দূর হটিয়ে বলল, এক পিস সিগারেটের যা দাম এখন। অতটা ফেলে দেওয়া ঠিক হয়নি।

এ কোন স্বপ্নময়! অবাক যমুনেশ তবু যথেষ্ট সঙ্কুচিত।

লজ্জার কিছু নেই। স্বপ্নময় একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল, তুমিও নাও একটা।

দু'জনে নির্বাক কিছুক্ষণ ধোঁয়া ওড়াউড়ির পর স্বপ্নময় নিস্তব্ধতা ভাঙল, কিছু মনে না করতো একটা প্রশ্ন করব?

করুন।

যতদূর জানি, বিধবা মা ছাড়া তোমার আর কোনও লায়াবিলিটি নেই। এখন তোমার মাইনেপত্র মন্দ না। বাবার আমলের ভারাটেদের কাছ থেকে কিছু বাড়তি উপার্জন আছে। এত বয়স হল অথচ বিয়ে করছো না কেন? তেমন ব্যক্তিগত গোপন কিছু হলে জানতে চাইছি না।

না না। তেমন কিছু না। স্রেফ ভয়ে। আর সেই ভয়টা ধরিয়ে দিয়েছে জানলার ধারের টেবিলের সুকৃতিদা। ক'বছর আগে ওর বিয়ে হয়েছে আপনার মনে আছে?

তা দশ-বারো বছর হবে।

পাক্কা বারো বছর। চাকরির প্রথম মাইনে পেয়ে ওর বউভাতের নিমন্ত্রণে উপহারের জন্য পনের টাকা চাঁদা দিতে হয়েছিল। কাজেই স্পষ্ট মনে আছে।

সুকৃতির সঙ্গে তোমার তেমন কিছু ঘনিষ্ঠতাতো নজরে পড়ে না। ভয় বাড়িয়ে দিয়েছে কিসব বলে?

কিছুই বলেনি। যমুনেশ নড়েচড়ে বসে, এতই যখন কৌতূহল শুনুন তাহলে।

যমুনেশের জবানিতে স্বপ্নময় যা শুনেছিল তা এতকাল দেখেও দেখি নাই গোছের বিস্ময়কর রীতিমতো।

সুকৃতি সরখেলের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকত যমুনেশ। দেখত, ওর স্মার্ট হ্যান্ডসাম চেহারা। নজরদারি পোশাক-আশাক। উচ্ছল প্রাণচাঞ্চল্য। ঠোঁটে ঝুলন্ত ফিল্টার উইলস সিগারেট। অফিস

পিওনকে দিয়ে আনিয়ে খাওয়া টিফিন—রোল কাটলেট চাউমিন অথবা গাঙ্গুরামের প্যাকেটে ভরা মিষ্টি ইত্যাদি।
সুকৃতি সিনেমা থিয়েটার জলসা খেলা দেখতো যথেষ্ট। অফিস যাতায়াত করত, শাটল্ ট্যাক্সি মিনি অথবা ডিলাক্স বাসে। বছরে একবার অন্তত সমুদ্র পাহাড় অথবা অরণ্য অঞ্চলে ট্যুরে যেত। বন্ধুদের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বেহিসেবি আড্ডা দিত। চলতে ফিরতে শিস দিয়ে গান গাইত। ইত্যাদি ইত্যাদি।
এসব দেখেশুনে অবাক যমুনেশ গহিন গোপনে ঈর্ষা টের পেত।
দিন মাস বছর পার হয়ে যেতে সুকৃতি একসময় পুত্র গর্বে গর্বিত পিতা হল। সেই থেকে বদলে যেতে থাকল ওর অনেক কিছুই।
সুকৃতি এখন আর শাটল্ ট্যাক্সি ডিলাক্স বাসে চড়ে না। ফি বছর ট্যুরে যায় না। সিনেমা থিয়েটার জলসা খেলা দেখতে যায় খু-উব কম। আর টিফিন? ছোট্ট বাক্স বন্দী হয়ে বাড়ি থেকে রুটি তরকারি মিঠাই আসে।
বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। একমাত্র সন্তানকে কলকাতার নামকরা ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে ভর্তি প্রচেষ্টায় সুকৃতির সেযে কী ভীষণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সফল হয়ে আহ্লাদে আটখানা হল। কিন্তু উবে যেতে থাকল নিজের নজরদারি পোশাক আশাক। সিগারেটের ব্র্যান্ড বদলে ঠোঁটে ঝুলল চার্মস। ছেলে-সংসার নিয়ে ওর মা নাকি এতই নাকাল যে স্বামীর অফিস-টিফিন তৈরি করার সময় পায় না। সুকৃতি তাই কিনে খায় টোস্ট চা। কখনও সখনও ডিমের ওমলেট ডালপুরি কচৌড়ি-কিছু একটা।
শুভাকাঙ্ক্ষীদের অভিমত, একটিমাত্র সন্তান নাকি যথার্থ না। মনস্তাত্বিকেরা বলে থাকেন, অন্তত একটি ভাই বা বোন না থাকলে বাচ্চারা ভয়ানক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতি, স্বার্থপর হয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ জীবনে নানা মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এছাড়া, অধিকাংশ মা-বাবার স্বপ্ন, সখ আহ্লাদ তো থেকেই থাকে। পুত্র কন্যা দ্বিবিধ সন্তান বিনা ষোলকলা স্বাদ নাকি অপূর্ণ থেকে যায়।
অতএব, সাড়ে পাঁচ বছরের মাথায় প্রত্যাশা অনুযায়ী সুকৃতির একটি কন্যা সন্তান জন্মাল। কিন্তু, ছোট পরিবার সুখী পরিবার বিজ্ঞাপনটি যথার্থ কি?
সুকৃতি এখন অসুখী কিনা যমুনেশ তা জানে না। তবে হামেশা ওর অসুখ বিসুখ টের পায়। নজর এড়ায় না—অকালে চুল পেকেছে দেদার। ঈষৎ টাক উঁকি দিতে দেখা যায়। চোখে উঠেছে, হাই লেন্সের চশমা। তুবড়েছে, এককালের ভরাট গাল। গ্যাসটিক আলসারে সুঠাম শরীর ভেঙে তছনছ। ছেড়েছে, ফি রোজ পোশাক বদল আর গাল সাফসুফ অভ্যেস। চা সিগারেট খায় না বললেই চলে। টিফিন বলতে চিবোয় সাদা মুড়ির সঙ্গে বাতাসা অথবা বাদাম।
সুকৃতি এখন আর শিস দিয়ে গান গায় না। চোখ মুখের আদলে ভাসে্ একরাশ ক্লান্তি বিরক্তি বিষণ্নতা। প্রায়শই খুক খুক কাশে সুকৃতি। বুকের ভেতর থেকে একদলা কফ্ বেরিয়ে আসে। শ্বাসকষ্টে হাঁপিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অন্তে যমুনেশ মন্তব্য ছুঁড়েছিল, আমাদের মতো যে কোনও একজনের বিবাহোত্তর জীবন বিবর্তন তো মোটামুটি একইরকম। তারপর প্রশ্ন তুলেছিল, ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে যৌবনে

আত্মসুখ বিসর্জনের নামে প্রকারান্তরে আত্মঘাতী হতে ভয় পাওয়া কি দোষের কিছু? স্বপ্নময়কে নির্বাক থাকতে দেখে ফের বলেছে, জবাবটা এক্ষুণি নাহলেও চলবে। ভেবেচিন্তে পরে জানাবেন, বিয়ে করা আমার উচিত কিনা।

অনেকগুলি দিন পার হলেও স্বপ্নময় জুতসই কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি। সেজন্য, অফিসে যমুনেশের মুখোমুখি হলে অস্বস্তিতে পড়ে। অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়।

আজ প্রয়াত বিপ্রদাস ভৌমিকের আত্মার শান্তিকল্পে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের দিন। স্বপ্নময়ও নিমন্ত্রিতদের একজন। শ্রাদ্ধবাসরে ভুরিভোজ অপছন্দ হলেও সৌজন্যমূলক গেল। সঙ্গে নিল রজনীগন্ধার মালা, কিছু সাদা ফুল আর সুগন্ধী ধূপ।

ফুলে ফুলে প্রায় ঢাকা বিপ্রদাসের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে স্বপ্নময় বিস্ময়ে হতবাক। অদ্ভুত পরিতৃপ্তি উজ্জ্বল বিপ্রদাসের দু'টি চোখে। বিপ্রদাস অনবদ্য হাসছেন। বিচ্ছুরিত হচ্ছে অহং। দুঃখ কষ্ট ত্যাগের পরিণামই তো সুখ। তারই প্রতিচ্ছবি কি? স্মৃতি সতত সুখের। স্বপ্নময় আশ্চর্যরকম আত্মমগ্ন হয়ে পড়ল।

তখনও পাড়ায় জমজমাট এত পাকা বাড়ি ঘরদোর হয়নি। না ছিল বিদ্যুৎ-বাতি পিচ রাস্তা-নর্দমার সুব্যবস্থা, পানীয় জলের সচ্ছলতা। বিপ্রদাস সেই আদিপর্বের বাসিন্দাদের অন্যতম একজন। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ বিপ্রদাস শখের যাত্রাদলের নবাব বাদশা সাজতেন। জুতা কারখানায় সাধারণ শ্রমিক হলেও ছিল আড়াই কাঠার জমিদারি। যদিওবা মাটির ভিটেয় কামরা দু'টি বাঁশ বাখারি টালিতে তৈরি, তবু বাড়িঅলাতো বটে।

বিপ্রদাসের স্ত্রী আইভিকে দেখতে অসুন্দরী হলেও শারীরিক গঠন নজরদারি। ওর পিতৃকুলের আপনজনেরা নিজস্ব গাড়ি হাঁকিয়ে হামেশা আসা-যাওয়া করত। ওদের চেহারা পোশাক আশাক চালচলন রীতিমতো খানদানি। সেদিক থেকে আইভি নামটা যথার্থ। পাড়া প্রতিবেশীদের নজরে বিপ্রদাস-আইভির বিয়েটা বেখাপ্পা লাগত। সুমি হাজার কৌতূহলী প্রশ্নের সরল যবনিকা টেনেছিল, আইভির জন্যই অমন সুন্দরী বোন দুটির বিয়ে হচ্ছিল না হয়ত। তাই বাধ্য হয়ে ওকে এই বিয়ে মেনে নিতে হয়েছে।

সব দিক থেকেই দু'বাড়ির মধ্যে বিস্তর অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও আইভি মানিয়ে নিয়েছে যথাযথ। ক্রমে বদলেছে অনেক কিছুই। বিপ্রদাসের ভিটে থেকে বাঁশবাখারি উধাও হয়ে গেছে। পরিবর্তে, শক্ত ভিতে ইটের দেয়াল উঠেছে। একমাত্র সন্তান সুষেণ জন্মাবার পর বাড়িতে বিদ্যুৎ-বাতি এসেছে। টালির বদলে পাকা ছাদ হয়েছে, সুষেণ যখন স্কুলে পড়ে। ওর কলেজ জীবন সমাপ্তির আগে টুকটাকের বেশি কিছু পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর পড়াশোনার খরচ থেকে রেহাই পেয়ে প্রথমে উঠানে টিউবওয়েল হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে ছাদে জলের ট্যাঙ্ক উঠেছে। জলের পাম্প বসেছে। হয়েছে স্যানিটরি পায়খানা, যথাযথ আব্রুঅলা পাকা বাথরুম ইত্যাদি অনেককিছু। অধিকাংশই ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে। পুত্রবধুর সুখস্বাচ্ছন্দ্যর জন্য।

কিন্তু গ্র্যাজুয়েট হলেই কি আর চাকরি মেলে? ক্ষমতা বহির্ভূত খরচে কর্জের টাকার দায়ে জর্জরিত বিপ্রদাস। অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনেও পাওনাদারদের তাগাদা এড়াতে পারেননি। মাসের শেষে সংসার সামাল দিতে পাড়ায় পরিচিত জনের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়েছেন। আইভিও ছুটে এসেছে

বারকয়েক সুমির কাছে। মানসিক অস্থিরতা, লাগাতার দুশ্চিন্তা আর পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তলে তলে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন বিপ্রদাস। বাদশাহী শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল তিলে তিলে। দেহ জুড়ে হাজারো ব্যামো এসে বাসা বেঁধেছিল। সব কিছু মিলে বিধ্বস্ত বিপর্যস্তর একশেষ।
বিপ্রদাস মুশকিল আসানের কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ঠিক সেই সময় হঠাৎই কারখানায় এক নয়া-নীতি ঘোষিত হল। অন্যূন পাঁচ বছর আগে কোনও কর্মী স্বেচ্ছা অবসর নিলে তার যে কোনও একজন সন্তান যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাওয়ার অধিকার অর্জন করবে। বিপ্রদাস সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।
ব্যস্, সব সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে গেল। সুযেণ আর বেকার রইল না। কারখানা থেকে প্রাপ্য পাওনা গণ্ডা পাওয়ায় বিপ্রদাসের বেবাক দেনা শোধ হল। বেশ কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হওয়ায় ব্যাঙ্কে জমা পড়ল। অতএব বছর না ঘুরতেই চিন্তামুক্ত বিপ্রদাস পুত্রবধূ নাতি-নাতনির সুখ-স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। দেড় বছরের মাথায় সুযেণের বিয়ে পাকা হয়ে গেল। ফলশ্রুতি, বিপ্রদাস অকালে ছবি হয়ে গেলেন।
হিন্দু মতে, বিপ্রদাসের দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। আত্মা পৌঁছে গেছে চিরশান্তির আনন্দধামে। অথচ, স্বপ্নময় ছবিতে ওকে যেন জীবন্ত দেখতে পাচ্ছে। চন্দন চর্চিত অজস্র ফুল মালা শোভিত সুবাসিত ধূপের শ্রদ্ধার্ঘ্যে অভিভূত বিপ্রদাস সগর্ব হাসছেন।
এতদিনে যমুনেশের প্রশ্নের জুতসই জবাব খুঁজে পায় স্বপ্নময়। আমৃত্যু কর্মময় সংসার-ধর্ম পালন করে গেছেন বিপ্রদাস। সংসারও তো যুদ্ধক্ষেত্র বিশেষ। সেখানে বিপ্রদাসের আত্মবলিদান, সুকৃতির উৎসর্গীকৃত প্রাণ কম কিছু না ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তির চেয়ে।

পার হতে সংশয়

শীতের সময়ে সাতটা চল্লিশকে বেশ রাত মনে হয়। বেহালা থেকে পাঁচটা বিশে বেরিয়েছে নীলাদ্রি। মাঝে নিউ মার্কেটে ফুল কিনতে যেটুকু সময় লেগেছে। রাস্তার যা বেহাল অবস্থা তাতে পদ্মপুকুরে অভীকের ফ্ল্যাটে পৌঁছতে একটু দেরিই হয়ে গেছে।

বছর পাঁচেক আগে একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে সৌখিন এই ফ্ল্যাটে এসেছে অভীক। প্রথম দিকে দুই তরফে যাতায়াত স্বাভাবিকই ছিল। দু'বছর আগে ছোট বোন জয়িতার বিয়ের সময় থেকে সব যেন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দেয়নি অভীক। তারপর থেকে মা বোনের জন্য মাসিক টাকা পাঠানো বন্ধ। পরবির্তে মা-কে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। স্বামীর ভিটে ছেড়ে মা আসে কখনও!

নীলাদ্রির হাতে হলুদ গোলাপের বোকেটটা ওরই নির্দেশমতে তৈরি করা হয়েছে। একগুচ্ছ হলুদের মাঝে একজোড়া অন্য রঙের গোলাপ গাঁথা। অভীক আর মীন। পৃথক বছর হলেও দু'জনে কাকতালীয় একই মাস দিনে জন্মেছে। আজ ওদের যুগল জন্মদিন। গোলাপ দু'টির রং লাল আর পিঙ্ক। বোকেটের হাতলটা রুপোলি রাংতায় মোড়া। তবে ব্লু রিবনের তৈরি ফুল বাঁধা।

অর্ণব জন্মাবার পর থেকে যুগল জন্মদিন বিবাহ বার্ষিকীতে কোন অনুষ্ঠান হয় না। তবু বিনা নিমন্ত্রণে এই দিনটিতে নীলাদ্রি ঠিক হাজির হয়। আসবে না কেন? অভীকতো মাত্র বিশ মিনিটের ছোট। যমজ ভাইরা কীসের আবার ছোটবড়! দু'জনের সম্পর্ক তো বন্ধুর মতো। না-থাক জায়ে জায়ে তেমন মিলমিশ বোঝাপড়া। সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার আগে আলাদা থাকাইতো শ্রেয়। তাছাড়া, অভীক কাজ করে বহুজাতিক সংস্থায় উঁচুদরের পদে। পাওনা বাড়তি সুযোগ সুবিধাগুলিই বা হাতছাড়া করবে কেন। এখান থেকে অর্ণবের পড়াশুনোয় যে অনেক সুবিধা সেটাওতো মিথ্যে নয়। মা-র পক্ষেও অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল। এখানে থাকলে অভীক ওর অফিস থেকে মা-র জন্য সবরকম চিকিৎসার খরচ আর এল টি সি পেত। মা যতই অবুঝ রাগ অভিমান করুক না কেন অভীকের ওপর কোন ক্ষোভ নেই নীলাদ্রির।

আজ যে শেষ পর্যন্ত আসতে পারবে নীলাদ্রি তা ভাবতে পারেনি। যদিও প্রস্তুতি ছিল সকাল থেকেই। বাবা অসময়ে মারা যেতে অভিভাবকদের দায়িত্বটা কাঁধে নিতে হয়েছিল। বোনেদের বিয়ে দিতে হয়েছে আগে। নিজে বিয়ে করেছে অভীকের অনেক পরে। সন্তান হয়েছে বিয়ের বেশ কয়েক বছর পেরিয়ে।

ভীষণ দুষ্টু হয়েছে ঝুমা। পাঁচ বছর বয়সেই পাড়ার বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে চায়। তো পারবে কেন? এটা সেটা অসুখ বিসুখ দুর্ঘটনা লেগেই আছে। বড়দের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ খেলতে গিয়ে আজ আচমকা পড়ে গিয়েছিল ঝুমা। দাঁতে দাঁত লেগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। রক্ত জমাট কপাল ফুলে সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। তারপরেও যদি বমি করে ঝিম মেরে শুয়ে থাকে? অল্প অল্প গা গরম হয়। কিছু খেতে না চায়। সেই সঙ্গে শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ মৃগী রোগের আশঙ্কা প্রকাশ করে। তখন কোন্ বাপের মাথা ঠিক থাকে?

ঝুমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল আতঙ্কগ্রস্ত নীলাদ্রি। তিনি ভাল করে দেখে শুনে নিশ্চিন্ত করলেন, ভয়ের কিছু নেই। ওযুধ লিখে দিয়ে বললেন, এই ওযুধগুলি দু'একবার পেটে পড়লেই স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

বিকেলের দিকে অবস্থার উন্নতি দেখে পৃথাই বলল, ওরা আশা করে অপেক্ষায় থাকবে। তুমি বরং একবারটি ঘুরেই এসো। সবতাতেই তো আমার দোষ। অনুযোগ দেয়, দাদা ভাল বউদিটাই যত নষ্টের গোড়া। তুমি না গেলে ভাববে, ঝুমার জন্মদিনে আসেনি বলে আমিও যেতে দেইনি।

অস্থির উদ্বিগ্ন নীলাদ্রি সাত পাঁচ ভেবে মা-কে বলল, ঝুমাতো এখন মোটামুটি ভালই আছে। শুভ্রতো আছেই। পার্টি অফিসে খবর পাঠালেই এসে যাবে। ভাবছি, একবারটি অভীকদের ওখানে যাই। খেয়েই চলে আসব। তুমি কি বল?

যাচ্ছিস যা। মা তাঁর মনের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, অভীর সবকিছুতেই সময় হয় শুধু মাকে দেখতে আসার সময় সুযোগ হয় না। সবই বুঝি। কিন্তু একা তুই একতরফা কতদিন আর এভাবে জোড়াতালি-সম্পর্ক রাখবি বল?

নীলাদ্রি কোন জবাব খুঁজে পায় না। মা-র ক্ষোভ অভিমান তো অসঙ্গত অযৌক্তিক না। অভীককে আজ একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

অথচ ঘটনাটা ঘটল অন্য রকম। নীলাদ্রি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, এরকম একটা পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে। শুভ্রটা ছ'মাস যাবত লক আউটে বেকার। আগের তুলনায় সংসারের অভাব বেড়েছে। তবু শুধু সময়ের তাগিদে নিউ মার্কেট থেকে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে এসে একী দেখছে!

অভীকদের ঘরের জানলাগুলি বন্ধ। শীতের রাত বলে কী? কোলাপসেবল্ গেটের পর্দা সরাতে অন্ধকারে ঢাকা ভেতর দিকটা দেখা গেল। বিশেষ বিশেষ দিনক্ষণে অর্ণবকে মামা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে ওরা এরকম মজা করে বটে। বাইরের লোকজনকে এ্যাভয়েড করে দু'জনে অন্ধকারে ডুব দিয়ে থাকে। তবে কী এবার আমাকেও ফিরিয়ে দিতে চাইছে ওরা?

মনঃক্ষুণ্ণ নীলাদ্রির ধন্দ লাগল। রাগও হল। নানা ভাবনা চিন্তা ঘুরপাক খেল। কিন্তু কতক্ষণ আর অসহায় বিষণ্ণমুখে ফুল হাতে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। ওপরের ফ্লোরগুলির লোকজনেরা দেখে ফেললে লজ্জার অন্ত থাকবে না।

নীলাদ্রির কাঁধে ঝুলন্ত কাপড়ের ব্যাগে বিচিত্র সব উপহার সামগ্রী। সুগন্ধী ধূপের প্যাকেট আছে কয়েকটা। এক ডিব্বা শুখাঠান্ডি সুপারি। এক ডজন কমলালেবু। নারকেল-ঝিঙ্গে আর চুঁনো মাছের চচ্চড়ি। এসবই মীনের প্রিয়। আর আছে অভীকের পছন্দ মোচা-চিংড়ি, কচুশাক, নলের গুড়ের পায়েস। না হলেইবা জন্মদিন, অর্ণবের লোভনীয় জিনিসটাইবা বাদ পড়ে কেন? ওর জন্য নারকেলের নাড়ু পাঠিয়েছে পৃথা।

এসব ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কেমন করে? হতাশ বিষণ্ণ নীলাদ্রি ভাবল, কাদের জন্য এসব তিরতির প্রবাহের ভালবাসা বয়ে আনা! ওরা যে এখন অন্য জগতের মানুষ। ধনী ও বস্তুবাদি। সূক্ষ্ম অনুভূতিহীনদের কাছে এসব নিতান্তই ক্ষুদ্র তুচ্ছ মূল্যহীন সামগ্রী মাত্র।

নীলাদ্রির হাত পা কাঁপছে মনে হল। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে কান্না এলো। দুঃখ বুকে উপহার সামগ্রীগুলি গ্রিলের ফাঁক দিয়ে একে একে মেঝেয় নামিয়ে রাখল।

এখন রাত আটটা। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে নীলাদ্রির। ভেবেই পাচ্ছে না, কোথায় যাওয়া যায়। এখনই ঘরে ফিরলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। সেতো আরও বড় রকমের বেইজ্জতি ব্যাপার হবে। পৃথা দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে বলবে, কতবার বলেছি ওরা সম্পর্ক রাখতে চায় না। তা সত্ত্বেও খামোকা তুমি আগ বাড়িয়ে এগিয়ে যাও। গিয়ে পড়লে অপমান করে তাড়াবে কেন? ভন্ড ভালবাসার আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে যাও। আমাকে এসে গদগদ গল্প শোনাও।

আজকের ঘটনা জানাজানি হলে যে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের ফারাক ফাটলটা আরও বাড়বে নীলাদ্রি তা স্পষ্টত অনুমান করতে পারল। স্বয়ং মা আর এমুখো হতে দেবেন না সে আশঙ্কাও হল। তাই হোটেলে খেয়ে বেশি রাতে ঘরে ফিরল। তবু মা-কে এড়ানো গেল না। জেগে প্রতীক্ষায় থেকে জিগ্যেস করলেন, খেয়ে এসেছিস নীলু?

হ্যাঁ মা। জবাব দিয়েই প্রশ্নটায় মনে খটকা লাগল। খেয়েই ফেরা হবে তাতো বলাই ছিল, তবু প্রশ্ন কেন!

বিস্ময়ের পাতলা আবরণটা সরিয়ে দিল পৃথা।

রাত আটটা নাগাদ অর্ণব এসেছিল। ওরা এলে বারান্দার দক্ষিণে মা-র ঘর দিয়ে ঢোকা অভ্যেস। আজ অর্ণব নীলাদ্রিদের ঘরের সুমুখ দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা শুভ্রর ঘরে চলে গেছে। জন্মদিন উপলক্ষে রান্না করা পাঁচপদ খাবার ভরা ক্যারিয়রটা টেবিলে রেখেছে। তারপর পৃথার হাতে কয়েকখানা দুষ্প্রাপ্য বই ক্যাসেট দিয়ে বলল, জেঠুকে দিও। বাবা নিয়েছিল, ফেরত পাঠিয়েছে। তোদের ওখানে যাবে বলে জেঠু সোওয়া পাঁচটা নাগাদ বেরিয়েছে। অর্ণবকে ব্যস্ততায় দ্রুত চলে যেতে উদ্যোগী দেখে পৃথা বলল, কতদিন পরে এলি বলত? বোস একটু চা টা খা। পরীক্ষা কেমন হল?

উত্তর এড়িয়ে গিয়ে অর্ণব শুয়ে জেগে থাকা ঝুমাকে জিগ্যেস করল, এত তাড়াতাড়ি লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে আছিস যে!

সোনা মা আসেনি কেন? নিস্তেজ ঝুমা জানতে চাইল।

দিদার অসুখ তাই দেখতে গেছে।

আমারও অসুখ।

পৃথা বৃত্তান্ত শোনাল।

প্রতিক্রিয়াহীন অর্ণব ঝুমাকে বলল, যাবি আমার সঙ্গে?

কোথায়?

সোনা মা-র কাছে।

না। না-যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করল, সোনা মা আমাকে যেতে বলেছে? তোমরা আসো না কেন?

নির্বাক তাকিয়ে থাকে অর্ণব।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পৃথা বলল, অসুখ হলে অত বেশি কথা বলতে নেই ঝুমা।

অর্ণব কিছুই খেল না। দু'দন্ড বসল না। এ বাড়ির দিদার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না। ঝটিতি চলে গেল।

কেমন যেন রহস্যময় গোলমেলে ব্যাপার মনে হল নীলাদ্রির। অর্ণবকে তো দোকান বাজার স্কুল ছাড়া একা ছাড়ে না কোথাও। অভীককে কতদিন বলেছে, এটা তোরা ঠিক করছিস না। ক'দিন পর ছেলেটা কলেজে পড়বে। অথচ, কলকাতায় বাস করে কিচ্ছুটি চেনে না। একটু একটু করে একা ছেড়ে চেনা জানার সুযোগ দেয়া দরকার।

প্রায় একবছর আগে শেষবারের মতো অভীক ওরা তিনজনে একসঙ্গে এবাড়িতে এসেছিল। সেই সময় মীনকে মা কী সব খেদ কথা শুনিয়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। সেই থেকে এবাড়িতে আসা বন্ধ। চার মাস আগে ঝুমার জন্মদিনে একা অর্ণবকে ছাড়তে ভরসা পায়নি বলেই বোধহয় অভীকও

এসেছিল। অসুস্থতার অজুহাতে মীন আসেনি। সেটা সহজভাবে নিলেও অভীক যে দীর্ঘদিন মা-র খোঁজ খবর নিতে আসেনি সেই অভিমানে মা ওর দেয়া হাতখরচের টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে দু'চার কথা শুনিয়েছিলেন। সেই থেকে এই চার মাস আর কেউ আসেনি।

নীলাদ্রি অনুমান করল, নিশ্চিত অভীক মীন কেউ একজন বড় সড়কে ট্যাক্সিতে বসে থেকে অর্ণবের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওদের নির্দেশমতেই নিষ্ঠাবান সৈনিকের ভূমিকায় অর্ণব দায়িত্বটুকু পালন করে গেছে মাত্র। তাহলে আর ছেলেটার দোষ কীসে?

পৃথাকে কিছুই বুঝতে দিল না নীলাদ্রি। কিন্তু পৃথা জিগ্যেস করে বসল, অর্ণ যে এখানে এসেছে তোমাকে বলেনি ওরা?

না তো! আচমকা বিব্রত করা প্রশ্নে সামাল দিতে বলল, হয়ত সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছে বলেই বলেনি। অর্ণর খোঁজ নিতে বলল, মামা বাড়ি গেছে।

ঝুমার অসুখের খবর শুনে বলল কিছু?

বলার কি-ই বা আর আছে। মিথ্যা বলায় অনভ্যস্ত নীলাদ্রি সতর্ক জবাব দিল।

কিচ্ছু বলল না? আশ্চর্য! মনঃক্ষুণ্ণ পৃথা স্বগতোক্তি করল, মানুষ কত সহজে পাল্টে যায়। শুধু অর্ণর বোনের আশায় ঝুমা পেটে আসার পর থেকে কী-ই না করেছে আমার জন্য। ঝুমা হতে ওর জন্য তুমি আর কতটুকু করেছো—সবই তো ওরা দু'জনে করেছে। মেয়েটা উঠতে বসতে সোনা মা-র নাম করে। ওখানে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলে। তখন কী যে মুশকিলে পড়ি।

মুশকিলে না-পড়ে গেলেই তো পার। যাও না কেন?

কেন যাব? সর্পিণীর মতো ফোঁস করে ওঠে পৃথা, তিনিইবা ওকে না দেখে থাকছে কেমন করে! ওর কি দোষে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে? আগেতো একটু শরীর খারাপের খবর শুনলেই ছুটে আসতে দেখতাম। সেসব কোথায় গেল এখন?

তুমিও তো যাতায়াত প্রায় ছেড়েই দিয়েছো। সেজন্য ওদেরও তো ক্ষোভ থাকতে পারে।

মীনুর অসুখের খবর শুনে আমি দেখতে যাইনি? তাই বলে কি আমার অল্প বয়সের ভাইটা মরে যেতে আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল? আমি তো তখন প্রায় আধপাগল। ওদেরকে যা কিছু কটু কথা মা বলেছেন। সে জন্য মা-র সঙ্গে আমাদেরকে জড়িয়ে ফেলছে কেন। এই যে ঝুমার এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটল। খবরটাতো শুনলো। আসবে ভাবছো?

তোমার কি মনে হয়?

মনে হয় না আসবে। সেবার তো বড় মুখ করে বলেছিল, ঝুমুসোনার জন্মদিনে না-এসে থাকব ভাবাই যায় না। ওযে আমারও মেয়ে। অর্ণর একমাত্র বোন। পাঁচ বছর বয়স থেকে অর্ণকে ভাইফোঁটা দেবে। আর যাই হোক যতদিন বাঁচব ওর জন্মদিনে আসবই। তীব্র গতিতে কথাগুলি শুনিয়ে পৃথা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশা প্রকাশ করল, এবার জন্মদিনে এলো?

আর কোন প্রশ্ন-উত্তরে গেল না নীলাদ্রি। ওদের আচরণটা ইদানীং সত্যিই দৃষ্টিকটু নজরে পড়ার মতো। এখান থেকে চলে যাওয়ার পরও সম্পর্কটাতো ভালই ছিল। হামেশা আসতো থাকতো। তিন রাত্রি ছুটি পর্যন্ত কাটিয়ে যেত। অভীক পছন্দমতো বাজার করে আনত। মীন রান্নায় পৃথার সঙ্গে হাত মেলাত। নববর্ষ দোল পূজা বিজয়া বাৎসরিক শনি সত্যনারায়ণের সিন্নিতে নিশ্চিত উপস্থিতি ছিল। যখনই আসত হাতে থাকত নানা উপহার সামগ্রী। মা-র জন্য আমসত্ত্ব জর্দা পানবাহার তো অবশ্যই।

আর এখন? চিঠিতেই বিজয়া-কর্তব্য করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিতিতো দূরের কথা, ছুটে আসে না বিপদ আপদে। ছোট বোন জয়িতা সন্তান ধারণের ছ'মাস পর থেকে এখানেই ছিল। জন্মের তিনদিন পর সন্তান হারিয়ে হাসপাতাল থেকে এখানেই ফিরে এলো। বেশ কিছু দিন থেকে গেল। লক আউটে বেকার শুভ্রর হার্ণিয়া অপারেশন হল। হার্টের রোগী মা পা মচকে পড়ে রইল বেশ কিছুদিন। পৃথার স্ত্রীরোগ তো আছেই। সেইসঙ্গে প্রায়ই রক্ত জ্বর আমাশয়ে ভোগে। এসবের মধ্যে নীলাদ্রি নিম্ন রক্তচাপ ওঠানামা করে। ঝুমার টুকটাক তো লেগেই আছে।

এসবই অভীকরা জানে। জেনেও আসেনি, আসে না। তাতে পৃথা যদি বলেই যে, ওরা তোমাকে এড়িয়ে থাকতে চায়। তবু কেন যে তুমি যাও বুঝিনা। পৃথার এই বলা দোষের কিছু না।

তবু নীলাদ্রি বোঝাতে চাইল, সম্পর্ক রাখতে গেলে একজনকে তো নত হতেই হবে। সবক্ষেত্রেই ছোটকে যে হার মানতে হবে—এটা কোন কাজের কথা নয়। বড়কেও উদার মনে অনেক সময় ছোটকে বুকে টেনে নিতে হয়।

চেষ্টার তো ত্রুটি করোনি কোন। পৃথা চাপ সৃষ্টি করল, এবার ক্ষান্ত দাও। পাড়ার লোকেরা বুঝেই যখন গেছে তখন মিছিমিছি কেন আর ঢাকাঢাকি?

কি বুঝেছে?

বিপদ আপদেও যখন ওরা আসছে না তখন নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আর সেই সম্পর্ক নেই।

অতই সহজ? নীলাদ্রি সরল সত্যটা হেসে উড়িয়ে দিল, সম্পর্কটা রক্তের। বংশ পরম্পরায়। আর মীনের ক্ষেত্রে? একবার কাউকে ভালবাসলে সে ভালবাসা থেকে বিরত হওয়া যায় না। জাগতিক বন্ধন ছিন্ন হলেও স্নেহের বন্ধন থেকেই যায়। স্থূল দৃষ্টিতে সেসব নজরে পড়ে না।

রক্তের সম্পর্কতো ওদেরও। পৃথা বিতর্কের ইতি টেনে বলল, ঝুমার খবর শুনে ওরা যদি এবার না-আসেতো আমার মাথার দিব্যি রইল, তুমিও ও বাড়িতে আর যাবে না।

নীলাদ্রি জানে ওরা আসবে না। কিন্তু সত্যিই যদি না-আসে তাহলে অবস্থা কেমন দাঁড়াবে, কতদিন আর দুই পরিবারের ফাটলধরা সম্পর্ক একা সে আগলাবে। পৃথাকে যে এতদিন বড়মুখ করে বুঝিয়ে এসেছে, দেখে নিও হঠাৎ আমার খারাপ কিছু একটা হয়ে গেলে অভী অন্তত ছুটে আসবে। আমার চেয়েও বেশি দায়িত্ব নিয়ে দেখভাল করবে। শুধুতো রক্ত সম্পর্কই না, যমজও বটে। ওপরে দেখতে অমন হলেও অভীর মনটা আমার মতোই।

তিন দিন কেটে যেতেও অভীকরা কেউ এলো না। ভালবাসার টানযে কি তা প্রতিদিন বিছানায় শুয়ে নীলাদ্রি টের পাচ্ছে। রাত্রে সহজে ঘুম আসে না পৃথার। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

নীলাদ্রির ইচ্ছে হল অভীককে একখানা চিঠিতে লেখে, ঝুমার অসুখের কথা অর্ণ কি তোদেরকে বলেনি? জানিনা, অর্ণকে সেদিন ঠিক ঠিক ওই ধরনের আচরণ করতে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল কিনা। সেদিন অর্ণ যখন এখানে আমি তখন তোদের গ্রিল গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই সময়টাতে তোরা যুগলে কোথায় ছিলি জানতে ইচ্ছে করছে। আমার মতো অতি সাধারণ একজন স্কুল শিক্ষকের কি তোদের সঙ্গে লড়াই করা সাজে! আমি চিরকাল আত্মঘাতী লড়াই বিমুখ। তার চেয়ে পরাজয় মেনে নিতে দ্বিধাহীন। তাহলে অশুভ অপরিণামদর্শী লড়াইটা করছিস কার সঙ্গে? মা-কে দুঃখ দিয়ে কেউ কোনদিন সুখশান্তি পেয়েছে এমন একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবি কী? জীবনে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী তারাই যারা মা-বাবার আর্শীবাদ পেয়ে থাকে।

নীলাদ্রি অনেক কিছু ভাবল বটে কিন্তু লিখল না কিছুই। পরদিন গোপনে অভীকের অফিসে গেল। অভীক সেদিন ছুটিতে থাকায় দেখা হল না। অশুভ আশঙ্কায় অর্ণবের স্কুলে গেল কুশল জানতে। অনেকদিন পর জেঠুর সঙ্গে দেখা হতে অর্ণব খুশি হলেও ভয় পেল। খাবারের দোকানে দু'জনে বসতে চাইল না যদি কেউ দেখে ফেলে। ফেরার ব্যস্ততা দেখিয়ে জিগ্যেস করল, তুমি যাবে না কেন আমাদের ফ্ল্যাটে?

আজ একটু অসুবিধা আছে। বিব্রত নীলাদ্রি সত্য গোপন করল।

তাহলে কবে আসবে? অর্ণবের ঠোঁটে নিষ্পাপ প্রশ্ন।

এক্ষুণি বলতে পারছি না। নীলাদ্রি আবার বিব্রত।

অর্ণবের সঙ্গে দেখা হলেই কিছু হাতখরচ দেয়া নীলাদ্রির অভ্যেস। আজ অনেকদিন হল দু'জনে দেখা সাক্ষাৎ নেই। তাই একটু বেশি পরিমাণ টাকাই দিতে গেল। দ্বিধা সঙ্কোচের সঙ্গে মাত্র দশ টাকা নিয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, কিছু মনে করো না। অত টাকা নিয়ে ঘরে ফিরলে ঠিক ধরা পড়ে যাব। মা-র মেজাজ তো জান, বিচ্ছিরি শাসন শুরু করে দেবে। যত রাগ গিয়ে পড়বে আমার ওপরে। বাবার সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার শুরু করবে।

তোরা যাস না কেন ওবাড়িতে? ওবাড়ির ওপর তোদেরও তো অধিকার আছে।

কেমন করে যাব! যে বাড়িতে মা-র যথেষ্ট সম্মান নেই। শুধুই অনাদর অপমান সেখানে মা যাবে কেন। মা না গেলে বাবা আমি যেতে পারি? তাই বলে তুমি যেন আসা বন্ধ করো না। তাহলে মা খুউব দুঃখ পাবে।

কেন? নীলাদ্রির চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

মা তোমাকে খুবই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। সবতাতেই বলে ওবাড়ির একটি মানুষেরই সত্যিকার হৃদয়মন আছে, সেটি তোমার।

অভী আর তুইও তাই মনে করিস নাকি? নীলাদ্রি কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ঠিক তা মনে না করলেও প্রতিবাদ করি না। তাহলেই অশান্তি বাড়বে। অর্ণবের সরল স্বীকারোক্তি।

অর্ণবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিন রাত্রি ভাল ঘুমোতে পারল না নীলাদ্রি। ঝুমা সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে আবার একদিন অভীকের অফিসে গেল।

অভীক এতক্ষণ জরুরি মিটিং-এ ব্যস্ত ছিল, ঠিক পাঁচটায় ভিজিটর্স রুমে এলো। প্রসাধন করা হাসি মুখে বলল, শুনলাম এর আগেও একদিন এসে ফিরে গিয়েছিস।

হ্যাঁ। তোদের সকলের খবর ভাল তো?

হ্যাঁ। মা কেমন আছে? ঝুমুসোনা? বউদি শুভ্র সকলে ভাল তো?

সকলেই এখন ভাল আছে।

শুভ্রর চাকরির কিছু হল?

না।

পার্টিবাজি করলে ওরকমই ফল হবে। ওর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। মীনু কি রকম করে জানতে পেরে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে। জানিনা কবে নাকি শুভ্র ওর বউদিকে আলফাল কথা বলেছিল। সেই থেকে ওর ওপর বেজায় চটে আছে। থাক সেসব কথা। জন্মদিনে এসে তোকে ওভাবে ফিরে

যেতে হয়েছিল সেজন্য খুব খারাপ লেগেছিল। আসলে সেদিন মীনুর বাবার হঠাৎ অসুখের খবর পেয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।

বানানো অজুহাত মনে হলো নীলাদ্রির। কেননা অর্ণব সেদিন ওর দিদার অসুখের কথাই বলে এসেছিল। আগের মতো বন্ধু সম্পর্কথাকলে নির্ঘাৎ ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলত, কেন খামোকা মিথ্যে বলছিস অভী। আজ আর সেই মন নেই নীলাদ্রির।

চা খাবি? অভীক যথেষ্ট আন্তরিক হলো।

না।

দীর্ঘদিন যাবত নীলাদ্রির ঘড়িটা অভীকের হাতে। এই ঘড়িটা ওর খুব পছন্দ। ছোটবেলা থেকেই বিয়ের আগ পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই পোশাক পরত দু'জনে। এখন শুধু এই ঘড়িটা নিয়ে থাকে। স্কুল থেকে পাওয়া অনেক স্মৃতির প্রিয় উপহার এই ঘড়িটা অন্তত অভীককে পরতে দিতে কোন দ্বিধা থাকে না নীলাদ্রির। হঠাৎই আজ ঘড়িটা কব্জি থেকে খুলে ফিরিয়ে দিল অভীক।

আর কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার আছে? সহজভাবে গ্রহণ করে জানতে চাইল নীলাদ্রি।

না। এক চিলতে বিষণ্ণ হেসে বলল, বস্তুই শুধু ফেরানো যায়। আর সব ফেরাব কেমন করে।

একটা সিগারেট চাইল অভীক। দু'জনেই সিগারেট ধরালো। একরাশ ধোঁয়া অন্তর্লীন বিষণ্ণতায় কিছুক্ষণ যমজ দু'জনে নির্বাক বসে রইল।

এখান থেকে কোথায় যাবি? জমাট নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে অভীক জানতে চাইল।

সোজা ঘরে ফিরে যাব। তুই?

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বেরুব। ঘরে ফিরে ফ্রেস হয়ে একটা পার্টিতে যেতে হবে।

অর্থাৎ এখন নীলাদ্রিকে চলে যেতে বলছে অভীক।

দু'জনেরই মুখের আদলে একই ভাবান্তর সুস্পষ্ট। চার চোখ বিমর্ষ।

ম্লান হেসে অভীক বলল, আমরাতো অভিন্ন জন্ম থেকেই। মুখে না বললেও বুঝতে পারি কি চাস্ তুই। বাট আই এ্যাম হেলপ্‌লেস। হোপলেস অলসো। মীনুকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করেছি। আমি ফেড আপ। আমার আর কিছু করার নেই।

তাতো বটেই। অভীকের হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হয়ে নীলাদ্রি বলল, তোর আমার সাধ্য কতটুকু! তবু আমরা যে যমজ। সেদিন এসেছিলাম। আজ এলাম। সময় সুযোগ পেলে আবার কোনদিন আসব।

আমিও তোর স্কুলে যেতাম, কিন্তু—অভীকের কণ্ঠস্বরে নবমী নিশির বিষণ্ণতা, তোর স্কুলটা যে বেহালার বাড়ি পেরিয়ে ঠাকুরপুকুরে।

সোনালি সিদ্ধান্ত

অখিলেশ সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, মনে করো তোমরা টি ভি-র পর্দায় কোনও সিরিয়াল দেখছ। শুরুতে বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার একটি ঝলমল হলঘরের দৃশ্য। দেওয়াল ঘড়িতে সময় ঠিক পাঁচটা। দপ্তর প্রায় ফাঁকা। ইতস্তত কয়েকটি টেবিলে এখনও কিছু কর্মী কাজ সারতে ব্যস্ত। ওদেরই একজনের বয়স পঞ্চাশ-ঊর্ধ্ব হবে।সেই বয়স্ক কর্মীটি কলমের শেষ আঁচড় কেটে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ওড়ালেন। দ্রুত ফাইলপত্র গোছালেন। নিজস্ব ড্রয়ার থেকে পলিথিন মোড়কে মোড়া ভাঁজ করা বাজারের থলেটা নিলেন। সবশেষে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবেন এমন সময় অপ্রত্যাশিত ফের দু'খানা ফাইল এসে হাজির হল। বাহক পিয়নটি বলল, বড় সাহেব আর্জেন্ট পাঠালেন। কাল কোর্ট-কেসে লাগবে। আজই রেডি করে রেখে যেতে বলেছেন।
ক্লোজ আপে কর্মীটির চোখ মুখে হতাশা বিষণ্ণতা চাপা ক্ষোভ প্রকটিত। তবু নিরুপায় বলে অযথা সময় নষ্ট করলেন না। অসময়ে আচমকা আগত গুরু দায়িত্বের বোঝা কাঁধ থেকে নামাতে উৎযোগী হলেন।
পরের দৃশ্যে বি বা দী বাগের ছুটন্ত জনারণ্য। যানবাহনের ধোঁয়া শব্দ দাপাদাপি। বিশাল বিশাল ঐতিহাসিক প্রাসাদ বাড়ি। মহাকরণ, জি পি ও, পুলিস হেড কোয়ার্টার্স। আধুনিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, টেলিফোন ভবন, বিদ্যুৎ আলোকিত সুসজ্জিত শো-রুম ইত্যাদি। চার্চের ঘড়িতে সময় সাড়ে ছ'টা।
বাস টার্মিনালের লম্বা লাইনে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত কর্মীটি এখন উৎগ্রীব প্রতীক্ষারত। ঘন ঘন কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হতাশ উৎকণ্ঠিত। অগত্যা লাইন ছেড়ে পায়ে পায়ে টিবোর্ড জংশনে এলেন। উদ্দেশ্য, বাবুঘাট থেকে আগত বাস ধরে শিয়ালদহ যাবেন। গেটে কলার কাঁদির মতো ঝুলন্ত যাত্রীদের ফাঁক ফোকর দিয়ে বাসে উঠতে বেশ কয়েকবার চেষ্টা চালালেন। প্রতিবার ব্যর্থ হলেন। অনেকটা সময় কেটে গেল। অগত্যা পায়ে হাঁটা যাত্রা শুরু করলেন।
চলতি পথের দৃশ্যে যানবাহন জনস্রোত। জ্যামজট। হকারদের পসরা-প্রতিবন্ধকতা। স্টেশন সুমুখে বাজার বিকিকিনি হকার কুলি। একাধিক রাজনৈতিক সভা। ইসকনের প্রচার। শব্দ দূষণ বায়ু দূষণ পরিবেশ দূষণের সম্মিলন।
এইসব প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে সেই কর্মীটি ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে ছুটতে টুকটাক বাজার করলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একভাঁড় চা পান করলেন। সবশেষে রুখুসুখু চুল আর ঘাম জবজবে পোশাকে প্লাটফর্মে পৌঁছালেন। ক্লোজআপ চোখ মুখে টেনশান সুস্পষ্ট।
দৃশ্যান্তরে চলন্ত ট্রেনের বস্তা-ভিড় ঠাসা যাত্রীদের একটি কামরা। মিটিং মিছিল ফেরতা ঝাণ্ডাঅলাদের দাপট। ফুটবল মাঠ-ফেরতা বড় ক্লাবের সমর্থকদের কচকচানি। হকার ভেণ্ডার গান-ফেরিঅলাদের গুঁতোগুঁতি। সেই কর্মীটিকে দেখা যায়, কোনওরকমে দরজার মুখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিটি স্টেশনে যাত্রী ওঠানামায় ওঁর নাকাল নাজেহাল বিপন্ন অবস্থার খণ্ডচিত্র পর্যায়ক্রমে প্রদর্শিত হল।
পরের দৃশ্যে নৈহাটি রেল স্টেশন। সেই কর্মীটি বিধ্বস্ত অবস্থায় নামলেন। ক্লান্ত অবসন্ন গতিতে ওভারব্রিজ পার হলেন। স্টেশনের বাইরে এসে ফের একটি ভিড়ভাট্টার প্রাইভেট বাসে চড়লেন। নির্দিষ্ট স্টপে বাস থেকে নেমে রিকশায় উঠলেন। সবশেষে চৌধুরীপাড়ায় নিজ আবাসে পৌঁছলেন। বেহাল রাস্তার দরুণ ওঁর কোমরে এখন প্রচণ্ড ব্যথা। রণক্লান্ত সৈনিকের মতো ঘড়িতে সময় দেখলেন, ন'টা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি। একমাত্র পুত্রটি এখনও ঘরে ফেরেনি। স্ত্রীও

অনুপস্থিত। টেপ ডেকে উৎকট চটুল হিন্দি ফিল্মি গান বাজছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরিশ্রম অন্তে আশু বিনোদনের জন্য সম্ভবত একমাত্র কন্যা সন্তানটি এসব ক্যাসেট কারও কাছ থেকে যোগাড় করে এনেছে। অপর দুই সদস্যা নব্বই-উত্তীর্ণা মা আর সর্বক্ষণের পরিচারিকা এখন টি ভি দেখতে ব্যস্ত।
বাড়ির চারিদিক খোলামেলা সুবাদে হিমেল হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়ছে। তবু তিনি বাজারের থলে রেখে দ্রুততম গতিতে বিদ্যুৎ-পাখা চালালেন। ফ্রিজ থেকে বোতল নিয়ে ঠাণ্ডা জল পান করলেন। তারপর অপরিচ্ছন্ন পোশাকেই সোফায় গা এলিয়ে একের পর এক সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে চললেন। নিজেকে ওঁর অবহেলিত অনাদৃত উপেক্ষিত মনে হল। বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতায় টুকরো টুকরো ক্ষোভ অভিমান দানাবেঁধে জমাট হল।
দীর্ঘক্ষণ পর টেপ ডেক নীরব হল। তৃপ্ত উচ্ছল কন্যাটি জানতে চাইল, তুমি কী চা খাবে বাবা? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এক মুঠো দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে দু'হাতের মুঠিতে থুতুনি রাখলেন।
টি ভি সিরিয়াল শেষ হতে পরিচারিকাটি সুমুখে এল। সৌজন্যসুলভ জিগ্যেস করল, আপনাকে কী ডিমের ওমলেট করে দেব?
তিনি এবারও জবাব দিলেন না। দু'হাতের অঞ্জলিতে চোখমুখ ঢাকলেন।
বৃদ্ধা মা নিরুত্তাপ প্রশ্ন জুড়লেন, এসে অব্দি কথা কইছিস না। কি হয়েছে তোর? তেমনি নির্বাক তিনি নিস্তেজ তাকালেন।
বাড়ি ফিরে এসে অবাক পুত্র নিরুদ্বেগ কৌতূহলী হল, এভাবে বসে আছো কেন?
নিরুত্তর তিনি ফের একটি সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ওড়ালেন।
সবশেষে স্ত্রী ফিরলেন। সর্বপ্রথম বাথরুম ফিরে এসে থলের বাজার গোছালেন। তারপর পোশাক পাল্টালেন। এবার কাছে এসে বললেন, এখনও ড্রেস চেঞ্জ করোনি দেখছি! কখন ফিরেছ? খেয়েছ কিছু?
অখিলেশ এবার সোজাসুজি সুচেতার দিকে তাকালেন। বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে বললেন, সবাইকে ডেকে এনে কাছে বসিয়েছি কেন জান?
সম্ভবত সকলে চাপা উত্তেজনা উৎকণ্ঠা উদ্বেগ বুকে নির্বাক। সকলেরই মনের কোণে অনুচ্চ প্রশ্ন, কি বলতে চান অখিলেশ?
অখিলেশ জানতেন, কারও মুখ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যাবে না। তবু, স্বল্প সময়-সুযোগ দিলেন। তারপর আবেগতাড়িত কাঁপা কণ্ঠে বললেন, ইদানীং যুদ্ধ ক্লান্ত ঘরে ফিরে হুবহু এরকম না হলেও অনাদর উপেক্ষা অবহেলা আমার দুঃসহ লাগে। এতক্ষণ যে বর্ণনা দিলাম সেতো আমার জীবনের আজকের ঘটনা। টিভি-পর্দায় সত্যি এমনটি দেখলে নিশ্চিত সমবেদনায় তোমাদের সবার হৃদয় ব্যাকুল বিষণ্ণ হয়ে উঠত। অথচ বাস্তবে আমার জন্য?
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো আরাম বোধ হলেও কেউই মুখে রা করল না। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল মাত্র।
হিমশীতল জমাট নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে অখিলেশ ফের বললেন, পর্দার ছবিতে আমোদ প্রমোদ বিনোদন ছাড়াও অনেক কিছু শিক্ষণীয় থাকে। কিন্তু সাধারণ দর্শকেরা সেইসব শিক্ষা নিতে জানে না।
আমি নাহয় সিনেমা দেখতে যাওয়ার সময় কাউকে কোন দায়িত্ব দিয়ে যাইনি। সুচেতা আত্মপক্ষ সমর্থনে মুখ খুললেন, তাই বলে কার কি করণীয় সেটা কারও মগজে এল না!
আমি কিন্তু জিগ্যেস করেছিলাম, চা খাবে কি না। ত্রুটি মানতে নারাজ স্বাতী বলল।

আমি ডিমের ওমলেট তৈরি করে দিতে চেয়েছিলাম। রেণু নিজেকে অপরাধ মুক্ত বোঝাতে চাইল। কিন্তু সেসব আমি ঘরে ফেরার কতক্ষণ পর? অখিলেশ আদালত কক্ষের মতো নাটকীয় ভূমিকায় প্রশ্ন রাখলেন। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, তুই তো ভালো করেই জানিস স্বাতী, ঠিক কি ধরনের গান আমার প্রিয় পছন্দ। গ্রামোফোন ডিকস্ থেকে হালের ক্যাসেট সিডি যুগ অব্দি সেসব গানের কালেকশান আমার কম না। লোকে বলে পরিবেশ নাকি মানুষের রুচি গড়তে সাহায্য করে। অথচ, জন্ম ইস্তক যে বিদঘুটে গানগুলি তুই কোনওদিন আমাকে বাজাতে শুনিসনি সেগুলি তোর পছন্দের হল কেমন করে? আমার কষ্ট হতে পারে ভেবে অন্তত আমি ফেরার পর ওগুলি বাজানো বন্ধ করা উচিত ছিল।
বটেই তো। প্রীতিলতা ফোকলা দাঁতে বললেন, ওগুলি আবার গান নাকি। কান ঝালাপালা মাথা ধরে যায়। অসহ্য লাগে।
তুমি আর বলো না ঠাম্মা। সুযোগ বুঝে আকাশ উচিত কথা শোনাল, কোন প্রোগ্রামটা ছাড় দাও তুমি? সুপারহিট মুকাবিলা পর্যন্ত বাদ যায় না।
সব কিছু কী আর ভালবেসে দেখি নাকি। প্রীতিলতা যুক্তি দেখালেন, সময় কাটে না তাই-
থাক মা। অখিলেশ বাকি কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি এখনও বেঁচে থাকায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয় ঠিকই। কিন্তু যখন দেখি, ফিরতে বেশি রাত হলে তুমি আর আগেকার মতো চিন্তায় জেগে থাক না তখন ভীষণ কষ্ট হয়। এই যেমন আজ দেখলাম, ঘরে ফিরে কি খেলাম কিংবা আদৌ কিছু খেলাম কিনা তা ভ্রূক্ষেপও করলে না। আজকাল আমার অসুখ করলে তোমাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখি না। তুমি ঠিক নিয়ম মতো টি ভি দেখে যাও। তোমাকে তো কোনওরকম অনাদরে রাখিনি মা। তাহলে এই সন্তানটির ওপর থেকে তোমার দয়া মায়া মমতা হারিয়ে যাচ্ছে কেন?
রেণুটাও হয়েছে যেমন ।প্রিয় প্রীতিলতাকে আক্রমণ থেকে বাঁচাতে আকাশ প্রসঙ্গ পাল্টাল, সুযোগ থাকলে ও চব্বিশ ঘন্টা টি ভি দেখত। ঘুম খাওয়া চান করা দরকার হত না।
আকাশ আরও কিসব বলতে যাচ্ছিল অখিলেশ থামালেন, তুই অন্যের দোষ ধরছিস কোন মুখে? পারলে তুইও তো চব্বিশ ঘন্টা আড্ডা দিতিস। হয়ত যুক্তি দেখাবি, নেই কাজ তো খই ভাজ। আরে কাজের কি অভাব নাকি। সংসারের রেশন বাজার মুদি কেন এই বুড়ো মানুষটাকেই করতে হয়? ফুল সব্জির বাগান দেখভাল করতে হয় একা এই আমাকেই। গ্র্যাজুয়েট হয়েও তুই বেকার কেন জানিস? আসলে, কাজ করার স্পৃহা নেই তোর মতো একালের ছেলেদের। তোরা সব কিছু বাপের কাছ থেকে আশা করিস। গাড়ি বাড়ি সিক্যুইরিটি চাকরি- সব কিছু। এমনকি দৈনন্দিন জীবনে বিলাসদ্রব্যগুলি পর্যন্ত। যেগুলি বাপের কাছ থেকে জোটে না বিয়ের সময় শ্বশুরের কাছ থেকে নিতে চাস। সারাজীবন নিজের কি কিছুই করার বাকি থাকবে না?
আকাশ চুপসে গেল । সুচেতা ভয় পেলেন। এখনকার ছেলেমেয়েদের মন অন্যরকম। বলা তো যায় না, কোন কথা কেমন ভাবে নেবে। তাই তিক্ততা এড়াতে বিরক্তি দেখালেন, কথা শেষ হয়েছে তোমার? অনেক রাত হল।
পালাতে নাকি ছেলেকে বাঁচাতে চাইছো? অখিলেশ বিষণ্ণ হাসলেন, ঠেকে শিখে আজও আমি চালাকি করতে জানলাম না। চিরটাকাল বোকা থেকে গেলাম বলেই বোধহয় প্রতিদিন এখনও নানা স্বপ্ন দেখে ঘরে ফিরি।
চালাক হলে কি করতে শুনি? সুচেতার কণ্ঠে ঝাঁজ ফুটে ওঠে।
কলকাতায় কোন মেসে থাকতাম । অখিলেশ সহকর্মী বিনয় তালুকদারের প্রসঙ্গ টেনে বললেন, ওর মতো সারা সপ্তাহ চুটিয়ে আনন্দফুর্তি করতাম। সপ্তাহে একবার মফস্বলের বাড়িতে আসতাম।

প্রতিদিনকার শারীরিক কষ্ট থেকে রেহাই পেতাম। উইক এন্ডে কাছে পেয়ে বাড়ির সকলে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করত। কেউই কোনওরকম কষ্ট দিত না। সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকত।
এমন করে কেন বলছ বাবা! অবাক স্বাতী দুর্বল হয়ে পড়ল।
বলছি, এ বাড়ির হালচাল দেখে। অখিলেশ যেন থামতে জানেন না। লাগামছুট্ বললেন, কোন প্রত্যাশায় কিসের আকর্ষণে রোজ আমার বাড়ি ফেরা বলতে পারিস মা? উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আকাশের দিকে মুখ ফেরালেন, তুই তো শুধুমাত্র খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় বাইরে কাটাস। কিন্তু রাত্রে বাড়ি ফিরিস কেন? নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আরামে ঘুমোবার জন্য। আমার যে ঠিকঠাক ঘুম পর্যন্ত হয় না। হাজার চিন্তায় ঘুম আসতে চায় না।
উত্তেজনায় অখিলেশ হঠাৎ-ই উঠে দাঁড়ালেন। সুচেতাকে বললেন, আমি জলদি ফ্রেস হয়ে নিচ্ছি। তুমি খাবার রেডি কর। আজ সবাই একসঙ্গে বসে খাব। বাকি আরও কিছু কথা তখন বলব। এবার প্রীতিলতার দিকে তাকালেন, তুমিও থাকবে মা।
উত্তরাধিকার সূত্রে ভোজন রসিক অখিলেশের অভিমত, আহার বলতে যা বোঝায় তা শুধু ছুটির দিনে সম্ভব। বাকি দিনগুলিতে তাড়াহুড়োয় কেবল গেলা হয়। হলে কি হবে, ইদানীং ওর প্রিয় পছন্দের রান্নাগুলি হয়না বললেই চলে। অন্যান্যদের পছন্দের খাবারগুলিই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উপরন্তু মানসিক দিক থেকে ঠিকঠাক না থাকায় রাতের খাবার খেতে বিন্দুমাত্র ভাল লাগল না। আশ্চর্যরকম গম্ভীর থেকে এক সময়ে বকেয়া বক্তব্য শুরু করলেন, ঠাকুর্দার আমলের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পনেরোতে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবার মৃত্যুর পর আমি অভিভাবকের গুরু দায়িত্ব নিয়েছিলাম। ভাইদের কাছ থেকে তেমন কোনও সাহায্য সহযোগিতাই আমি পাইনি। ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার বউদের নিয়ে মানিয়ে চলতে কখনও অসহিষ্ণু হইনি। নানা সমস্যা থাকলেও হতাশ ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। তবু ওরা কেউই আমার ত্যাগ সহনশীলতার যথার্থ মূল্য দেয়নি। ওরা একের পর এক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আলাদা ঘরসংসার গড়েছে। পনেরো থেকে এখন রেণুকে নিয়ে আমরা সাকুল্যে ছ'জন। সকলে একই খাবার খাই। মাছ মাংসের পরিমাণে পর্যন্ত তারতম্য থাকে না। অথচ, আমরা সবাই যেন একই জলাশয়ে বিচ্ছিন্ন এক একটি দ্বীপের মতো। সেজন্য কারও মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় কিনা জানি না। আমি কিন্তু ভয়ানক নিঃসঙ্গ বোধ করি। অনেক সময় দারুণ হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পরি। দুঃসহ মানসিক কষ্ট পেয়ে থাকি। আমার এই অসুস্থতা থেকে স্বাভবিক জীবনে ফিরতে হলে বাড়ির সকলের আন্তরিক সহযোগিতা দরকার। তা নাহলে হঠাৎ কোনও বিপর্যয় অথবা অঘটন দেখতে হতেও পারে।
আবেগ-আপ্লুত অখিলেশের আকুতির প্রতিক্রিয়া হল আরও বেদনাদায়ক। পরদিন ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরে দেখলেন, টি ভি টেপ-ডেক নিশ্চুপ। আধশোয়া প্রীতিলতা কোনও একটি বইয়ের পাতার পর পাতা উলটে যাচ্ছেন। কিছুই পড়ছেন না। স্বাতী অসময়ে বিছানায় শুয়ে আছে। চোখের পাতা বন্ধ হলেও ঘুমচ্ছে না। অন্ধকার ঝুল বারান্দায় বসে আকাশ উদাস মনে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। রেণু বাড়িতে নেই। মাত্রাতিরিক্ত তৎপর সুচেতা অখিলেশকে পোশাক পাল্টে পরিচ্ছন্ন হওয়ার সময় সুযোগটুকু দিলেন না। চট জলদি চা জলখাবার এনে টেবিলে রাখলেন। মেঘলা মুখে রা কাড়লেন না। সৌজন্যসুলভ অল্প দূরত্বের চেয়ারে বসলেন।
রেণুকে দেখছি না তো। অখিলেশ এক সময় নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে স্বগতোক্তি করলেন।
পাশের চৌধুরী বাড়িতে টি ভি দেখতে গেছে। সুচেতা শূন্যে জবাব ছাড়লেন।

কেন? কারণ জেনে বুঝেও অখিলেশ প্রশ্ন জুড়লেন, আমাদের টি ভি কী ফের বিগড়েছে?
না। মা চালাতে বারণ করেছেন, তাই-
তোমার পারমিশান নিয়ে গেছে?
হ্যাঁ।
তুমি যেতে দিলে! অখিলেশ আশঙ্কিত হলেন, ওদের কৌতূহলী প্রশ্নে রেণু যদি সত্যিকার ঘটনাটা বলে দেয় তো আমাদের সম্পর্কে ওদের ধারণাটা কেমন হবে তা ভাবলে না একবার।
রেণুর দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে। সুচেতা ঈষৎ রুক্ষ মেজাজে যুক্তি দেখালেন, ভাল ঘরের মেয়ে হয়েও নেহাত অভাবের তাড়নায় অপরের বাড়িতে ছোট কাজ করছে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। এনটারটেনমেন্ট বলতে দিনের শেষে ওই টি ভি দেখা। সামান্য এই আনন্দটুকু থেকে খামোকা ওকে বঞ্চিত করতে যাব কেন?
অখিলেশ যুতসই কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। প্রসঙ্গ পাল্টে জিগ্যেস করলেন, স্বাতীর কী শরীর টরির খারাপ নাকি? অসময়ে ওভাবে শুয়ে আছে!
কিছুই করার নেই তাই শুয়ে আছে। ক্ষুব্ধ সুচেতা আকাশের উপস্থিতি জানালেন, ছেলে কিন্তু আজ একবারও বাড়ির বাইরে যায়নি।
অখিলেশ আশ্চর্যরকম নির্বাক গম্ভীর হয়ে গেলেন। রাতে খাবার টেবিলেও কোন পরিবর্তিত আচরণ করলেন না। সমবেত সকলেরই আহারে অনীহা। ঘরময় মৃতদেহের মতো শীতলতা। অন্তর্লীন বিষণ্নতা। গুমোট নিস্তব্ধতা। মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস। চাপা ক্ষোভ অভিমান।
পরিবারের এতগুলি প্রাণীর প্রাণচাঞ্চল্য হাসি উচ্ছলতা আনন্দ মুখরতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেকে অখিলেশের অপরাধী মনে হল। বিরক্তিকর পরিবেশ থেকে পালিয়ে প্রায় অভুক্ত অবস্থায় চেয়ার ছাড়লেন।
রাতের শয্যায় অখিলেশ দীর্ঘ সময় ছটফটালেন। কিছুতেই ঘুমোতে পারলেন না। মানসিক অস্থিরতায় একাধিকবার জল খেলেন, টয়লেটে গেলেন। বার কয়েক ঝুল বারান্দায় বসে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ালেন। নিঝুম রাতে কিছু সময় ছাদে উঠে উদ্‌ভ্রান্ত পায়চারি করলেন। শান্তি মুক্তির পথ খুঁজে নিতে অজস্র ভাবনা-চিন্তার কাটাকুটি খেললেন। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বিনিদ্র রাত কেটে গেল। ফিকে আলোর ভোরে পাখিরা ডেকে উঠল। সময়ান্তরে চারদিক ফুটফুটে ফর্সা হল। পুবের ঘন গাছ গাছালির ওপর দিয়ে রক্তবলয় সূর্য দেখা দিল। উন্মুক্ত জানলা দিয়ে সোনালি রোদ্দুর এসে অখিলেশের হাত মুখ চোখ চুল দেহ স্পর্শ করল।
অখিলেশ যেন হঠাৎ কোনও সোনার কাঠির ছোঁয়ায় চনমনিয়ে উঠলেন। নিজের হাতের তৈরি চায়ের স্বাদই আলাদা। অনেকদিন পর আহ্লাদিত অখিলেশ গুনগুনালেন। অন্যান্য দিনের মতো প্রভাতিক নানা ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলেন। তারপর যথারীতি নির্দিষ্ট সময়ে অফিসের উদ্দেশে ট্রেন ধরলেন।
আজ আর রণক্লান্ত সৈনিকের মতো ঘরে ফিরবেন না অখিলেশ। যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন কিংবা বনবাসী হওয়ার বাসনাও নেই মনে। অদ্ভুত এক সোনালি আনন্দে বিভোর হয়ে দপ্তরে পৌঁছলেন। সর্বপ্রথম সোনালি হাতছানির স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণপত্রে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করলেন। তারপর সম্ভাব্য প্রাপ্তিযোগের টাকার অংক সুদে আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার হিসেব কষলেন। আগামী দিন মাস বছরগুলিতে সেই সোনালি ভান্ডার থেকে সংসারের কোন খাতে কতটা কিভাবে ব্যয় হবে, সযত্নে তার তালিকা তৈরি করলেন। সেটি সুচেতার নামে ডাকে ফেলার আগে ভাবলেন, এই তাঁর দ্বিতীয় স্বর্ণ-করমর্দন।

উত্তরাধিকার

উঠোনের উনানে চায়ের জল ফুটছে। নিকটে খাটিয়ায় বিরজু বাউরি আধশোয়া। নব্বই ছুঁই ছুঁই বয়স। তেল চিটচিটা কাঁথা ঢাকা নড়বড়া গতর। চোখের কোণে পুঁজের মতো পিঁচুটি। অল্প জল গড়াচ্ছে।
এখন ভোরের ধোঁয়াশা উধাও। দূরের টুগরিকার ডুংরি ফর্সা ধরা দিচ্ছে।
বিরজু রোদ পোহাচ্ছিল। ছেইল্যা ডমরু মারফত ফুলমতিয়া এক গেলাস চা ভেজল।
বহুত দিন হল, বিরজুর বউ বেটা মারা গেছে। ফুলমতিয়া সমরুর জরু। সমরু বিরজুর নাতি।
গরমাগরম চা খেয়ে বিরজু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নড়েচড়ে সিধা হয়ে বসে। ফস্ করে একটা বিড়ি ধরায়। এক মুঠি ধোঁয়া ওড়ায়। কোলিয়ারির দিকে কমজোরি নজর ছোটায়।
লালটালির সাহেব বাংলো আর বাবুদের গোল ছাদের কোয়ার্টার এখন খন্ডহার। হাট ধাওড়া চানক হাসপাতাল শুনশান। মুফতের তেল জল জ্বালানি বিজলী এখন কোথায়?
সেসময় মহুলপাহাড়ি কোলিয়ারি ছিল নুড়ি পাথর জঙ্গলে ভরা। ছিল, সাপকোপ মশার বিষ কামড়ের ডর। কালাজ্বর ম্যালেরিয়া গোদ অন্ডকোষ ফোলা ব্যামোর দাপট। কোলিয়ারির খতরনাক কাজকামে কুলি কামিন মেলা দায়। মালিক ইংরেজ সাহেবরা চর দালাল পুষত। ওরা বিলাসপুর হাজারিবাগ মানভূম চৈ-চম্পা চষে বেড়াত। দেদার টাকা উড়ায়ে গরিব আদমি আমদানি করত। ইস্পাত বুকের জোয়ান মরদ বিরজু একরোজ সেভাবেই পাকড়াও হয়েছিল।
পহেলে, আর দশজনার মতো বিরজুও খোলা জমিতে মোকাম বানিয়েছিল। খড়ের ছাউনি আর চাটাইয়ের বেড়াঅলা ঘর। ঢিলাঢালা সেই ঘরে বর্ষার জল ঝরত। ঝড়ের তোড়ে ছাউনি উড়ত। হামেশা আগ্ লাগত। তো ফের মাটির দেয়াল খোলার চাল বানিয়েছিল বিরজু।
নেংটি পরা তাগড়া জোয়ান বিরজু উদোম গায়ে খাদে নামত। সঙ্গে কেরোসিন ডিব্বার আলো। কাঁধে গাঁইতি ঝোড়া।
কুলি ক্যাম্পে মিলত, বাসি রুটি আর এক মগ চা। দুপোরে একথালি ভাত আর মগ ভর্তি ডাল। রাতে রুটি সবজি। হপ্তায় নগদা তিন রুপিয়া তলব।
কুলি ক্যাম্পে মাদি-সাজা কড়াকুড়িরা লৌন্ডা নাচ দেখাত। কালে মাউনারস হোস্টেল চালু হতে সেই নাচ বাতিল হয়ে গেল। নকলি নাচে বিরজুর মন ভরত না। বাতিল কালে আর দশ জনার মতো রান্ডি বস্তিতেও ছুটত না। সে ছিল আলাগ্ আদমি।
কামিনরা কোমরে ক্যানাড়ি আর নজরদারি বুকে এক ছিট্ কানি পরে খাদে নামত। মাথায় কয়লার বোঝা বইত। টব গাড়ির এক টব ভরলে দু'পয়সা মিলত। সোহাগির এরকম গতর খোয়ানো কাজকাম বিরজুর না পসন্দ্ ছিল।
সোহাগিও ছিল আলাগ আওরত। মাইনিং আর মুনশিবাবুদের সেবায় যেত না। শাদি একটা হয়েছিল বটে। মরদটা ছিল মদ ভাঙ রান্ডি আর কাঠপাত্তির গোলাম। সোহাগির বাপের কিস্তি খেলাপ করেছিল। তাই বেটি ফিরত নিয়েছিল ওর বাপ।
সাজলে সোহাগিকে খুব সুরতি লাগত। ভাদু পরবকালে নজরদারি সেজেছিল সোহাগি। উদোম বুক সাপটে কোমরে গোঁজা ছিল লাল শাড়ির আঁচল। হাতে বালা। কনুই অব্দি চুড়ি। গলায় মোটা ফুলের মালা। চুলের খোপায় কাঠের কাঁকই ফুলমালা। চোখে কাজল। পায়ে চপ্পল।

স্যাঙ্গার কনে সিয়ানা বেশি। সেই সুবাদে বেখাপ্পা দর হাঁকল ওর বাপ। বিরজু আর দোনামনায় যায়নি। কিস্তি পনে শাদি করে ফেলল। জরু গরু বখরি মুরগি নিয়ে ঘর বেঁধেছিল।
দূর খাদের দিকে বিরজু ধিকি ধিকি ধোঁয়া উঠতে দেখে। বুকের গহেরা থেকে এক ঝলক বাতাস বেরিয়ে আসে। আকাশে বখালি উড়ে যায়।
কালে ইংরেজ সাহেবরা পুঁজি নিয়ে আপনা দেশে ভাগল। দিশি মালিকের আমলে কোলিয়ারির খাদের গ্যাসে আগ লাগল। বান ডাকা জল সেঁধানো হল। আগ আর জল—দো তরফা সব্বোনাশ। অফিস গুদাম ডিপো সাইডিং হাজিরাঘর বেবাক লোপাট। ছাদ ধসে খাদন বরবাদ তো কোলিয়ারির জান খতম। মালিক সহাব বাবুরা ভাগলবা। লেকিন আজ ইস্তক বেল বানালির একটা পরিবারও নড়ল না। কোল কোঁড়া বাউড়ি সাঁওতালদের এই ডেরাভান্ডাই যা জিন্দা আছে। পাক্কা পঁচিশ বছর হল গবরমিন্ট গার্ডবাবুরা মোতায়ন আছেন। খুব সুরত ভিজিট বাবুরা গাড়ি হাঁকায়ে কভি কভি আসেন। কোন কাজকামে? সিরিফ্ হুজ্জতি করতে। বিরজু মনে মনে খিস্তি ছোটায়।

এখন যেকোন কোলিয়ারিতে মাস কাবারে কম সে কম দু'হাজার রুপিয়া তলব। হাজার মুফত সুযোগ। পাকা ছাদের ঘর মোকাম। বালবাচ্চা দেখভালের ক্রেজ। জীবন বীমা। মাগনা দাওয়াই-ডাক্টর-ইলাজ। আওরত বিয়োবে তো আগাপিছা ছ'হপ্তার ছুটা। আরও বহুত্ কুছ ফয়দা।
বেনবানালি থেকে অন্য কোলিয়ারির দূরত্ব বহুত্। সেখানে কাজকাম মিলনা সহজ সিধা না। আপনাসে দূর দূর থেকে ঝাঁক ঝাঁক গরিব আদমি আসে। জান পহেচানদের পাত্তা লাগায়। মতলববাজদের লুকাছুপা রুপিয়া গুঁজে দিয়ে নোকরি বাগায়।
এখান থেকে শহর বহুত্ দূর। যানা আনায় এক রোজ বরবাদ। সেখানে কাজকাম জুটলে ডেরা তুলে নিয়ে যাওয়া দরকার। বেনবানালির একজনও এখানকার মাটি থেকে শিকড় তুলতে নারাজ। লেকিন তিন 'পুরুষে' পেট বেড়েছে দেদার। এখানে জঠর জ্বালা মেটানোর একটাই খোলা রাস্তা। ক্ষেতি চাষ আবাদি আর সায়রের মছলি। লেকিন এক তো পাথরে মাটি। ফির ধুলা হি ধুলা। বর্ষা-সময়টুকু ছাড়া রোদে পোড়া খাঁ খাঁ তল্লাট। বাতাসে হু হু হলকা। কালা কালা ধুলা ওড়ে। গাছ গাছালি পাখি আদমি জানোয়ারের গতিক বেহাল।
সমরু ক্ষেতির কাজকাম ছেড়ে বেটাইমে ওয়াপাস আসে। চোখমুখে দিমাক গড়বড়ের ছাপ। কাঁধের কোদাল নামিয়ে থুক ফেলে। পাসিনা মোছে। বিরজুর খাটিয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। বুঢ়ি বাত শোনায়, ফির আজ গবরমিন্ট ভিজিটবাবুরা আওবেন। নাস্তাপানির বন্দোবস্ত করতে হবেক। বিরজু কিছু বলতে চায়। খুক খুক কাশিতে গয়ের উঠে আসে। শ্বাস কষ্টে পড়ে। পাসিনা ঝরে। কাৎকোমরে ঠ্যাং ছড়ায়। ভাঁজ করা হাতের পাতায় মাথা রাখে। ঝিম মারে। সুমুখে ধূসর ছবির ধুলা উড়তে দেখে।
আপনা জনমভূমিতে ছিল রাজপুত ভূমিহার ব্রাহ্মণ জমিদার জোতদারদের জুলুম। ফের হেথা একই জুলুম চালাত কয়লাকুঠির গোমস্তা চাপরাশি বাবু সাহেব ম্যানেজার মালিক। গোমস্তা চাপরাশিরা লাঠি নিয়ে ধাওড়ায় ধাওড়ায় ডর লাগায়ে কাজ আদায় করত। সাহেবরা অখুশতো বউবিটি নিলাম। পাওনা বরবাদ। দশজনার সুমুখে আওরতদের ইজ্জত লুট। ফের খাদনে ফেলে জানে মারত। আর আখুন? পাহারাদার সিপাইয়ের জুলুমতো আছেই। ভিজিটবাবুরা কোন কামে আসেন?

ট্রেকারের চাকায় ধুলা উড়ায়ে গলদঘাম ভিজিটবাবুরা হাজির। সমরু উঠানে ঝাঁকড়া জইড় গাছের নিচে চার পাইয়ায় বসায়। ডেরাভান্ডার টিংটিঙা কিলবিল বাচ্চাদের ভিড় জমে ওঠে। নেংটি পরা উদোম হাড়গিলা জোয়ান মদ্দরা দূরে এসে বসে। বুড়াদের জটলা শুরু হয়। শুকনা বুকের কৌতূহলী ছুড়ি বুড়িরা আড়াল থেকে উঁকি মারে।
এত বেলায় যে বাবুদের চা চলবে না সমরু তা জানত। সেবার তাজা তালরস তাড়ি দেয়া হয়েছিল। পরে বাবুরা ভিজিটে বেরিয়ে কোলিয়ারির গেস্ট হাউসে ঢোকেন। কাঠের গনগনে আঁচের উনানে মেটে হান্ডায় ভাত ফুটতে দেখেন। চাটাইয়ের ওপর খামি মাখা ভাত ছড়ানো ছিল। ঠান্ডা ঝ্যাতলা চাপা দিয়ে ওপরে মজুররা হাঁটছিল। দলাই মালাই চটকাচ্ছিল। ম-ম গন্ধে বাবুদের একজন শুধায়, এসব কি?
আজ্ঞে বুধুয়ার ভাটিখানা। এক সিপাই জবাব দেয়, ইস্ পর ড্রামে গরম পানিতে মিক্চার মিশবে। ব্যাস, হাড়িয়া পচাই তৈয়ার। ভেজতে বলব সাব?
না। আজ থাক। বেআইনি কারবার করছে বুধুয়া। উসকো তলব কর।
বুধুয়া নিজে আসার আগে পর্শিলাকে নজরানা পাঠিয়েছিল। এবার আগেভাগে বাবুদের জন্য ইস্পেশাল পচাই এনে রেখেছে। তা আর দরকারে লাগে না। নিজেরাই দু'পেটি বিয়ার সঙ্গে এনেছেন। সিপাইরা পটাপট ছিপি খুলে দেয়। বাবুরা ঢকঢক গিলতে থাকেন। পেটমোটা ঝুল গোঁফঅলা বাবু একাই তিন বোতল সাবাড় করে দেন। পলকে সকলে চাঙ্গা হয়ে ওঠেন।
নাম কে ওয়াস্তে ভিজিটে যান বাবুরা। এক ঘণ্টায় কাজকাম চুকিয়ে আসেন। দুপোরে এ্যালমনিয়ম ঘটির জলে হাতমুখ ধুয়ে সাফসুফ হন। এনামেলের সানকিতে চাক চাক পেঁয়াজ দেয়া হয়। সঙ্গে ছোলা লংকা নিমক। আলুমটর মোরগা-মাংস আর চাপাটি। টিনের গেলাসে খাবার জল।
বাবুরা ভরপেট্টা খান। ঢেঁকুর তোলেন। ঠোঁটে বিলিতি সিগ্রেট ঝোলান। ভুখা পেটে কালা কুঁদা আদমিরা জুলজুল তাকিয়ে দেখে। ফুলমণির পেটের পুংড়াটার কোমরে ঘুনসি কড়ি। গলায় ঝোলে ধনেশ পাখির হাড়। সে বেটা উদোম আদুল ঘুরে বেড়ায়। জানেনা, কোন বাবু ওর বাপ।
সাঁঝের আগে বাবুরা ফিরে যান। সঙ্গে যায় ক্ষেতির এটা সেটা। পাকা মহুয়া মোরগা আর পচাই। রাতে আড়হাইয়া চাঁদ ওঠে। গাজনের ধামসা বাজে গুম গুম। মরদরা নেশায় চৌর জুয়ায় বিভোর। মেয়েরা একের বগলের ফাঁকে অন্যের হাত পার করে শিকল গাঁথে। রাতভর নাচগান চলবে।
একানে বসে বাসনি থাকমণি পর্শিলা। তিনজনার পেটে বাবুদের কাঁড়রি কঁড়ি নগজল। পাক্কা পঁচিশ বছর চলছে এই কারবার। ভিজিটের নামে বাবুদের হম্বি তম্বি বায়নাক্কা বাহাদুরি। মাগনা কাজকাম আদায়। এটা সেটা হাতানো। ডবগা মেয়েমাগীদের ভোগ। কুছ অখুশ তো নবাবী হুমকি, হটাও সরকারি জমিনসে বেকানুন দখলদারি।
তাজ্জব কানুন! অনপড় বুড়া বিরজুর মগজে আসে না, সত্তর বছরের শিকড় গাড়া এই মাটিতে। অনেকের তিন পুরুষের জন্ম ডেরা। বেনবানালির আস্লি মালিক কারা? হট্তে বলে কোন কানুনে?

সেতু সভ্যতা

গাঁও উজাড় করা লোক জড়ো হয়েছে চড়কতলায়।
শহর থেকে খবরের কাগজের লোক নিয়ে এসেছে গোবিন্দ। এতক্ষণ গাঁও ঘুরিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাময় সম্পদগুলির প্রতি ওদের দৃষ্টি আকর্যণ করা হয়েছে।
চড়কতলায় বটের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে নিতে গোবিন্দ বোঝাচ্ছিল, বন কেটে জনপদ হতে পারে। পাহাড়ের গায়ে ট্যুরিস্ট লজ করা যায়। পাথর কুচি আর চুনের কল বসানো চলে। চাষ আবাদতো আছেই। তাঁত শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব। বনজ সম্পদ থেকে ওযুধের কারখানা করা যায়। সমবায় খামার হতে পারে। শ'মিল ধানকল চিনিকল হাসকিং মেশিন—সবই সম্ভব। আরো কত কী যে করা যায়, তার কী কোন অন্তিম আছে! গোপন খনিজ সম্পদ থাকলেও থাকতে পারে। তার জন্য সরকারি তরফে অনুসন্ধান দরকার।
গাঁওয়ের ক'জন আর শহর দেখেছে?
তিনদিকে নদী। অন্যদিকে দুর্গম বনজঙ্গল পাহাড়। পাহাড়ের গায় মালভূমি উপত্যকায় অশিক্ষিত অনুন্নত বিভিন্ন জাতপাত সম্প্রদায়ের বসতি।
নাম শ্যামলা গাঁও। গাঁও থেকে নদীর দিকে কয়েক ক্রোশ ধান জমি। তারপর ঝোপঝাড় কাঁটালতার অনাবাদী ভূমি। ধু ধু প্রান্তর পেরিয়ে গেলে খরস্রোতা নদী। বর্ষার টইটম্বুর দু'কূল ছাপানো গতি। নদীর ওপারে গড়ে ওঠা নতুন শিল্প শহর। শহরে বিজলী বাতির ঝলকানি। আকাশ ছোঁয়া কারখানা—চিমনির ধোঁয়া। চিমনির মুখ থেকে জ্বলন্ত জিহ্বা চাটে আকাশ। শহরে অনেক উঁচুউঁচু জেল্লাদার পাকা বাড়ি। ময়দানে সার্কাসের তাবু পড়ে। পাকা সড়কে ছোটে হাজার রকমের চেকনাই গাড়ি। উঁচু পেল্লায় বাড়ির গলায় ওড়ে বিরাট বিরাট গ্যাস বেলুন।
এপারে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে অঁজ গাঁওয়ের লোকেরা বোকা চোখে এসব দেখতে পায়। দূর পাল্লার মেলট্রেনের ভারি আওয়াজ শোনে। আরো কত কী যে! এপার থেকে গ্রামীণ মানুযেরা ভাবে, যত সুখ বুঝি ওপারে। এপারে শুধু দুঃখ শোক অন্ধকার।
নদী পেরিয়ে কেউ শহরে লেখাপড়া করতে যায়তো আর গাঁওয়ে ফেরে না। শহরের ভোগ বিলাসেই থেকে যায়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে গাঁও থেকে ভিটেমাটির শিকড় তুলে নেয়। সাগর পারের বিলাস-দেশে পাড়ি দেওয়ার মতো অবস্থা ব্যবস্থা।
ব্যতিক্রম গোবিন্দ। অন্ধকারাচ্ছন্ন বঞ্চিত অবহেলিত গাঁওয়ের দুঃখী অভাবী মানুযজনের হয়ে প্রথম কথা বলেছে সে। শহর থেকে ফিরেই আওয়াজ তুলেছে, আলো চাই বটে। সভ্যতার আলো। গাঁওয়ের মানুযজনকে বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছে, ইখানে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য কিস্যু নাই। তুমরা ঝানো না কত্তো পিছে আছো। দ্যাশডা কত্ত জলদি এগুচ্ছ্যে।

সোব্বতা! কালিন্দী বাগ্দীর ঠোঁটে বিস্ময়ের প্রশ্ন, সিটা আবার কী জিনিস গঁ?
রেগেমেগে ক্ষ্যাপা গোবিন্দর উত্তর, যদি জানসিত্‌তো আন্ধারডা থাকতো কুথা।
কৈশোর বয়সের বাঁশের বাঁশি ফেলে শহর থেকে একটা ট্রানজিস্‌টার এনেছিল গোবিন্দ। শব্দকথা শুনে গাঁওয়ের বাচ্চা বুড়ো মাগী মরদেরা হতবাক। কী যে যাদু আছে ওইটুকুন বাক্সতে!
ক্ষেত খামার চড়কতলা চণ্ডীতলা আর ঝুপড়ি খুপরি বস্তিতে ট্রানজিস্‌টার হাতে গোবিন্দ। সারা দুনিয়াটা বাক্সবন্দী করে সকলকে শোনায়। কঠিন কঠিন কথা বোঝাবার চেষ্টা করে। অর্ধনগ্ন সরল শান্ত মানুযজনের সবুজ মনে প্রথম আগুনের স্পর্শ লাগে সেভাবে।

নির্মেঘ আকাশে ঘন মেঘের সূত্রপাত হল। টুকরো টুকরো মেঘ জমাট বাঁধল। ক্ষোভ যন্ত্রণা বঞ্চনায় জ্বলতে জ্বলতে মানুষগুলো সংগঠিত হল। শেষে একসময় প্রাপ্য অধিকারের দাবিতে অজস্র মুক মুখ দুর্বার মুখর হয়ে উঠেছে।
রিপোর্টারদের সামনে সমবেত মানুষগুলো আকাশ ফাটানো মুহুর্মুহু সোচ্চার শব্দ তুলল, আলো চাই বটে। সোব্বোতার আলো। ল্যায্য পাওনা দিতে হবেক। দিতে হবেক।
বুড়ো মাহাতো মোড়ল যেন সিঁদুরে মেঘ দেখতে পেল। ইস্পাত বুকে ডর লাগল।
রিপোর্টাররা ফিরে যেতে গোবিন্দকে নির্জন একান্তে ডেকে বসালো মাহাতো মোড়ল। শনের মতো একদঙ্গল ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে কী সব ভাবল। তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় গোবিন্দকে বোঝাতে চেষ্টা করল, সাদাসিধা মনিষ্যিগুলাকে এভাবে ক্ষ্যাপাসনি গোবিন্দ। ইতি শ্যামলা গাঁও লাল হয়ে যাবেক।
শহরে কলেজ পড়া ছেলে গোবিন্দ। মাথার ভেতর সুড়সুড় হাঁটছে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্র। অর্থনৈতিক বিপ্লব সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তার অজস্র পোকা কিলবিল করছে।
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জন্মগত অধিকার, শিক্ষা, কৃষক বিদ্রোহ, শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রমিক আন্দোলন—এসবের ইতিহাস গোবিন্দর নখদর্পণে। শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাহাতো মোড়লকে কেতাবি তত্ত্ব তথ্য ইতিহাস বোঝাতে চেয়ে ব্যর্থ হল গোবিন্দ। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলেই ফেলল, তুমার মতলবটা কী মোড়ল? উঁরা কী জেবনভর পায়ের তলায় থাকবেক?
অস্থির পায়চারি করল মাহাতো মোড়ল। তারপর গাছের গুঁড়িতে ধপ করে বসে বিষণ্ণ চোখ চেয়ে তাকাল। সোজাসুজি জানতে চাইল, তু কী চাস্?
ল্যায্য পাওনা। তা উঁদেরকে দিতে হব্বেই। দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিল গোবিন্দ।
নির্বাক বসে রইল মাহাতো মোড়ল। ম্লান চোখ মুখ। মন উদাসী হল।
মাহাতো মোড়লের চোখের সামনে ভাসছে শান্ত সুন্দর শ্যামলা গাঁওয়ের ছবি। বেআব্রু নির্মেঘ আকাশ। দিগন্তব্যাপী সবুজের সমারোহ। পাখ পাখালির শব্দ বিচরণ। পুরুষ্টু মাটির দেয়াল গাঁথা খাপরার চালের ঘরবাড়ি। সমৃণ চিত্রিত দেয়াল। পরিচ্ছন্ন নিকোন উঠোন। হাঁস মুরগি গাইবাঁছুর। ক্ষেতখামার চাষ আবাদ। কাঠ কেটে গরু চরিয়ে মাছ ধরে আর তীর ধনুকে শিকার করে বেঁচে থাকা সুখী জীবন।
কীসের ওভাব উঁদের? দারুণ জ্বলন্ত প্রশ্ন করে বসল মাহাতো মোড়ল।
অভাব-অন্ন কাপড় শিক্ষা স্বাস্থ্যর। গোবিন্দ মেজাজ তুঙ্গে তুলে বলল, মানুষের মতো ইজ্জতও দিতে হবেক।
মাহাতো মোড়ল হকচকিয়ে গেল। গোবিন্দর কথাটাতো ফ্যালনা নয় বটে।
শ্যামলা গাঁওয়ে সুরজ ডুবলেই আন্ধার। বিজলী নাই বটে। না আছে পাকা সড়ক ঘরকুঠি। খবরের কাগজ আসে না। উঁচু ক্লাসের ইস্‌কুলওতো নাই। চিকিচ্ছের ডাক্তারের অভাব। আরো অনেক কিছুরই অভাবতো বটে।
পরক্ষণেই মাহাতো মোড়লের মন অন্য কথাও বলল।
বাজার আছে, হাট বসে। তাঁতী তাঁত বোনে। তেলের ঘানি আছে। আখ মাড়াই হয়। হাঁড়ি সেদ্ধ ধান শুকিয়ে ঢেঁকিতে চাল মেলে। ছই দেয়া বয়েল গাড়ি আছে। আছে মসজিদ, শিবকালীর মন্দির। যখন যেখানে খুশি শ্মশান কবরখানা। চড়কতলায় চৈত্রের গাজন ঝাঁপ চড়ক নীলের পূজা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে নদীর বালিয়াড়িতে মেলা বসে। বাঁশের খুঁটিতে পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বালিয়ে

ছোট্ট ত্রিপলের সামিয়ানায় কেষ্টযাত্রা হয়। হাড়িয়া তাড়ি মহুয়া খেয়ে নাচন কোদন গান চলে। তুকতাক ঝাড়ফুঁক মন্ত্রপাঠ হেকিম বদ্যি আছেতো বটে। চোর ডাকাত ভ্রষ্টাচারী কাজিয়া নাই। ভুল বোঝাবুঝি হয় তো মিটমাট সমাধানের জন্য মাহাতো মোড়ল আছে। আর কী চাই! এসব হাজারো দৃষ্টান্তে মাহাতো মোড়ল বোঝাতে চাইল, গাঁওয়ের মনিষ্যিরা ঠিকই আছে গোবিন্দ। শহুরে বাবু বিবিদের থেকে ঢের সুখী আছে। তবে কেনে তুই শালা লস্টের সাঁকো লাড়াচ্ছিস? লিজেকে মাতব্বর ঠাউরেছিস বড়।
সরাসরি আক্রমণে গোবিন্দ অপ্রস্তুত। বিষ নজর পড়ল মাহাতো মোড়লের ওপর। পাল্টা আক্রমণের জবাব দিল, তুর মতন বুড়ারাও গরিবের শত্রু বটে। মোড়লি চইল্যে যাবার ডর লাগছে? লস্টের মাতব্বর তু বটে।
চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে লাফিয়ে উঠল মাহাতো মোড়ল। হাঁটুর বয়সী ছেলেটার আচরণ মন্তব্যে গা চিড়বিড় জ্বালা সারা শরীরে। দু'চোখে উত্তেজনার আগুন ছুটল। হাত বাড়িয়ে ভারি ওজনের জবাব বসিয়ে দিল গোবিন্দর গালে। অভিমানের সুরে বলল, মুই শত্তুর?
তীব্র উত্তেজনায় ক্লান্ত দুর্বল হয়ে পড়ল মাহাতো মোড়ল। বয়সী শরীরে হিমেল হাওয়ায় নড়া পাতার মতো শির শির কাঁপন ধরল। বুকের গভীর থেকে কাশি উঠে এল। বসে পড়ে দু'হাতের খাপে মাথা রেখে বলল, ভাগ শালা সুমুখ থেক্যে।
এই ঘটনার পর থেকে গোবিন্দর কোন কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াল না মাহাতো মোড়ল। এতকাল যে ছিল গোটা গাঁওয়ের যেকোন সমস্যার সমাধান সে নিজেকে আড়াল করে নিল।
ক'দিন বাদেই খবরের কাগজে গোবিন্দর ফটোসহ শ্যামলা গাঁওয়ের খবর ফলাও করে ছাপা হল। ব্যস্, রাতারাতি যেন মন্ত্রবলে জনসেবক থেকে নেতা হয়ে গেল গোবিন্দ। কৃষক বিদ্রোহ আর শ্রেণীসংগ্রামের লড়াকু নেতা। মুখে বিড়ির বদলে সিগ্রেট। চায়ের বদলে কফি। সাইকেলের বদলে তেলে চলা মপেড। মাহাতো মোড়ল নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ প্রতিক্রিয়াহীন নিশ্চুপ।
আরও কিছু দিন পর শহর থেকে হঠাৎ গোবিন্দর ডাক এলো।
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ওঁর একান্ত নিজস্ব শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল কক্ষে গোবিন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সৌখিন সোফায় বসতে দিয়ে শীতল পানীয় কাজুবাদামে আপ্যায়িত করলেন। তারপর যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বললেন, গ্রামের মানুষকে সচেতন করে তোলা আমাদের পার্টির নীতি ও উদ্দেশ্য। আমরা জানি, দেশের উন্নতির জন্য সবার আগে দরকার গ্রাম উন্নয়ন। এ্যাসেমব্লি থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত আমাদের পার্টির প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ সোচ্চার ও সক্রিয়। এবার বলুন, কিভাবে আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারি।
আমাদের গাঁওয়ে সভ্যতার আলোটা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন স্যার।
বেশতো। সেটা কিভাবে সম্ভব সে সম্পর্কে সাজেশান বা ফর্মুলা আছে কিছু?
নদীর ওপর একটা ব্রীজ বানালেই হবে। ব্যস্ দেখবেন, পাকা সড়ক বিদ্যুৎ আর খবরের কাগজ গিয়ে পৌঁছলেই সভ্যতাও পৌঁছে গেছে।
নাইস আইডিয়া। রিয়েলি এ গুড প্রপোজাল। ঈষৎ নড়েচড়ে বসে একটা সিগারেট ধরালেন মন্ত্রীমহাশয়। তারপর ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন, নদীর ওপর ব্রীজ—সে তো অনেক টাকার ধাক্কা। কেন্দ্রের কাছে আমরা এই দাবিটাও নিশ্চয়ই রাখব।
গাঁওয়ের গোঁয়ার গোবিন্দ শহরে পড়াশুনো করেছে। রাজনীতির ভাওতা মারপ্যাঁচ মোটামুটি বোঝে। তাছাড়া, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসি সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস শ্রদ্ধা দুর্বলতা নেই। সে

রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী। তবু গরিবের স্বার্থে কাজ আদায়ে সে যেকোন আপোসের পক্ষপাতী। বছর না গড়াতে গাঁওয়ে আচমকা খবর পৌঁছাল, নদীর ওপর ব্রীজ হবে। পরিকল্পনাটা রাজনৈতিক কারণে। কিছুটা প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনও বটে।

সুসংবাদটা শুনে শ্যামলা গাঁওয়ের সকলের কী যে আনন্দ! টলটলে জলের মতো খুশি ঝলমল। গোবিন্দকে কাঁধে তুলে নাচনকোদন। আশীর্বাদ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা। সোচ্চার ধ্বনি। মহুয়া হাড়িয়া তাড়ির উৎসব। গান নাচন রাত জাগরণ। বিশ হাতি বুক ফোলা গোবিন্দর সেকী জ্বালাময়ী ভাষণ। ঝাঁকড়া জারুল গাছের নিচে ঝুপড়িতে বসে পচাই গিলছিল মাহাতো মোড়ল। খরগোস শিকার করে ফিরতি পথে বিলাস এসে বলল, রাতে এসো মোড়ল। নেশাটা জমবে ভাল। আজ বড় আনন্দের দিন গঁ।

তুদের এ্যাত খুশি কীসেরা্যা? ফোঁস করে উঠে মাহাতো মোড়ল বলল, শহুরে যাবার ফুর্তিতে? তারপর আপন মনেই বলে গেল, বেইমান, সব শালা বেইমান। গাঁও উজাড় কর‍্যা শহুরে যাবে আর ফিরবেক লাই।

তু বুড়া ভীতু আছিস। মাহাতো মোড়লের চোখের কোণে চিকচিক জলবিন্দু দেখে কালিন্দী ভরসা দিয়ে বলল, এ্যাত ডর কিসের?

ডর হবেক লাই? হাঁটুর কাপড়ে চোখ মুছে মাহাতো মোড়ল শব্দ করে নাক টেনে বলল, তুর মরদটা সি যে শহুরে গেইল—ফিরল ফের? খপর আছে, সিখানে সোন্দর মিয়াছেলে লিয়ে আছে। তুই তো গন্ধ্যা হয়্যা গেছিস।

উঁর কথা ছাড়্ মোড়ল। কালিন্দী উদাসী হলেও ধরা দিতে চাইল না। অন্যভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল, বেবাক মনিষ্যির চরিত্তির কী সমান হয় গঁ।

মাহাতো মোড়লের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। ফেনিয়ে উঠল যত দুঃখ রাগ ক্ষোভ। দৃষ্টান্ত দিয়ে মনের ঝাল ঝাড়ল, কিন্তু জগু মদনা শহীদুল ভৃগু— কোন্ শালা ফিরল র‍্যা। শহুরে পড়ার লেগ্যে ক্লোন হারামি না মুর কাছে টাকা লিছে?

উপ্কার কর‍্যে বলতে নাই মোড়ল। কালিন্দী শান্ত করতে চেষ্টা করল।

বলব নাই কেনে? ক্ষোভের কারণ জানাল মাহাতো মোড়ল, মদনা শালা ডাক্তর বনছে—গাঁওয়ে ডাক্তর লাই। শহীদুল বড় পন্ডিত হল—গাঁওয়ে ভাল মাস্টর লাই। কিষ্ট শালা জানোয়ারের ডাক্তর বনলো তো গাঁওয়ের গরু বখরি ভইস বিমারে মরছে। জগু ভৃগু সরকার বাহাদুরের অফসর্ হল বটে— গাঁওয়ের কিচ্ছু করল? গোবিন্দ ফিরল বটে। উঁ শালা না ফিরলি ভালো ছেল।

ক্ষতিটা কি করছে গোবিন্দ? কালিন্দী না বুঝে বেঁফাস বলে বসল, তু উকে দেখতে লারিস কেনে? শালা খোয়াব দেখতে লাগছে যে, ভোটে দাঁড়াবেক। ক্ষেতির মানুষগুলা ভোট ভোট চিল্লাচ্ছে। কাজ কাম লাই। বিরীজ বনবে, বিরীজ। দেখ্যে লিস কালিন্দী এই শ্যামলা গাঁও জ্বলে যাবেক। প্রলাপ বকার মতো এক নাগাড়ে কথাগুলি বলে যাচ্ছিল মাহাতো মোড়ল। গেলাসের পর গেলাস ভরে পচাই খাচ্ছিল। একসময় কথায় ক্ষান্ত দিয়ে গুম হয়ে বসে রইল। মাথা বুকে যন্ত্রণা অনুভব করল। ঘামে ভিজে উঠল।

বুকে কোষ্ট হচ্ছেরে কালিন্দী। বুকের থল থল মাংসপিণ্ড মুঠোয় ধরে মাহাতো মোড়ল অসহায় আর্তনাদ করে উঠল, বাতাস লিতে কষ্ট হচ্ছেরে কালিন্দী। ভেতরে কাঁটা বিঁধছে হায় হায়।

সাপ খেলা দেখিয়ে ফিরতি পথে নেশার সঙ্গী হয়েছিল ঘনশ্যাম। সে যত্ন করে খোলা আকাশের নিচে চাটাই পেতে মাহাতো মোড়লকে চিৎ করে শুইয়ে দিল।

আরাম পাচ্ছিস? বুকে হাত বোলাতে বোলাতে কালিন্দী বলল, ডর লাই। মুইতো আছি মোড়ল।
ঘনশ্যাম গাঁওয়ের দশজনকে খবর দিতে ছুটল।
পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় এখন চারদিক আলোময়। নির্মেঘ আকাশ। গাছের পাতায় শির শির শব্দ। বাতাসে ভাসছে মহুয়ার গন্ধ। হীরক চিক চিক ঝিলের জল। দূর থেকে ভেসে আসছে মাদোলের শব্দ। অশ্লীল বাখানি। আর ঝর্ণার জলের মতো খল খল হাসি।
শুনশান শ্মশান নিস্তব্ধতা ভেঙে কাচের চুড়ির মতো শব্দ ছড়িয়ে হাসল কালিন্দী। মাহাতো মোড়লের দু'হাতের বেড়িতে বুকে মাথা রেখে বলল, আরাম পাচ্ছিস মোড়ল?
জেবন থাকতে এ বুকে ফের আরাম আসবেক লাই। হাতের বেষ্টনী শিথিল করে দিল মাহাতো মোড়ল। বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে বলল, দেখ্যে লিস কালিন্দী তোর ভাই বুড়া মাহাতো আর বেশিদিন লাই। শহুরে মানুয নাগিনীর বিষে শ্যামলা গাঁওয়ের মরণের আগেই মাহাতো চলে যাবেক।
তারপর থেকে মাহাতো মোড়ল নিপাত্তা। নিরুদ্দেশ নাকি মরে গেছে তা কেউ জানে না। কোনরকম হদিশ না পেয়ে অনেকেরই সন্দেহের বিষ-নজর পড়ল গোবিন্দর ওপর। নানা ঘটনার পর অনেক দেরিতে সকলের ভুল ভাঙল।
গোবিন্দর ধারণাটা কিন্তু অন্যরকম। নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক কু মতলব কাজ করছে পিছনে। হয়তো মাহাতো মোড়লকে গুম করে কোথাও রাখা হয়েছে। ভোটের দিকে নজর রেখেই গোবিন্দকে গাড্ডায় ফেলার চেষ্টা চলছে।
জালে জড়িয়ে পড়তে নারাজ গোবিন্দ। স্বাভাবিক কারণেই নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে নিল। সেইসঙ্গে গোপনে মাহাতো মোড়লের সন্ধান চালিয়ে গেল।

দীর্ঘ আট বছর কেটে গেল। শ্যামলা গাঁওয়ের সঙ্গে শহরের যোগসূত্র গড়তে পুরাদমে ব্যারেজব্রীজ গড়ার কাজ চলছে এখন। অন্য রাজ্যে যাওয়ার সহজ পথ হিসেবে পাহাড়ের ভেতর টানেল হচ্ছে। সেইসঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কাজও চলছে। টাকার পর টাকা উড়ছে শ্যামলা গাঁওয়ে। অফুরন্ত টাকা।
তল্লাট জুড়ে এখন দারুণ তৎপরতা কর্মব্যস্ততা। চলছে নকশা কাটা মাপজোক দেখে কাজ। ধুলো ওড়ানো লরি জিপের দাপাদাপির একশেষ।
শ্যামলা গাঁওয়ে পুলিশ চৌকি চিকিৎসাকেন্দ্র ডাক তার ঘর বসেছে। ফোন বিদ্যুৎ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে। গো-ডাউন হয়েছে বড় বড়। বাবুদের জন্য হয়েছে স্থায়ী অস্থায়ী অনেক কোয়ার্টার্স। পাহাড় নদীর ধারে বসেছে লেবার ক্যাম্প। দোকানপাট ঝুপড়ি হয়েছে। সাহেব মন্ত্রীদের বিশ্রামের জন্য পাহাড়ের টিলায় গড়ে উঠেছে সৌখিন সুন্দর আরামদায়ক ডাকবাংলো। শ্রমিকদের জন্য তাবুর ছাউনি পড়েছে বিস্তর।
জমজমাট সময় এখন বটে। ঘন ঘন আনাগোনা করছে যত ভি আই পি। শুধুই কী অস্থির ব্যস্ততা ছোটাছুটি?
বিরাট.কর্মযজ্ঞে দিবারাত্রি এখন শব্দ আর শব্দ। ক্রাসারে পাথর কুচি হচ্ছে। মেশিনে মাটি কাটছে। লোহালক্কড়ের ঘড় ঘড় শব্দ। ড্রিলিং ব্লাস্টিং চলছে। কংক্রিটের কাজ করছে মিক্সচার মেশিন। ওয়েলডিং-এর আলো ঝিলিক দিচ্ছে। পেনস্টক ক্রেন হুইসল ট্রানস্‌ফরমার স্ক্রুলকেস জেনারেটরের

ছড়াছড়ি। টুং টাং ঘটাং ঘটাং শব্দ। হৈ হট্টগোল চেঁচামেচি। শান্ত ঘুমন্ত আয়েশি শ্যামলা গাঁও এখন অশান্ত বিনিদ্র জাগ্রত।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাবুরা কাজ করতে এসেছে শ্যামলা গাঁওয়ে। একা অথবা সপরিবারে বাস করছে। চাষআবাদের মানুষগুলি জমি ছেড়ে ক্রমশ শ্রমিক হয়ে পড়ছে ব্যারেজব্রীজের কাজে। মেয়েরা হয়েছে কামিন। অনেকেই হারিয়ে বসেছে কৌমার্য অথবা সতীত্ব। ঢালাও মদের কারবার চলছে এখন। রাতে বাবুদের বেলেল্লাপনা নষ্টামি নিয়ে আগে কথা উঠেছিল। এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না। সহজেই মেনে নিয়েছে সকলে।
সমাজসেবক গোবিন্দ কিছু দিনের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হয়েছিল। সেই সুবাদে হয়েছিল বেনামে লেবার কণ্টাক্টরও। শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি। ব্যর্থতায় এখন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে।
ব্যারেজব্রীজ টানেলের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আসতে ভাবনায় পড়ে গেল গোবিন্দ। নানা আশঙ্কায় বিব্রতবোধ করল।
কাজ শেষে শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তা চাই। চাই মজুরি আর মাগ্‌গিভাতা বৃদ্ধি। শুরু হল আন্দোলন। ঘনঘন ঘেরাও কাম বন্ধ্। চলল, ছোটবড় সংঘর্ষও। অশান্তি অরাজকতার চূড়ান্ত। নানা অভিযোগের অভিযুক্ত হল গোবিন্দ। তার মধ্যে তিনটি অভিযোগ গুরুতর। প্রথমটি হল, প্রকল্পের দামি জিনিসপত্র ভাঙচুর লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ। দ্বিতীয়ত, বে-আইনি অস্ত্রশস্ত্র সহ মিছিল সমাবেশ আক্রমণ। অপরটি হল, রক্তক্ষয়ী হত্যার পরিকল্পনা। গোবিন্দর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হতে গাঁও ছেড়ে পালিয়ে সে আত্মগোপন করল।

অনেকদিন পর কোন এক সময় ব্রীজ উদ্বোধনের দিনটি এগিয়ে আসতে সেকি সাজ সাজ রব। দারুণ আনন্দ উন্মাদনা।
অবশেষে প্রত্যাশিত প্রতীক্ষার দিনটি এলো।
নানা রঙের ফুলমালা রঙিন টুনি দিয়ে সাজানো হয়েছে ব্রীজটা। কাগজের চেন নিশান উড়ছে। শহরমুখি ব্রীজের প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে কৃষক দম্পতির মূর্তি। ঝলমলে আবরণের অন্তরালে ফলকে লেখা 'কিষাণ সেতু'। নিচে সন তারিখ সহ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নাম খোদিত যিনি কিনা উন্মোচন উদ্বোধন করবেন।
সকাল থেকেই পার্টির লোক পুলিশ আমলাদের দারুণ তৎপরতা। মাইকে দেশাত্মবোধক গণসঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। মন্ত্রীমহাশয়ের জন্য ডানলোপিলোর গদিঅলা সোফা বসানো হয়েছে। ওপরে নজরকাড়া চাঁদোয়া। বিদ্যুৎ পাখা ঝুলছে। নিচে পাতা রঙিন ঝলমলে দামি কার্পেট। অজস্র ফুল ফুলমালায় সাজানো ছোট্ট মঞ্চটি।
সামনে তেরঙা পতাকা উড়িয়ে যথাসময়ে বিলাসবহুল গাড়িতে মন্ত্রীমহাশয় এলেন। সামনে কনভয়। পেছনে সারিবদ্ধ অনেক গাড়ি। মন্ত্রীমহাশয়ের চোখে কালো চশমা। মুখে চুরুট। টি ভি রেডিও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। আলো ছড়িয়ে ক্লিক ক্লিক ফটো উঠল অজস্র। ভারি চেহারার নাদুস নুদুস মন্ত্রীমহাশয় খুশিতে ডগমগ।
ছোট্ট কেতাবি ভাষণ দেওয়ার পর ফলকের আবরণ উন্মোচন হল। ফিতে কেটে উদ্বোধন হল 'কিষাণ সেতু'। কনভয়ের শব্দ তুলে সাঙ্গপাঙ্গসহ একাধিক গাড়ি নিয়ে সেতু পার হলেন মন্ত্রী মহাশয়। তারপর ধোঁয়া ধুলো উড়িয়ে টিলার ওপর ডাকবাংলোর দিকে উধাও হয়ে গেলেন।

ব্রীজ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে নদীর বালুচরে মেলা বসেছে আজ। হেঁটে অথবা বয়েল গাড়িতে মানুষজন আসছেতো আসছেই। মেয়েদের চুলে গোঁজা ফুল কাঠের কাঁকই। কারও কারও বা পিঠে কাপড়ে বাঁধা বাচ্চা ছেলেমেয়ে। পুরুষেরা বাজাচ্ছে বাঁশের বাঁশি ধামসা নালকাঁড়া। হাড়িয়া মহুয়া পচাই খেয়ে মাদলের বাজনার সঙ্গে চলছে নাচ আর গান। বাতাসে ভাসছে পাকা মহুয়ার সুবাস।
বালিয়াড়িতে ছড়ানো ছিটানো অজস্র রৌদ্রকুচি। নদীতে ভাসছে ছই-নৌকা। চারদিক ঘুরে ফিরে গাছের ছায়ায় এসে বসল শীর্ণদেহের উদ্‌ভ্রান্ত একটি লোক। লোকটির মাথায় দীর্ঘদিনের অপরিচ্ছন্ন চুল। মুখে একদঙ্গল গোঁফদাড়ি। পরনে মলিন পোশাক। ভবঘুরে লোকটিকে ক'দিন হল শ্যামলা গাঁওয়ে দেখা যাচ্ছে। চারদিকে উৎসবের মেজাজ আনন্দের ভাগ বসাতে বাইরের কত লোকজনই তো এসেছে। কে কার খবর রাখে?
গোবিন্দকে এখন পর্যন্ত কেউই চিনতে পারেনি। সেজন্য ওর দুঃখ নেই। বুকের ভেতর দুঃখটা অন্যকারণে।
ভীষণভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে শ্যামলা গাঁও। পলাশ শাল সাকুয়ার ঘন জঙ্গল সাফসুফ। গড়ে উঠেছে জনপদ। কেঁদপাতা বনমোরগ বনশিয়াল বনঝিঁঝি কোথায়? কোথায় গেল রক্তপলাশ বন? শূন্যবুকে উদাসী চোখ চেয়ে তাকিয়ে আছে চাষ আবাদের মাঠ।
ছোট্ট শহর গড়ে উঠেছে এখন। বাজার দোকানপাটে শহুরে বিলাসদ্রব্যের ছড়াছড়ি। মাদ্রাস কাফে পাঞ্জাবি হোটেল হয়েছে। ফুচকা আলুকাবলি ভেলপুরি আর মদের দোকানে উপচে পড়া ভিড়। ছোট খাটো সিনেমা হল হয়েছে একটা। দেয়াল জুড়ে অর্ধনগ্ন নারীর সিনেমা পোস্টার। ভি ডি ও হলও হয়েছে কয়েকটা। তাতে নাকি ব্লু ফিল্মও দেখানো হয়। ক্যাসেটে উগ্র ফিল্ম-গান বাজছে যত্রতত্র। জাঁকিয়ে বসেছে চুরি ছিনতাই স্মাগলিং আর দেহবিক্রি।
শ্যামলা গাঁওয়ের মানুষে মানুষে এখন হিংসা মিথ্যাচার প্রতারণা অবিশ্বাস। কুটিল রাজনীতির দলাদলি। একাধিক শত্রুশিবির। দৌরাত্ম্য তাদেরই বেশি যারা সমাজবিরোধী অসামাজিক। হারিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় মন সুস্থ চেতনা মানবিক মূল্যবোধ।
দূরে ব্রীজের দিকে বিষণ্ণ চোখ চেয়ে তাকালো গোবিন্দ। বুকের ভেতর অব্যক্ত যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল।
বুক ভরে সোঁদা মাটি বুনো পাতার গন্ধ নিতে ইচ্ছে হল গোবিন্দর। মন চাইল, লাল কাঁকুরে মাটির ধুলো মেখে দৌড়তে। সবুজ ক্ষেতের মাঠে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। আঁকাবাঁকা নদীতে নৌকায় চড়তে।
এ রকম হাজারো ইচ্ছার মধ্যে হঠাৎই প্রায় ভুলে যাওয়া মাহাতো মোড়লকে গোবিন্দর মনে পড়ল। দু'চোখের পাতা বন্ধ করে ভাবল, অশিক্ষিত হলেও বুড়োটা দূরদর্শী ছিল বটে। শ্যামলা গাঁও থেকে অন্ধকার পালিয়েছে। অন্নবস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্যের অভাবও মিটেছে। সেইসঙ্গে শান্তি নির্জনতাও চলে গেছে। ব্রীজের ওপর দিয়ে পাকা সড়ক বিদ্যুৎ খবরের কাগজ আসছে এখন। কিন্তু একোন স্বপ্নের সভ্যতা এখন শ্যামলা গাঁওতে!

সাম্য ও রাজপথ

তার নাম সাম্য। বিশেষ অর্থপূর্ণ নামটা বাবার দেয়া।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রয়াত বিশ্বম্ভর গুইন-এর অনেক বিষয় আশয় ছিল। প্রথমা স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। প্রথম পক্ষের দু'টি পুত্রকন্যা এবং দ্বিতীয় পক্ষের একটি কন্যা—এই তিনটি সন্তানই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, দুই পক্ষের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনে সমতা আনার জন্য চতুর্থবার তিনি যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন তার ফসল সাম্য।

গুইন বংশ মুখ্যত ব্যবসায়ী। সাম্যর একক ব্যবসা 'হোটেল সাম্য'। পরবর্তীকালে বারের লাইসেন্স পাওয়ায় নিচে ছোট হরফে নিওন সাইন যুক্ত করা হয়েছে 'বার কাম রেস্টুরেন্ট'। হোটেলের সামনে দেয়াল ইজারা দেয়া পান সিগারেট ঠাণ্ডা জলের দোকান। নির্দ্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে ফুটপাতের একাধিক হকার ইলেকট্রিক লাইন নিয়েছে। নিজের বিশ্রামের জন্য ঘরটাও মাঝেমধ্যে বাড়তি উপার্জন এনে দেয়। যদিও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ভ্যারাইটি অর্ডার সাপ্লায়ার, কিন্তু নাম 'সাম্য ক্যাটারার'।

এতকিছু সত্ত্বেও ওর অতৃপ্তি। সব কিছুতেই 'ভাল্লাগে না' বলা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আসলে এই হোটেল বারের ব্যবসাটা ওর আদপেই পছন্দ নয়। নিজের মানসিকতার সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিল না।

এই জাতীয় ব্যবসায় বিশ্বম্ভরের সায় ছিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবনের প্রস্তাব শুনে তিনি আঁত্‌কে উঠে বলেছিলেন, মদের ব্যবসা! সেতো সরকারি অফিসার আর মস্তানদের হাজারো উপদ্রব ঝক্কি ঝামেলার ব্যাপার! জীবন বুঝিয়েছিল, আজকাল যেকোন ব্যবসাতেই ঝক্কি ঝামেলা। সাম্য লেখাপড়া জানা চালাক চতুর ছেলে। কাজেই ভয়ের কিছু নেই। সুরাক্ষেত্র গণসংযোগকেন্দ্র। কোন জাতপাতের বিচার নেই। সব দলের নেতা সমর্থক সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ এখানে একাকার। একপক্ষ ঝামেলা করবে তো অন্যপক্ষ মিটিয়ে দেবে। ঠিক ভারসাম্য থাকবে।

দাদার কথায় তখনকার মতো অনুপ্রাণিত হলেও এই ব্যবসায় যে সত্যিই হরেক ঝক্কি ঝামেলা তা সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। লিকার বাদে প্রায় কুড়ির কাছাকাছি পারমিট লাইসেন্স ট্যাক্সের আওতায় পড়া ব্যবসা। দিনে অন্তত দু'টি বিভাগের তরফে ইনস্‌পেকশন থাকবেই থাকবে। সেটা আবার পড়ন্ত বেলা অথবা সন্ধ্যায়। যে সময়টা কিনা চুটিয়ে ব্যবসা করা শুরু তখন। সেই জমজমাট সময়ে কেউ অখুশি হওয়া মানেই ঝক্কি ঝামেলা।

একজন উঁচুদরের অফিসারকে খুশি করতে গিয়ে আজ এমনি এক ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। আকণ্ঠ মাগনা পানভোজনের পর অফিসারটি বেলজ্জের মতো বলে বসলেন, একঠো ছোকরি লে আও। হোটেলটা আবাসিক নয়। মেয়েমানুষে হরেক হুজ্জতি ভয়। অথচ, অফিসারটি নাছোড়বান্দা। উন্মত্ত বেসামাল মাতাল। সে অনায়াসেই রাস্তায় বকুল গাছের নিচ থেকে সস্তার ঘেঁয়ো মেয়েটাকে বিশ্রাম ঘরে এনে দিতে পারত। কিন্তু ঘরের বউটির কথা চিন্তা করে অভিজাত পল্লীতেই নিয়ে গিয়েছিল। অফিসারটি প্রমোদঘরে তো সে বাইরে দীর্ঘক্ষণ বসে হাই তুলেছে। ঘন্টার অংকে অনেকগুলি টাকা খরচ করতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু ব্যবসাটার ওপর আরও বেশি ঘেন্না ধরে গেছে।

অফিসারটিকে উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে যখন ফিরে এসেছে তখন গভীর রাত। সে ঘরে ফেরেনি, হোটেলেই থেকে গেছে।
গা ঘিন ঘিন শরীরটাকে সাবান সাওয়ারে পরিচ্ছন্ন করার পর ওর ঘুম আসছিল এমন সময় দূরের ফুটপাত থেকে চিৎকার চেঁচামেচি হট্টগোল ভেসে এলো। কিছুক্ষণ পর কচিকণ্ঠের কান্নার শব্দ শোনা গেল। কিছুতেই ওর আর ঘুম এলো না।
আবছা আলোর ভোরে সে উদ্দেশ্যহীন পথ চলছিল। ভোরের শান্ত কলকাতা। সূর্য ওঠার আগে পথ চলাতে যে এত আনন্দ মুক্তির স্বাদ তা সে এর আগে কখনও জানত না। কেএম ডি-এর ফাঁকা বিরাট জলপাইপটার সামনে সে থমকে দাঁড়াল। সেখানে এখনও জটলা। ভোর রাত্রের চেঁচামেচির কারণটা জানতে পারল। নষ্ট মেয়েটা নাকি প্রসব করেছে। ছেলে হয়েছে। দু'জনেই ভাল আছে।
উদ্দেশ্যহীন পথ চলতে চলতে সে ভোরের কলকাতা দেখছিল। যেন সদ্যস্নাতা প্রসাধনহীন রমণীর মতো কলকাতা। ঘুমিয়ে থাকা চঞ্চল শিশুটির মতো কলকাতা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেকার প্রস্তুতির মতো কলকাতা। সবকিছুই স্নিগ্ধ পবিত্র রমণীয় লাগছিল।
উদ্দেশ্যহীনভাবেই সে কালীঘাটের মন্দিরে এসে গেল। মন্দিরের চারদিকে আজ পরিচ্ছন্ন সাজগোজ ব্যস্ততা। প্রধান ফটকে ফুলের মালায় লেখা 'সুস্বাগতম্'! অবাঞ্ছিত ভিক্ষুক ফিরিঅলা কুষ্ঠরোগী বেপাত্তা। কাদায় পিচ্ছিল দুর্গন্ধ ময়লা—সব উধাও। রাস্তা থেকে মন্দিরের ভেতর পর্যন্ত কার্পেট পাতা। প্রধান ফটক ছাড়া বাকি দরজাগুলি সব বন্ধ। সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।
এসব কেন? বিস্ময়ের সঙ্গে সে একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করল।
তিনি আসবেন, তাই। পান্ডাটির সংক্ষিপ্ত উত্তর।
তিনি গণপতি যাদব। ভিন রাজ্যের অতিথি। কালের গণতান্ত্রিক রাজা। সেজন্য এত সতর্কতা ব্যস্ততা।
ক্রমশ উৎসুক জনতার ভিড় বাড়ছিল।
একটি বিদেশী গাড়িতে চড়ে গণপতি এলেন। চারদিকে পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনী। উপস্থিত উৎসাহী জনগণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ অভিভূত। পুণ্যার্থীরা দেবীদর্শনের কথা ভুলে গেল। রাজদর্শন এবং তাঁর গাড়িটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। উদ্বেল দর্শক জনতা পুণ্যার্থীরা মুহুর্মুহু ধ্বনি দিচ্ছিল, জয় গণপতির জয়। গণপতি অমর রহে। যথাক্রমে স্বাগত অভিনন্দন জানাল সেবাইত সম্প্রদায়, মন্দির কমিটির কর্তাব্যক্তিরা এবং বস্তি লোকাল কমিটির নেতৃবৃন্দ।
সরকারি তত্ত্বাবধানে গণপতি সুসজ্জিত শৌখিন গতিচেয়ারে বসে জুতো ছাড়লেন। রুপোর পাত্র থেকে গঙ্গাজলে হাত মুখ ধুলেন। তারপর মূল্যবান রুপোর থালায় সাজানো ফুল বেলপাতা ফল মিষ্টি পূজা উপাচার নিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। চারদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠল, জয় কালী মা-র জয়। জয় গণপতির জয়।
পূজা সেরে গণপতি ফিরে যেতে জনসাধারণের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। মন্দিরের নিজস্ব চেহারা ফিরে এলো। ভিড় ধাক্কা ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে সে নাজেহাল। অসুস্থ বোধ করছিল। চারদিক থেকে জয়ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল, জয় মা কালী। কালী মাঈকী জয়।

সাঁতারে জল কাটান ভিড়ে সে ব্রততীকে দেখতে পেল। ব্রততী এখন বধূ। পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি। হাতে শঙ্খবলয়। কপালে সিঁদুরের বড় স্বস্তিক। স্নানে ভেজা তার দীর্ঘ একগুচ্ছ চুল। প্রসাধনশূন্য স্নিগ্ধ পবিত্র মুখশ্রী।
ওর বুকের ভেতর তোলপাড় করে উঠল। অসংখ্য সামুদ্রিক ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। ব্রততীর বড় বোন উপেক্ষিতা কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন করত। চীন ভারত যুদ্ধের সময় বিপ্লবী দলে চলে যায়। দীন দরিদ্র ঘরের মেয়ে বলেই অভাবে বেশিদূর লেখাপড়া গড়ায়নি। এখন চাকরি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন এবং পাড়ায় পার্টি করে। দরিদ্র অবহেলিত মানুষজনের জন্য মিটিং মিছিল আন্দোলনে সৎ একনিষ্ঠ ত্যাগী। তিলে তিলে দগ্ধ ওর যৌবন। কিছুদিন আগেও বন্যার্তদের জন্য সাহায্য নিতে উপেক্ষিতা এসেছিল। সঙ্গে কয়েকজন সংগ্রামী তরুণ ছিল। তখন ওর ভেবে দুঃখ হয়েছিল যে, ওরা অংক কষে কত জনতো প্রতিনিয়ত জীবনসাথী বেছে নিচ্ছে। চোখের সামনে দুঃখবিন্দুটাকে কেউ দেখছে না কেন!
ব্রততীকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। দাদা বাধা দিয়ে বলেছিল, বৈবাহিক সম্পর্কটা সমপর্যায়ে হওয়া দরকার। অসম বিয়ে সুখের হয় না কখনও।
আজকাল দাদার কথাটা তার ভ্রান্ত মনে হয়। সুমিতার বাবা বনেদি বিস্কুট কারখানার মালিক। সুমিতা একমাত্র সন্তান। সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাতেই কী সুখ পাওয়া গেল? পাঁচ বছর হতে চলল, সুমিতার সন্তান হয়নি। হবেও না। শরীর-সচেতন সুমিতা তিন মাস পর পাওয়া সন্তানকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তারের সায় ছিল না তবুও। কাজ সেরে ডাক্তার বিরক্তিতে বলেছিলেন, প্রথম সন্তান বলেই আমার বিশেষ আপত্তি ছিল। ঝুঁকির কথাও বলেছিলাম। ফল যা হওয়ার তা হলো। হয়ত চিরকালের মতো ভবিষ্যতের আশাটা হারিয়ে গেল।
সুমিতা এসব জানে। জানে বলেই ওর প্রতি স্বামীর অবহেলা অনীহায় আমল দেয় না। বাপের বাড়ির দিক থেকে সোসাইটিতে চাহিদা মিটিয়ে নেয়। তিন দিন হল সুমিতা বাড়িতে নেই। গাড়িটা নিয়ে যাওয়ার সময় কাজের লোককে বলে গেছে, বাবুকে বলে দিও উইক এণ্ড-এ যাচ্ছি। কোথায় কতদিনের জন্য গেছে তা সে জানে না। জানতে ইচ্ছেও করে না। এরকম তো হামেশাই যায়।
ইদানীং দাদা জীবন পৃথক অন্নে আছে। প্রাপ্য অংশের কিছুটা বিক্রি করে সল্টলেকে নিজস্ব বাড়ি বানিয়েছে। নিজে দোতলায় থাকে। একতলায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের শাখা অফিস। নিজের হেফাজতে রাখা ঘরখানায় নিজস্ব ব্যবসার অফিস করেছে। ব্যবসাটা মুখ্যত ট্রান্সপোর্টের। সেইসঙ্গে আদি ব্যবসাটিও রেখেছে। খাঁসি সাপ্লায়ার। ধরাবাঁধা মাংসের দোকান আছে। প্রতিটি জেলায় ছড়ানো এজেন্ট। তারা গ্রামগঞ্জে সংগ্রহের পর নির্দ্দিষ্ট দিনে গঞ্জে জমায়েত করে। সেখান থেকে জীবন নিজে ট্রাকে করে সোজা কলকাতায় নিয়ে আসে।
হাওড়া ব্রীজের জ্যামে আটকে পড়েছিল জীবন। তখন দু'খানা ট্রাক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একখানা ব্রিগেডের জনসভায় যাবে। অপরটি মেটিয়াবুরুজে ঈদের খোরাকির সাপ্লাই দিতে। দু'টোতেই ভীষণ চিৎকার চেঁচামেচি। জীবন অতিষ্ঠ।
ক্লান্ত জীবনকে খালি ট্রাক থেকে নামতে দেখে সে ভাবনায় পড়ল। কাল একটা ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন আর পাঁচটা বিয়ে বাড়িতে মাংস সাপ্লাইয়ের এ্যাডভান্স নেয়া আছে। ওর উদ্বিগ্ন

চোখমুখের দিকে তাকিয়ে জীবন রহস্যময় হেসে বলল, আজ ব্রিগেডে ঐতিহাসিক সমাবেশের প্রোগ্রাম আছে জানিস? এক ট্রাক লোক সংগ্রহ করে এনেছি। নামিয়ে দিয়ে এলাম। আবার ফিরিয়ে দিতে যাব। ফিরতি পথে ঠিক সময়ে তোর মাল পৌঁছে যাবে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।
তুমিকী আজকাল পার্টি করছ? ওর প্রশ্নে বিস্ময় ঠিকরে পড়ল।
ধ্যেৎ বোকা। স্রেফ ব্যবসা। রোজগারের জন্য। এক্ষেত্রে কেনাবেচার পরিবর্তে ভাড়া দেয়া নেয়া। শুনে সে মনে মনে হাসল। ভাবল, আজকাল লোক জমায়েত ব্যাপারটা সেরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে।
যে কোন দুর্ঘটনার খবরই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন সেভাবেই ভরদুপুরে খবরটা বারের ভেতরে এসে পৌঁচেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই প্রশ্ন, এ্যাক্সিডেন্ট! কোথায়? মারা গেছে? পুরুষ না মেয়েছেলে—বয়স কত? উৎকণ্ঠা উদ্বেগ আশঙ্কায় অনেকেরই নেশা ছুটে গেল। কয়েকজন খদ্দের দ্রুত বিল মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সেও নিতান্ত ঔৎসুক্যে হোটেল থেকে রাজপথে এসে দাঁড়াল।
রাজপথে বিরাট জটলা জ্যামজট মানুষজনের ভিড়। হৈ হট্টগোল উৎকণ্ঠা উদ্বেগ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, মারা গেছে? দেখতে কেমন? বয়স কত—স্ত্রী না পুরুষ? অথচ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকটি নিরুদ্বেগ নির্লিপ্ত প্রতিক্রিয়াহীন। সে প্রতিদিনকার মতো অনেক সকালে হাইড্রেনের জলে স্নান সেরেছিল। রোজকার মতো উদ্বৃত্ত উচ্ছিষ্ট খাবার সংগ্রহ করে এনেছে। বিশাল অট্টালিকার গেটের বোগনভেলিয়ার ছায়ায় জোড়াসনে বসল। প্রথম পাতের পাশে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ রাখল। তারপর সতৃপ্ত ভোজন শুরু করল।
উত্তেজনা কমাবার জন্য পুলিশ এসে ইতিপূর্বেই মৃতদেহটা সরিয়ে নিয়ে গেছে। চাক্ষুস দেখতে না পারলে জিজ্ঞাসাটা বেশি থাকে। মৃত ব্যক্তি আপন পরিচিত কিনা তা যাচাই করে সকলেই নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিছু অহেতুক কৌতূহলও থাকে। ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন প্রশ্ন করে বসল, বলতে পারেন লোকটা দেখতে কেমন ছিল—ভদ্রঘরের কেউ মনে হল?
না না ছোটলোক। প্রত্যক্ষদর্শী একজন নির্লজ্জ জবাব দিল, একজন গাঁইয়া। ভিক্ষুক টিক্ষুকও হতে পারে।
উপস্থিত সকলেই নিশ্চিন্ত হলো। ক্রমশ ভিড় জটলা ফাঁকা হয়ে আসছিল। জ্যামজটের গাড়িগুলি কে কার আগে যাবে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সরকারি বাসগুলির দারুণ অহং। বেপরোয়া মেজাজে দ্রুত চলা অভ্যেস। সামনের প্রাইভেট বাসটা কিছুতেই ওভারটেক করতে দিচ্ছিল না। সরকারি বাসের কণ্ডাকটর লম্বা করে গলা বাড়িয়ে ধমকের সুরে বলল, এ্যাইই প্রাইভেট। প্রাইভেট বাসের ড্রাইভার অপরাধবোধ সঙ্কোচ হীনম্মন্যতায় কুঁকড়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল। সরকারি বাসের খুশি কণ্ডাকটর জয়ের উল্লাসে পাঁচ আঙুলের টোকায় বাসের দরজায় ঢাকের বাদ্যি বাজাল। মে দিবসের পাতাকাগুলি পতপত উড়ছিল।
সে হোটেলে ফিরে যেতেই লোডশেডিং হলো। ইচ্ছে করেই জেনারেটর বসায়নি। দেখেছে, তাতে বিক্রি কমেনি। বরং অযথা গল্প করে কেউ বেশিক্ষণ সময় কাটায় না। কম খেয়েও পালায় না। অসহ্য গরমে কষ্ট হতে সে আবার রাজপথে এসে দাঁড়াল।

প্রাইভেট বাসটা এখনও আটকে আছে। কলার কাঁদির মতো ঝুলন্ত যাত্রী। সামনে অসময়ে ভারি মাল বোঝাই একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। নজর এড়িয়ে নয়তো নজরানা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাইভেট বাসের কন্ডাকটর হুমকি দিল, এ লঔঅরি মারেগা তেরি—। ভয়ে বাঁয়া করে ট্রাকটা পথ ছেড়ে দিল। বাসের কন্ডাকটর ছেলেটা আহ্লাদে আটখানা। ঘনঘন ঘণ্টি বাজিয়ে আওয়াজ তুলল, যাও ঠিক্‌ক হ্যায়। ট্রাকের ওপর বসে থাকা কুলি দু'জন বিমর্ষ লজ্জিত। কণ্ডাকটর ছেলেটা ওদের উদ্দেশে অশ্লীল ইংগিত করে গেছে তাই।

রাস্তার বেশি ধারে যাওয়া ভারি গাড়ির পক্ষে নিরাপদ নয়। ট্রাকটা বের হবার পথ পাচ্ছিল না। সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সওয়ারি মিটার মিলিয়ে ভাড়া মেটাচ্ছিল। ট্রাকের ড্রাইভার চেঁচিয়ে উঠল, এ্যাইই ট্যাক্সি। ভয়ঙ্কর রুক্ষ মেজাজেও ট্যাক্সির ড্রাইভার বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। পাত্তা না দিয়ে পাল্টা ধমক দিল, ক্যায়া হুয়া? চোপ রহো। তারপর অলস ভঙ্গিতে ভাড়া বুঝে নিল। আর একবার হাসি ছড়িয়ে পথ ছাড়ল।

সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে অসংখ্য মানুষজন যানবাহনের গতি চাঞ্চল্য দেখতে ওর ভালই লাগছিল। এতক্ষণে খেয়াল হলো, ট্যাক্সির সওয়ারি দু'জন পান্না হীরা। দাদার ভাষায়, ওরা একালের গ্রহরত্ন। মডার্ন স্টোন। প্রয়োজন বোধ ওদেরকে ধারণ করতে হয়। অসময়ে বিপদ আপদে দারুণ কাজ দেয়। খরচ রয়ে সয়ে।

এখানে দাঁড়িয়ে ওস্তাদ? কাছে এসে হীরা জিগ্যেস করল।

লোডশেডিং—তাই একটু খাওয়া খাচ্ছি।

আর কেউ ঝামেলা টামেলা করছে নাতো গুরু? পান্না জানতে চাইল।

না। তোমরা ভেতরে যাও। আমি আসছি।

ওরা চলে যেতে ওর মনে হলো, ওদেরও বোধহয় একটা মর‍্যাল অবলিগেশন আছে। ঝামেলা মেটাবার জন্য সপ্তাহে একদিন দু'জনের জন্যে চার বোতল ফ্রী বীয়ার বরাদ্দ। অথচ, গত ছ'মাসে কোন ঝামেলা মেটাতে হয়নি। সেজন্য বরাদ্দ নিতে সঙ্কোচ হচ্ছে হয়তো।

দীর্ঘক্ষণ গড়িয়ে যেতে সে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করছিল। ট্রাম লাইনে চাকা বসিয়ে একটা ঠ্যালা গাড়ি নির্বিবাদে পথ চলছিল। পিছন থেকে এক তিনচাকার টেম্পো ড্রাইভার খিস্তি দিল, এ্যাই ঠ্যালা হাট্‌ শালা। চমকে ঠ্যালাটা টানা রিকশার ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল। রিকশাওলা ধমকাল, মারেগা এক ঝাপ্পড়। চামচিকের লাথি মারার মতো সাইকেল থেকে দুধঅলা বলল, এ রিক্‌শা থোরা সামালকে চল শালে।

সে দেখল, মিনিবাসের সঙ্গে কারও বিবাদ নেই। হরিণীর মতো গতিতে সকলের আগে ছুটে যাচ্ছে। বর্ণকৌলিন্য আছে বটে। বিপদে পড়ল একটা ট্রাম। কোথা থেকে হঠাৎ বিশ পঁচিশ জনের একটা মিছিল ট্রামটার সামনে এসে পড়েছে। দু'পাশে প্রশস্ত ফুটপাত সত্ত্বেও ট্রাম লাইনটাই যেন বেশি পছন্দ।

ট্রামের শীর্ণ ড্রাইভারটি অস্থির ঘণ্টি বাজিয়ে মুক্ত পথ চাইছিল। মিছিলের সংগ্রামীরা নির্বিকার। শম্বুক-শ্লথ গতিতে চলছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে সংগ্রামী মুচকি হাসছে। ম্লান

শ্লোগান দিচ্ছে। ট্রামের যাত্রীরা নীরব প্রতিক্রিয়াহীন। এসব আজকাল গা-সহা হয়ে গেছে। বিরক্তিতে অনেকেই ট্রাম থেকে নেমে যাচ্ছিল।
হঠাৎ ট্রামের ভেতর থেকে বৃদ্ধ যাত্রী অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর পরনের পাঞ্জাবিটা ঘাম জবজবে। রুমাল দিয়ে ঘন ঘন ঘাম মুছছিলেন। পিচ্ছিল নাকের ডগা থেকে চশমা সামলিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। মিছিলকে উদ্দেশ করে উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, ও দাদারা প্লীজ রাস্তাটা একবারটি ছেড়ে দিন। ভীষণ জরুরি। দেরি হয়ে গেলে দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে। আমরাও আপনাদের হয়ে শ্লোগান দিচ্ছি, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। দুনিয়ার মজদুর এক হও। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। প্লীজ।
বৃদ্ধটির সঙ্গে দ্বিতীয় কোন যাত্রী কণ্ঠ মেলালো না। বরং তাঁর আচরণে মিছিলের সংগ্রামী ট্রামের সহযাত্রী আর রাস্তার চলমান জনগণ পরম কৌতুক বোধ করল। ব্যর্থতার নৈরাশ্যে বৃদ্ধটি কাশতে কাশতে মুঠিতে বুক চেপে বসে পড়লেন। মাথাটা বুকের উপর নূয়ে পড়ল। মরলেন না মূর্চ্ছা গেলেন তা খতিয়ে দেখার সময় হলো না। পান সিগারেট ঠাণ্ডা জলের দোকানে রেডিওতে বেজে উঠেছে, মানুষ মানুষের জন্য.....।
সে বুঝতে পারল কারেন্ট এসে গেছে। হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হচ্ছিল, এ ভাবেই যে যার পথে চলছে চলবে। সাম্যও।

সে কি ভোলা যায়

আজ আমার একমাত্র সন্তান প্রাপ্তি-র বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। পাত্র আগ্নেয় ওর স্ব-নির্বাচিত। আর দশজন মধ্যবিত্তের মানসিকতায় সাধ্য-অতিরিক্ত সাধ পূরণের আয়োজন করেছি। কিন্তু ঘটনা সত্যি যে, এই বিয়েতে আমার মনের সায় ছিল না। যারা আমাকে চেনে জানে সেই প্রিয় পরিচিত আপনজনেরা সকলেই অবাক হয়েছে। কেননা, সবদিক বিবেচনায় আগ্নেয় যথার্থই লোভনীয় সুপাত্র। আমি অসম অথবা অসবর্ণের হলেও যেকোনও প্রেম ভালবাসার বিয়েতে আপত্তি তোলা অভিভাবকদের ঘোরতর বিরোধী ও সমালোচক। এক্ষেত্রে, আগ্নেয় অবশ্য আমাদের স্ব-বর্ণেরই। তাছাড়া, ওর বাবা যে কিনা আমার মধুর সম্পর্কের বেয়াই হবে সেই গুড়াকেশ নন্দী এককালে আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিল। এখনও শত্রু নয়। তবু, আমার অনুমোদনে দ্বিধা থাকলে অবাক হবারই কথা। বিশেষ করে দ্বিধার নাভিমূলের কারণটা যদি গোপনই থেকে যায়।
গুড়াকেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ঘটেছিল দীর্ঘকাল পূর্বে। সেই বন্দুকের নলে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার রক্তাক্ত দিনগুলির শেষ পর্বে। বিত্তবান-পুত্র গুড়াকেশ শ্রমিক-কৃষক দরদি রাজনৈতিক দলে হঠাৎই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমি ছিলাম, ওপার বাংলা থেকে বাস্তুচ্যুত অস্বচ্ছল পরিবারের গৃহমুখি-সংগ্রামী সন্তান। রাজনীতি-বিমুখ হলেও আমি মানবতাবাদী সাহিত্যব্রতী। মিটিং মিছিল শ্লোগান আন্দোলনের পরিবর্তে আমার যা কিছু প্রতিবাদ-কণ্ঠস্বর তা এই কলমে। দু'জনে দ্বিমুখি হলেও হৃদয়গত বন্ধুত্বে বিন্দুমাত্র খামতি ছিল না। যদিচ বিতর্ক হত যথেষ্টই, তিক্ততা কাউকে স্পর্শ করত না। তবু, আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। নাভিমূলে ছিল, অবিশ্বাসের বিযাক্ত বাতাস।
সেই সময়তো এই দূষিত বাতাস ঘরে বাইরে প্রিয় পরিচিত আপনজনের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। সর্বত্র। ডাক্তার জেঠু হিতার্থী বসু ছিলেন যথার্থ আর্তজনের সেবায় ব্রতী। কোনও এক জলঝড়ের বেশি রাতে দাস্তবমিতে মুমূর্যু রোগীকে দেখতে যাওয়ার নাম করে যে যুবক ডাকতে এসেছিল সেতো পরিচিতই ছিল। সাবেকি ধ্যান-ধারণার ডাক্তার বলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন। পৌঁছে দেখলেন, পুলিশের গুলিতে আহত একজনকে বিপদমুক্ত করতে হবে। করেওছিলেন। তবু, গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ওরা অবিশ্বাসী কাজ করেছিল। ডাক্তার জেঠুর নলিকাটা দেহটা পাওয়া গিয়েছিল রেল লাইনের ধারে।
এরপর একদিন কুয়াশাচ্ছন্ন অল্প আলোর ভোরে নিত্যকার গঙ্গাস্নানে গিয়ে অজাতশত্রু পুণ্যপ্রতীম শাস্ত্রী খুন হলেন। অমার্জনীয় অপরাধ ছিল, সরল মনে ওঁর আশ্রমে দু'জন যুবককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে জানতে পেরেছিলেন, ওরা আসলে রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী। একাধিক খুনের দায়ে আশ্রমে আত্মগোপন করে আছে। আমাদের পরিবারের প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন শাস্ত্রীমহাশয় ওদেরকে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন। তাই—
খুন তখন নিত্যদিনের ঘটনা। সকালে দিনে দুপুরে রাত্রে—কখন নয়? একই দিনে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ বদলা নেয়ায় একাধিক মৃত্যু ঘটে যাচ্ছে পরিচিত অপরিচিত অনেকেরই। কে যে কোন দলের হয়ে ঘাতকের কাজ করছে বোঝার উপায় নেই। সেইসঙ্গে আছে পুলিশ মিলিটারির চিরুনি তল্লাসি। আত্মগোপন আত্মসমর্পণ অথবা মুখোমুখি সংঘর্ষে আত্মবিসর্জন। পাড়ার যুবক তরুণরা নিজ আবাস ছেড়ে অন্যের ছাদে বিনিদ্র রাত কাটাতে শুরু করল। অনেক সময় গৃহস্বামীর অজান্তেই।

সেইসময় একদিনকার ঘটনায় আমার চাপা রাগ ক্ষোভ উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটল। অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে নীরব বিষণ্ণ বিষাদ ভয়ার্ত সকলের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে আমার গা ছমছম করে উঠল। বুঝলাম, নির্ঘাৎ কোনও দুঃসংবাদ আছে।
কি হয়েছে মা? অজানা আশঙ্কায় আমি জিগ্যেস করলাম।
কিছু না। মা কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে কষ্টার্জিত সংযত রাখলেন।
কিছুতো বটেই। আমি মানসিক উদ্বেগে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে বল।
সবে অফিস থেকে ফিরেছিস। জামাকাপড় ছেড়ে চা জলখাবার খেয়ে নে, তারপর বলা যাবে।
এমন কথা শোনার পর ওসবের পাট চুকানো অব্দি অপেক্ষা করা যায় নাকি? আমি উদ্বেগ উত্তেজনায় বললাম, তুমি এক্ষুণি বল।
তোর বন্ধু গুড়াকেশ এসেছিল। ডাকাত-চিঠি পাওয়া মানুষের মতো দৃষ্টি মেলে মা বললেন, বলে গেছে রোজ রাত্রে পাঁচজনের খাবার তৈরি রাখতে হবে। ওদের লোক এসে নিয়ে যাবে।
অসম্ভব। আমার কলমের নিরুচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ নির্ভীক উচ্চকিত হল, গুড়াকেশ ভেবেছেটা কী? আমরা কী বুর্জোয়া? শ্রেণীশত্রু, বিত্তবান? কিছুতেই এই অন্যায় আমার দ্বারা মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না।
মাথা গরম করিস না বাবা। ভয়ার্ত মা-আমার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বোঝালেন, দিনকাল খারাপ। তাছাড়া আজ না হোক কাল ওরা বুঝতেই পারবে। এমনও তো হতে পারে যে তোরই কোনও প্রিয়জন প্রাণভয়ে আত্মগোপন করে আছে। না খেয়ে মরলে ভুলটা বুঝবে কেমন করে?
বেশ পাঁচজনকে খাওয়াব, কিন্তু খাবার পাঠাতে পারব না। মা-র যুক্তি মেনে নিয়ে আমি প্রস্তাব দিলাম, ওদের পাঁচজনকে আমাদের বাড়িতে এসে খেয়ে যেতে হবে অথবা নিজে গিয়ে দিয়ে আসব। আমি চিনে রাখতে চাই, কে সেই পাঁচজন।
পাঁচজনের খাবার তৈরি থাকলেও কেউ সেই খাবার নিতে আসেনি। গুড়াকেশের সঙ্গেও আমার দেখা হয়নি অনেকদিন। এরই মধ্যে বিস্ময়কর এক প্রিয়জন হারানোর স্বজনশোক আমার মনেও অবিশ্বাসের বীজ বপন করল। পাড়ার সর্বজনপ্রিয় অপু ছিল আমাদের পরিবারের একজন সদস্যর মতো। সেই অপু আর হীরু হরিহর-আত্মা বন্ধু হলেও রাজনৈতিক মেরুকরণে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অপুকে নিজের বিয়ের পাত্রী দেখতে যাওয়ার সঙ্গী হতে বলেছিল হীরু। অবিশ্বাসের বিষাক্ত বাতাসে তখনও আচ্ছন্ন হয়নি বলেই অপু সেই ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করেনি। সেই যে অপু গেল আর বাড়ি ফিরল না। তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর ওর পচাগলা মৃতদেহটা উদ্ধার হল, দশ মাইল দূরের এক ঘন জঙ্গল থেকে।
এর দু'দিন পর হীরুও খুন হল। খুন হল, আমার কাছে অঙ্ক শিখতে আসা নকুল। বাবার মৃত্যুর পর যিনি আমাদের অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন সেই অনাত্মীয় স্বজন রহিমচাচাকে খুন করা হল, চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিয়ে সাহায্য না করার দায়ে। ওরা যতই প্রচার করুক না কেন আমি আজও বিশ্বাস করি না, অসাম্প্রদায়িক মানবদরদি হাজী রহিমচাচা সুদখোর ছিলেন।
যাক সে কথা। পরের ঘটনায় আসা যাক। রাত তখন দশটা হবে। তখন ডোরবেল ছিল না। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে খাবার টেবিলে সবাই সন্ত্রস্ত হলাম। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, এত রাত্রে কে হতে পারে?
কে? বন্ধ কপাটে কান রেখে আমি জানতে চাইলাম।

আমি। ওপার থেকে যথেষ্ট অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের জবাবে বুঝতে পারলাম না যে অগন্তুক ব্যক্তিটি কে।
আমি কে? আমি রূঢ় কণ্ঠে জিগ্যেস করলাম।
আমি গুড়াকেশ। দরজা খোল।
এত রাত্রে কি ব্যাপার? আমার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো বিরক্তি অবিশ্বাস।
আগে দরজাটা খুলবি তো! জরুরি দরকার আছে।
জরুরি দরকার মানে তো আমাদের বাড়িতে কেউ রাতের আশ্রয় নিয়েছে কিনা সেটা যাচাই করা? আমি দরজা না খুলে রাগত বললাম, এর আগেও একদিন এসেছিলি শুনেছি। কিন্তু কেউ আসল উদ্দেশ্য অনুমান করতে না পারে তেমনভাবে কথায় কথায় সব ঘরেই ঘুরেছিস। তক্তপোশের নিচেও উঁকি দিয়েছিস এক ফাঁকে। সেদিন যেমন কাউকে পাসনি, আজও নেই।
তবু দরজা খুলতে হবে?
বিশ্বাস কর সত্যিই জরুরি কথা আছে।
এদিকে এসে বল, কী এমন জরুরি কথা? সদর দরজার ডানদিকের জানলা খুলে আমি বললাম।
আমি তোর বন্ধু। খোলা জানলায় অপর দিকে বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুড়াকেশ অভিমানাহত বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, অবিশ্বাস করে আমাকেও তুই দরজা খুললি না প্রাণেশ!
অপু আর হীরুওতো আমাদের মতোই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আমি আবেগআপ্লুত বললাম, তোদের সর্বনাশা-রাজনীতিতে বন্ধুত্ব আত্মীয়তা স্নেহ মায়া মমতা ভালবাসা—সবকিছু খুন হয়ে যাচ্ছে। আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না।
এরপর জরুরি কথাতো নয়ই, মুখে রা পর্যন্ত কাড়েনি গুড়াকেশ। মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। জানিনা, ঠিক কতটা অপমানিত হয়েছিল। অথবা কতটুকু রাগ ক্ষোভ অভিমান সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে আমরা দু'জনে যোগাযোগ-শূন্য বিচ্ছিন্ন।
এর কিছুদিন পর থেকেই বিপরীত বাতাস বইতে শুরু করে। উত্তর কলকাতায় পৈশাচিক কল্পনাতীত সংখ্যক হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী পর্যায়ে একের পর এক চলল, প্রশাসনিক নির্দয় নির্বিচার অমানবিক অত্যাচার। আচমকা এমনতর আক্রমণে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনকারিরা অপ্রস্তুত বিচ্ছিন্ন হতবাক বিমূঢ়। যে যার ইচ্ছা-নির্ভর বেঁচে থাকার পথ খুঁজতে তৎপর। আত্মগোপন সমর্পণ অথবা আত্মবিসর্জনে মুক্তির গর্ভযন্ত্রণা-কাতর দশকের স্বপ্ন-আলো স্তিমিত হয়ে আসা দুঃসময়কালে গুড়াকেশ কোথায়? নৈনিতালে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, সে সাহেবি শীতবস্ত্র পরে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছে। পাশের ঘোড়ায় আসীন সুবেশা সুন্দরীকে দেখে অনুমান হল, নির্ঘাৎ ওর স্ত্রী হবে। পরে জেনেছি, সত্যিই তাই। আগ্নেয় ওদের সেই সময়কার সন্তান বলেই হয়ত অমন নাম।
সেই গুড়াকেশ এখন রীতিমতো অন্য জগতের মানুষ। ওর স্ত্রী শ্রেষ্ঠার বাবা বিখ্যাত মদ প্রস্তুতকারক বিপ্রদীপ ব্যানার্জী। শ্রেষ্ঠাকে বিবাহসূত্রে গুড়াকেশ সেই ব্যবসায় একজন অংশীদার। এছাড়াও নিজের নামে বিস্কুট কারখানা, শ্রেষ্ঠার মালিকানায় চিংড়ি মাছের চাষ আর ছেলের নামে নতুন দীঘায় 'হোটেল আগ্নেয়'। এ ছাড়াও অন্য এক বা একাধিক ব্যবসা থাকলেও থাকতে পারে। গুড়াকেশ এখন সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে উৎসাহী। সেজন্য লবণহ্রদে বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি করেও সেখানে থাকে খুব কম। ইদানিং বিলিতি গাড়ি সাহেবি পোশাক আর কেতাদস্তুর ঠাঁটবাট ছেড়েএখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেহিসেবি সময় কাটায়। সামাজিক

অসামাজিক জনসংযোগে দেদার সাহায্য ছড়ায়। কিন্তু এত কাছাকাছি বসবাস সত্ত্বেও আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ সম্পর্কই নেই।

আমার ভাবতে অবাক লাগে, অতীত-ঘটনার অনেক পরে জন্মালেও প্রাপ্তিতো আমার মুখ থেকে সবই শুনেছে। তবু কেন যে—! ভাললাগা ভালবাসা বোধহয় এমনই হয়ে থাকে। কোনও বাধা মানে না। পাগল অথবা অন্ধ করে দেয়। অথবা হয়ত একালের চলতি ধারামতে প্রাপ্তিও ভাবাবেগশূন্য বস্তু ও বাস্তববাদী একজন।

যদিও জানি, নিজের বাড়িতে ম্যারাপ বেঁধে অনুষ্ঠান করায় বিস্তর ঝুক্কি ঝামেলা অসুবিধা। তবুও আর দশজনের মতো বিয়ে বাড়ি ভাড়া না নিয়ে নিজের বাড়িতেই প্রাপ্তির বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। কেননা, বর্ণালী আলোময় নিজের বাড়িতে কোলাহল হাসি উচ্ছ্বাস খুশি ঝলমল অনেক অতিথির পদার্পণ সমাগমের স্বাদই আলাদা।

একে তো ভালবাসার বিয়ে তায় আবার ওরা আগেই রেজিস্ট্রি করে রাখায় দেখাশোনা পাকা কথা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়নি। আমার স্ত্রী শ্রাবন্তী সাক্ষাৎ যোগাযোগ আর ফোনাফুনিতেই অনুষ্ঠান সম্পাদনে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা মেনে মানিয়ে নিয়েছে। সেইমতে আজ বিয়ের আগে এ বাড়িতেই পাত্রপাত্রী উভয়ের আর্শীবাদ সম্পন্ন হবে।

বরযাত্রীদের বাস পিছনে ফেলে রেখে সর্বাগ্রে সাজানো কণ্টেসা এসে দাঁড়াল। ভেতরে বরবেশী আগ্নেয়। সঙ্গে পুরোহিত, দু'জন যুবক আর বরকর্তা গুড়াকেশ। পরের ওপেলো আর টয়টা গাড়ি দু'খানায় আশীর্বাদের বয়স্ক লোকজন ভিডিও ক্যামেরার ব্যক্তিদ্বয় আর দু'জন সুবেশা সুন্দরী তরুণী।

সবাই তৈরি হয়েই ছিল। সানাই বেজে উঠল। উলুধ্বনিতে মেয়েরা মায়েরা সাবেকি নিয়ম মতে বর বরণ করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে বসালো। বিনীত আমন্ত্রণ অভ্যর্থনায় সঙ্গীরা একে একে সেই পথে গেল। একমাত্র গুড়াকেশ দরজায় আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওর ঠোঁটে দুর্বোধ্য একচিলতে হাসি। উজ্জ্বল চোখের কোণ আর রক্তিম আভা। যথেষ্ট স্থূলকায় হয়েছে গুড়াকেশ। আমি বোবা বিস্ময়ে অল্পক্ষণ ওর দিকে অপলক তাকিয়ে।

আজ নিশ্চয়ই তোর ঘরে ঢুকতে দিবি? গুড়াকেশ মুচকি হাসল। তারপর উত্তর অভ্যর্থনার প্রতীক্ষা প্রত্যাশায় না থেকে চৌকাঠ পার হল। অপ্রস্তুত আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, সময়ে সবকিছু মেনে মানিয়ে নিতে হয় বন্ধু। নৈলে অশেষ দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণায় ভুগতে হয়। পারলি কী আজ দরজা বন্ধ করে রাখতে?

কি জবাব দেব আমি? পাত্রীর বাবা হয়েও অশোভন নির্বাক থেকে চিনচিন যন্ত্রণাদগ্ধ ভাবলাম, দরজাতো আজ আমার সবার জন্যই উন্মুক্ত। কিন্তু সেইসব হারানো প্রিয়েজনেরা তো আর কোনও দিনই এই দরজা দিয়ে ঢুকবে না।

গুড়াকেশ আমাকে লজ্জায় সংকুচিত অসহায় মনে করে দু'হাত বাড়ালো। আন্তরিক জড়িয়ে ধরে বলল, আজ থেকে আমাদের নতুন সম্পর্ক। বী ইজি। অনেক পিছনে ফেলে আসা সেসব পুরনো প্রসঙ্গ ভুলে যাতো।

আমি কিন্তু তেমনি নিরুত্তর। গুড়াকেশের নির্ভেজাল আলিঙ্গনে আপ্লুত হওয়াতো দূরের কথা, কিছুতেই সহজে স্বাভাবিক হতে পারলাম না। বুকের ভেতরকার জমাট কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে কিছু বলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। ঠোঁটের পাপড়ি দু'টি বার কয়েক ঈযৎ কেঁপে উঠল। কিন্তু সব শব্দবাক্য অব্যক্তই থেকে গেল।

জীবন যে রকম

যেতে তো হবেই একদিন। অমর থাকে কে কবে। সময় হলে, সকলেই একদিন যাব চলে। কবিতার ঢঙে জীবনলাল প্রসঙ্গত হামেশা বলত। উপসংহারে থাকত, অতএব সদা থাক আনন্দে। কখনও সখনও কবিগুরুর গানের কলি শোনাত, জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে/সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে চলে যাবে।

সেই জীবনলাল চলে গেল। কোথায়? ওর কথায়, চিরমুক্তির আনন্দধামে।

জীবনলালের এই অসময়োচিত চলে যাওয়ার দুঃসংবাদ রূপেনকে চৌকাঠ পার হতে দিল না। অফিসে রওনা হওয়ার মুখে ফোনটা বেজে উঠতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মণীষা রিসিভার তুলে শুধুই শুনে যাচ্ছিল। নিজে কিছুই বলছিল না। ওর মুখের আদলে ভাবান্তর লক্ষ্য করে রূপেনের মনে নানা অশুভ আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল, কার ফোন? তবে কী খারাপ খবর কিছু?

রিসিভার রেখে বিষাদ মাখা গলায় মণীষা বলল, তোমার বন্ধু জীবনলাল, একসপায়ার্ড। হাসপাতাল থেকে ডেড বডি ওর বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার আগে কে একজন জানাল।

বাধা পেয়ে শোকাহত রূপেন পিছু হটে এল। সোফায় বসে পড়ল।

নাগাড়ে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল রূপেন। ওর মনের অবস্থাটা টের পেয়েও মণীষা সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোন শব্দ বাক্য খুঁজে পাচ্ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর শীতল নিস্তব্ধতা ভাঙল, ওর বাড়িতে যাবেতো নিশ্চয়ই একবার?

যাওয়াতো অবশ্যই উচিত, কিন্তু—। রূপেন ওর সমস্যা শোনাল, এখন বাজেট অধিবেশন চলছে। অফিসে ঠাসা জরুরি কাজ হাতে। সাপ্তাহিকের জন্য রাজ্য রাজনীতি সম্পর্কে আর্টিকেলটা জমা দেয়ার আজই শেষ দিন।

তাহলেও যাও একবার। উৎসাহিত করে মণীষা বলল, তা নাহলে আজীবন বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে যে। তাছাড়া, এইতো বোধহয় শেষ। এরপর ভুলেও কী যাবে কোনদিন? গাড়ি হাঁকিয়ে গেলে যাতায়াতে কতক্ষণ আর সময় লাগবে।

মণীষা বোধহয় মিথ্যা অনুমান করল না। রূপেন ভেবে দেখল, জীবনলালের দুর্বার চুম্বক—শক্তি ছিল। বলতে গেলে সেই শক্তির টানেই শহুরে স্বচ্ছল ভোগবিলাসী জীবন থেকে প্রায়ই ওর গরিবখানায় ছুটে যেত। এই যাওয়ার পেছনে অবশ্য গোপন একটা কৃতজ্ঞতা বোধও কাজ করত। এককালে রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী রূপেন রায় যে এখন বিখ্যাত বুর্জোয়া পত্রিকা অফিসে সাংবাদিক হিসেবে চাকরি করছে তা জীবনলালের দৌলতেই। সম্পাদক শরদিন্দু সান্যাল হলেন ওর মামা বাড়ির দেশের লোক। অল্প বয়সে বাবাকে হারানোর পর ওর কৈশোর কেটেছিল মামা বাড়িতে। সেই সুবাদে শরদিন্দুর বাবা ছিলেন ওর শিক্ষক। ওর মুখে শোনা সেই সূত্র ধরে রূপেন অনুরোধ করেছিল, বিজ্ঞাপনে যা যা যোগ্যতা চেয়েছে, সবই আছে। দরখাস্তের সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রও পাঠিয়েছি। কিন্তু যুগটা যে ব্যাকিং আর সুপারিশের। তাই শুধুমাত্র যোগ্যতার ওপর আস্থা রাখতে পারছি না। তুই যদি একবারটি শুধু শরদিন্দুর বাড়িতে নিয়ে যাস তাহলেই যথেষ্ট। যা কিছু বলার আমিই বলব।

জীবনলাল ওর নিকটতম বন্ধু হিতেন সতীন্দ্র জীবেশ রণেন্দু রূপেনের মতো বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা মতবাদের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণকারী ছিল না। হয়ত সেজন্যই ওদের মতো শ্রমিক নেতা, অধ্যাপক, পঞ্চায়েত প্রধান, সরকারি বিল্ডিং কন্টাকটর ইত্যাদি কিছু একটা হতে পারেনি। একজন সামান্য শিক্ষক হয়েও একান্ত নিজস্ব নির্ভীক নিরপেক্ষ বিশ্বাসের প্রতি অটুট আস্থা রেখেছিল। নিজের জন্য যা পারত না বা করত না, রূপেনের জন্য তা করেছিল। এই ঋণ শোধ হয় কখনও? জীবনলাল মরেও ওর সেই দুর্বার চুম্বক শক্তি দিয়ে রূপেনকে টানছিল। দ্বিধা দ্বন্দ্বে রূপেন আর সময় নষ্ট করল না। নিউ আলিপুর থেকে রওনা হয়ে তারাতলার মোড়ে মারুতি থামাল। কিছু সাদা ফুল আর মালা কিনল। তারপর হরিণীর বেগে গাড়ি ছোটাল। ব্রেসব্রীজ জিনজিরিয়া বাজার পেরিয়ে ঠিকানা বজবজের দিকে এগিয়ে চলল।

এখন বাতাস বইছে এলোমেলো। আজীবন ফিটফাট গুছিয়ে চলার মানুষ রূপেন টুকটাক আগোছালো ভাবছিল। চেহারা, চরিত্র, বৃত্তি আর মানসিকতা—কোন কিছুতেই তো দু'জনের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। ওর মতো সৎ, মহৎ হৃদয়, পরিশ্রমী, উদ্যমী, প্রাণবন্ত পুরুষ তো নয় সাংবাদিক রূপেন রায়। ওর মতো অনুদ্ধত অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপনও করে না। তাহলে কোন সূত্রে অথবা সেতুবন্ধে অতি ঘনিষ্ঠতা গড়িয়ে গিয়েছিল একান্ত আপনজনের পর্যায়ে? রূপেন কোন উত্তর খুঁজে পেল না। রোদ-তাপ এসে স্পর্শ করছিল। তাপ-কাতুরে রূপেন রায়ের ফ্ল্যাট অফিস এখন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত; অথচ গাড়ির জানলার রোদ-কাঁচ তুলল না। জীবনলালের স্মৃতির উত্তাপের স্বাদই যেন আলাদা এখন।

জীবনলাল ছিল যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ। দ্বিধাহীন সত্যান্বেষী অপ্রিয় সত্যভাষী। ঠোঁটকাটা সমুচিত সমালোচক। হয়ত সেজন্যই বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি, খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, অর্থ অথবা পুরস্কার ইত্যাদি কিছুই পেয়ে গেল না। সুযোগ্য শিক্ষক হয়েও যথাযথ মর্যাদাই বা পেল কতটুকু?

জীবনলাল কিন্তু থেমে থাকেনি। জুতা কারখানায় চাকরি জুটিয়েছিল। শ্রমিকদের হয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠের জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছে। স্কুলে শিক্ষকতা করত। কত আর বেতন তখন? প্রাইভেট ট্যুইশানি করেও আড়াই জনের সংসার চলতে চাইত না। একচিলতে ঘর নিয়ে 'লেখনি' নামে দোকান খুলেছিল। কালি কলম পেন্সিল খাতা কাগজ ইত্যাদির দোকান। নামেই ব্যবসা, আসলে সেটা হয়ে দাঁড়াল সাহিত্যরসিকদের আড্ডাস্থান। চুটিয়ে গল্প গুজব আলোচনা চলত। জমাটি আড্ডার সময় খদ্দের এসে পড়লে জীবনলাল অখুশি হতো। চাওয়া জিনিস দোকানে থাকা সত্ত্বেও নেই বলে খদ্দের ভাগিয়ে দিত। ওভাবে ব্যবসায় লাভ হয় কখনও? লোকসানের ঠেলায় দোকানদারি শিকেয় উঠল বটে, কিন্তু তেমন অসুবিধায় পড়তে হল না। বরং জীবনের সেই সময়টুকুতেই যা কেটেছিল ভাল। নতুন সরকারের জমানায় অপ্রত্যাশিত পে-স্কেল পাল্টে স্কুল শিক্ষকদের তখন রমরমা অবস্থা।

দুম করে বেতন বাড়ার পেছনে রাজনীতি ছিল। ক'দিন যেতে না যেতেই সেটা টের পাওয়া গেল। হোক না রাজনীতির খেলা, মিটিং মিছিল আর সমর্থনের চাঁদায় যদি স্বচ্ছলতা পাওয়া যায় তো মন্দ কী? কিন্তু জীবনলাল কিছুতেই ওর নিরপেক্ষতা জলাঞ্জলি দিতে চাইল না। শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন দলাদলি মেনে নিতে পারল না। বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী সমর্থক সমিতির সদস্য হওয়াতো দূরের কথা, নতুন শিক্ষানীতি আর শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য অনুপ্রবেশের সমালোচক হয়ে উঠল।
জীবনলাল একা আর কতখানি শক্তিধর? তবু, হাল ছাড়ল না। হাতিয়ার হিসেবে কলম ধরল। রঙ্গ ব্যঙ্গ শ্লেষাত্মক নানারকম লিখতে শুরু করল। ছোটবড় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ওর ছড়াগুলি সকলের মন কাড়তে লাগল। ছড়াগুলিতে আপাত হাসির ঝিলিক বা মজা থাকলেও ভেতরে থাকত তীক্ষ্ণ আঘাত দংশন। তির্যক তীক্ষ্ণধর ব্যঙ্গরসের রচনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কুশ্রীতার নাভিমূলে আঘাত করতে জীবনলাল হয়ে উঠল নির্ভীক নিঃশঙ্ক চিত্ত।
ব্যস আর যায় কোথায়? বিষনজরে পড়ে গেল জীবনলাল। নানাভাবে নাজেহাল হতে লাগল। কিন্তু ভাঙবে তবু মচকাবে না। আপোষহীন হয়েই থাকতে চাইল। স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিল। সেই থেকে আমৃত্যু জীবনলাল ছিল স্বাধীন-মনস্ক। ওর বৃত্তি বলতে ছিল সকাল-রাত্রি একের পর এক ট্যুইশানি। তবু, কোনদিন ওর চরিত্রে হীনম্মন্যতা হৃদয়হীনতা পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস যন্ত্রণার প্রতি ওর ছিল আন্তরিক সহানুভূতি বেদনাবোধ আর ভালবাসা।
গলির মুখে চওড়া পাকা রাস্তায় রূপেন ওর গাড়ি রাখল। পায়ে হাঁটা আঁকাবাঁকা সরু গলিপথে পা বাড়াল। দূর থেকে জীবনলালের বাসার সম্মুখে লোকজন দেখতে পেল না। কাছাকাছি পৌঁছেও কান্নার কোনও আওয়াজ শুনতে না-পেয়ে ভাবনায় পড়ল। তবে কী মরদেহ পৌঁছায়নি এখনও? নাকি বাসা ঘুরিয়ে শ্মশান পথে চলে গেছে?
রূপেন অবাক হল। এক চিলতে উঠানে একখানা দড়ির খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছে শীর্ণ শবদেহী জীবনলাল। গাল ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখা নাকে গোঁজা তুলো। দু'চোখের ওপর তুলসীপাতা। পুরনো তসর-রঙা মুখখানা এখন হলদেটে। কোথায় গেল ঠোঁটের সেই হাসি? নতুন সাদা কাপড়ের বদলে ওর রঙচটা নস্যিরঙা চাদরখানা গলা অব্দি ঢেকে স্তব্ধ শুয়ে আছে জীবনলাল। ফুল বলতে মাথার দু'পাশে পাতা করুণ কৃপণ দু'টি স্তবক। খাটিয়ার পায়া-শীর্ষে আধপোড়া একগুচ্ছ ধূপকাঠি। জীবনলালের একমাত্র সন্তান নির্ভয় ওর বাবার মরদেহ ছুঁয়ে বিষণ্ণ বসে আছে। পঁচিশ বছরের সাথী সীমা ছেলের পাশে যেন পাথর প্রতিমা। আর দু'চারজন ইতস্তত আনত যারা দাঁড়িয়ে রূপেন ওদের কাউকেই চিনতে পারল না। তবে কী রণেন্দু সতীন্দ্র জীবেশ হিতেন ওরা খবর পায়নি এখনও? হিতেনতো বেশি দূরে থাকে না। এখানকার পঞ্চায়েত প্রধানও। হিতেন খবর পায়নি হয় কখনও? আর জীবনলালের ছাত্রছাত্রীরাই বা কোথায়? পাড়াপ্রতিবেশী প্রিয় পরিচিত আপনজনেরা?
রূপেনের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। ম্লান আনত হল। সঙ্গে আনা মালা আর ফুলগুলি মরদেহের ওপর সাজিয়ে দিল। তারপর কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে শিউলি গাছের নিচে দাঁড়াল। জীবনলালের মরদেহর দিকে নির্বাক অপলক তাকিয়ে রইল। এক সময় উদাসী হয়ে স্মৃতিচারণে ডুবে গেল। ইদানীং সাপ্তাহিকে রঙ্গব্যঙ্গ কলমে প্রায়ই জীবনলালের লেখা ছাপা হচ্ছিল। নিজ গুণমানেই মোটামুটি পরিচিতি পাচ্ছিল। অফিসে আলোচনায় অনেকেই কৌতূহলী প্রশ্ন করত, কে এই জীবনলাল বর্মণ? রূপেনের বুক ফুলিয়ে বলতে ইচ্ছে করত, আমার বন্ধু। অতি আপনজন। পরক্ষণেই চুপসে গিয়ে ভাবত, জীবনলালতো নিজে থেকে কাউকে এখানে বলেনি কখনও।

রূপেন যে ওর বন্ধু সে পরিচয় না দিলেও পত্রিকা অফিসে লেখা জমা দিতে বা চেক নিতে গেলে দেখা করতে ভুলত না। মুখোমুখি হলে রসিকতা করে বলত, নমস্কার রূপবান রূপেনকুমার। তারপর দ্বিধাহীন সামনের চেয়ারে বসে জিগ্যেস করত, কেমন আছিস? বাড়ির খবর কুশল তো?

রূপেন অনেক সময় বিব্রত বোধ করত। অফিসে বসে ওর নস্যি নেয়া আর ঠাট্টা ইয়ার্কি মোটেই পছন্দ করত না। ব্যস্ত কাজের সময় ওর বকবকানি ফালতু মনে হত। আরও অনেক কিছু আচার আচরণই অবাঞ্ছিত লাগত। তবু ওকে বুঝতে দিত না।

জীবনলাল খুব একটা বেশি সময় নিত না। হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বলত, চলি এবার। অনেকক্ষণ ডিসটার্ব করে গেলাম বলে ক্ষমা করিস।

ওর এই নমস্কার জানানো আর ক্ষমা চাওয়া যেন একটা মুদ্রাদোষ হয়ে গিয়েছিল। আজ এই মুহূর্তে ওর কাছে রূপেনের ক্ষমা চাইতে মন চাইছিল। কোনদিন প্রতি নমস্কার জানায়নি বলে, আজ শেষ নমস্কার জানাতে সঙ্কোচ হচ্ছিল।

রূপেনের জীবনে জীবনলালই প্রথম অনাত্মীয় যে কিনা ওর মরদেহের পেছনে শ্মশান অব্দি টেনে নিয়ে চলছিল। পায়ে হাঁটায় অনভ্যস্ত রূপেন গাড়ি ছেড়ে হাঁটছিল। মাথার ওপর সূর্যের দাপট। বাতাসে আগুনের হলকা। পিচ গলা দীর্ঘ পথ। অথচ আশ্চর্য, রূপেন এতটুকু কষ্টবোধ করছিল না। অদ্ভুত এক চুম্বক শক্তির টানে দশ বারোজনের এক শোক শবযাত্রার পেছন পেছন হাঁটা পথে দেড় মাইল পার হয়ে শ্মশানে পৌঁছে গেল। মফস্বলের শ্মশান সাধারণত শুনশান থাকে। ক্বচিৎ কোনদিন মরদেহ এলে প্রাণ পায়। অন্যথায় ঘুম ঘুম ঝিমোয়। মানুষজন বলতে খেয়া পারাপারের যাত্রীরা। দিনের ওই সময়টুকুতেই শুধু চা পান বিড়ি মুড়ি মুড়কি তেলেভাজা আর ধেনোমদের দীন দোকান ক'খানা খোলা দেখা যায়। বাকি সময় গা ছমছম পরিবেশ। ডোম পুরোহিত আর সৎকার সামগ্রীর দরকার পড়লে তেমন কোন সমস্যা হয় না। কাছেই বসতি। ডাক পড়লে চায়ের দোকানদার অব্দি ছুটে আসে।

সেই শ্মশান ভূমিস্থল আজ এখন লোকে লোকারণ্য। একটু আগেই শোক মিছিল করে আর একটি মরদেহ আনা হয়েছে। সেই ভিড়তো আছেই, ক্রমশ লোকজন আরও বাড়ছিল। জীবনলালের মরদেহ শ্মশান চত্বর অব্দি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। অল্প দূরে নিম গাছের নিচে নামিয়ে রাখতে হল।

আগে আসা মরদেহটি কার হতে পারে যে এত লোক সমাগম? রূপেন অনুমান করল, নিশ্চিত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গেছেন। চেনা জানা নমস্যদের মধ্যে অনেকেইতো এখনও বেঁচে আছেন। ওঁদের মধ্যে কেউ কী? প্রথমেই একশ' বছর ছুঁই ছুঁই স্বাধীনতা সংগ্রামী কানাইলাল মন্ডলকে মনে পড়ল। তারপর নব্বই পেরুনো হেডসার সতীশ মুখার্জী। চ্যাটার্জী পাড়ার মমতা মাতৃসদনের প্রতিষ্ঠাত্রী কিরণশশী চ্যাটার্জী স্মরণে এলো। খাল পাড়ের অনাথ আশ্রমের শ্রদ্ধানন্দ মহারাজও তো নানা রোগে ভুগছিলেন, অনেক দিন হল। তল্লাটের প্রথম বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার বেচুরাম বাগের বয়স এখন কত? পৈত্রিক সূর্যকান্ত পাঠশালাকে যিনি মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত করেছিলেন সেই তারকনাথ পাল এখনও বেঁচে আছেন কী? একের পর এক খগেন উকিল, হরেন ডাক্তার,

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-শ্রী কমল সানি, গানের মাস্টার আশু ঘোষ এবং এরকম আরও অনেককে মনে পড়ল।
রূপেন কৌতূহলী হয়ে উঠছিল। পায়ে পায়ে গিজ গিজ ভিড় কাটিয়ে মরদেহটির কাছে পৌঁছে গেল। একখানা দামি খাটের ওপর মরদেহটির চোখ নাক মুখটুকুই যা বেআব্রু। বাকি সব ফুল মালা বোকেট গার্লিং-এর ঢাকা। ভুলিনি-ভুলব না, অমর রহে, মৃতহীন প্রাণ ইত্যাদি আবেগ লিখেছে ক'জন। সংগ্রামী জগাদার উদ্দেশে সেলাম, শ্রদ্ধা, নমস্কার জানানো কাগজ, কার্ড গাঁথা একাধিক। কে এই জগাদা? রূপেন অনেক চেষ্টা চালিয়েও জগদীশ, জগন্ময়, জগদানন্দ ইত্যাদি নামের চেনা পরিচিত কোন ব্যক্তির মুখের আদলের মিল খুঁজে পেল না। সবশেষে হঠাৎই আর এক জীবনলালকে মনে পড়ল। মোটামুটি মিলও দেখল।
ফুল শোলার কাজের কারবারি সত্য মালাকার থাকত রেল স্টেশনের কাছেই লাইন ধারে। রেল জমির ওপর গড়েছিল টালির দোচালা ঘরবাড়ি। সাধাসিধা খেটেখাওয়া মানুষ। ফুলমনা সেই বাপের ছেলে জীবনলাল ছয় ক্লাস অব্দি পরীক্ষায় ফার্স্ট হত। হঠাৎ কি মতিগতি হল, স্কুলের নাম করে বেরিয়ে হিজল বনে বখা ছেলেদের আড্ডায় দিন কাটাত। ফেল করে আর লেখাপড়া করল না। সত্য ধরে বেঁধে রেখে বাপ ঠাকুরদার রুজি রোজগারের পথ ধরাতে চেষ্টা করলে কি হবে, জীবনলালের মন ছিল না।
চড়েবড়ে খেয়ে বেড়ে উঠছিল জীবনলাল। হঠাৎই সত্য মারা গেল। পেটে টান পড়তে জীবনলাল চুরি চামারি শুরু করল। লোক ঠকাতে ঠকাতে ওর আসল নামটাই একসময় হারিয়ে গেল। নতুন নাম হল জগা। যৌবনকালে জগা হয়ে উঠল তল্লাটের আতঙ্ক বিশেষ। রেলের পরিত্যক্ত কেবিনঘর হল ওর ঠেক।
জগা হেন কুকাজ নেই যা করত না। রেলের ওয়াগন ভাঙত, জমি জবর দখল করত, মারদাঙ্গা খুন জখম লুঠপাট ওর কাছে জলভাত। স্টেশন চত্বরে পেল্লাই কালীপূজা করত। যে কোন উপলক্ষ্যে মোটা অংকের চাঁদা তুলতে জুলুমবাজির অন্ত ছিল না। নেশাটেশা নস্যি ব্যাপার হলেও তল্লাটের মেয়েদের কোন বেইজ্জতি করত না।
পরের দিকে পাল্টে গিয়েছিল জগা। ব্যাঙ্ক কলোনিতে নজরকাড়া বাড়ি করে বিয়েথা করেছিল। গাড়ি কিনেছিল। ছেলেমেয়েদেরকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াচ্ছিল। তেলের ট্যাঙ্কার, বাস, মিনিবাস আরও কিসবের ব্যবসা করছিল। সেই সুবাদে রোটারি ক্লাবের সদস্যও হয়েছিল।
মোদ্দা কথা, জগা প্রকাশ্যে এমন কোন কাজ করত না যাতে কুনজরে পড়তে পারে। কিন্তু ওর মদতে চেলা চামুন্ডারা সচলই ছিল। অনেকের ধারণা, জগা গোপন বখরাও পেত।
এর পরের খবর রূপেন জানে না। পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি বিক্রি করে কলকাতায় স্থায়ী ঠিকানা গড়ার পর থেকে এদিকে আসাই হয় না। এক, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে; নয়ত, বন্ধু জীবনলালের টানে যেটুকু সময় যা আসা থাকা।
ফুল অগুরু অডিকোলন আর ধূপের সুবাস ছাপিয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অন্য এক তীব্র কটু ঝাঁজাল গন্ধ। রূপেনের অস্বস্তি লাগছিল। বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে পিছু হটে ভিড় থেকে বেরিয়ে এলো।

শিবু হালদারের ছোট ছেলে জিতু জিওল গাছের ছায়ায় জটলার মধ্যে বসেছিল। রূপেনকে দেখতে পেয়ে উঠে এসে সম্মুখে দাঁড়াল, খবরটা তাহলে তুমিও পেয়েছো? জন্ম ভিটে ছেড়ে গেলে কী হবে, প্রাণের টানটা দেখছি ঠিকই আছে।
জিতুকে অপ্রকৃতিস্থ ঠেকল। ওর মুখ থেকে বদ্‌গন্ধে রূপেন বিব্রত হল। কোন জবাব না দিয়ে পালিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইল। কিন্তু পা বাড়াবার আগেই আরও জনকয়েক চেনামুখ ওকে ঘিরে ধরল। ওদের ধারণা, রূপেন একজন রিপোর্টার হিসেবে নিউজ কভার আপ করতে এসেছে। তাই জনে জনে রকমফের ভাষা ব্যবহারে সুপারিশ করল যাতে আগামীকালের খবরের কাগজে ওদের নয়নের মণি গরীবের মা-বাপ জগাদার মর্মান্তিক খুন-খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়।
ঘেরাও মুক্ত হয়ে কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই হিতেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এদিক সেদিক আড়াল থেকে সতীন্দ্র জীবেশ রণেন্দুও কাছে এসে দাঁড়াল। সকলকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে রূপেন ক্ষোভ জানাল, আশ্চর্য বন্ধু তোরা! জীবনলাল প্রায় বিনা চিকিৎসায় মরে গেল। ওর বাসায় এসে দেখলাম তোরা কেউই যাসনি। এখানে যে দূরে ওই নিমগাছের নিচে ওর ডেড বডিটা পড়ে আছে শুনেছিস নিশ্চয়ই। গিয়েছিলি কেউ? জগা তোদের কাছে জীবনলালের চাইতেও বড় হয়ে গেল?
জীবেশ প্রথম মুখ খুলল, ফোনে তোকে খবরটা কে দিল? আমার কাছ থেকে খবর পেয়ে তবেই না ছুটে এসেছিস। ওর কতটুকু কি খবর রাখতিস যে এখন মরার পর এসে এত দরদ দেখাচ্ছিস?
সতীন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থনে বলল, ওর অভাব অনটনের কথা আমি জানতাম বলেই যেচে ওর ছেলেকে একটা কারখানায় চাকরি দিতে চেয়েছিলাম। শুনে ওর আত্মসম্মানে চোট লেগেছিল। বলে কিনা, শ্রমিক নেতার পাওয়ার দেখাতে এসেছিস? সেই থেকে ওর বাসামুখো হতাম না। জীবদ্দশাতেই যখন যেতাম না তো মরার পর লোক দেখানো ন্যাকামি করতে যাব নাকি?
হিতেন খোলা মনে শোনাল, পার্টি করি বলে জনসংযোগ সমর্থন আমার খুবই দরকার হয়। ওর ফ্যামিলি যে কোন পার্টির সমর্থক বুঝতাম না। ওর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল আমার। কিন্তু গত পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমি যখন একজন ক্যান্ডিডেট তাজ্জব কান্ড করে বসল ও। আমার বিরুদ্ধ পার্টি দেওয়ালে দেওয়ালে এমন সব এফেকটিভ ছড়ায় ছয়লাপ করল যেগুলি ওর লেখা। ওকে গোপনে জিগ্যেস করলাম, তুই কী আমার সব্বোনাশ চাইছিস? তা নাহলে পাবলিক ক্ষেপাতে ওইসব ছড়া লিখে সাহায্য করছিস? উত্তরে ও যা বলল তাহল, ছড়াগুলি ইলেকশান পারপাসে লেখেনি। বিভিন্ন সময় নানা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বিরুদ্ধ পার্টির লোকেরা সেগুলি সুযোগ বুঝে কাজে লাগিয়েছে মাত্র। বিশ্বাস কর ওর ওপর আমার কোন রাগ ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু আমি ওকে নির্দোষী জানলে কী হবে? পার্টির লোকেরা সেই থেকে ওকে শত্রু মনে করত। তাইতো মন টানলেও ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখতাম না। দূর থেকে ভালবাসতাম। আর সেজন্যই এখানেও টেনশনে আছি।
টেনশন কেন? রূপেন জানতে চাইল।
দূর থেকে দেখছিতো ওর ডেড বডির সঙ্গে আঙুলে গোনা ক'জন মাত্র শ্মশান বন্ধু এসেছে। ওই পর্যন্তই থাকলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু, বিরুদ্ধ পার্টির লোকেরা যদি পলিটিক্যালি অনার জানাতে

শ্মশানে এসে হাজির হয় তাহলেই মুশকিল। জগাকে কে বা কারা খুন করেছে জানা না গেলেও সন্দেহটা ওদিকেই। কাজেই সন্দেহভাজন কেউ একজন এলেও রক্ষে নেই। জগার মতো একখানা শক্ত হাত চলে গেলে কিভাবে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয় তা আমি হয়ত জানি, ওরা জানবে কেমন করে?
রূপেন প্রসঙ্গ পাল্টাল, জীবনলাল তো বরাবরই রোগাটে ছিল। বড় অসুখ টসুখতো কখনও হতে দেখিনি। দিব্যি পরিশ্রম করত, যা আমরা অনেকেই পারি না। একমাস আগে শেষ দেখা হওয়ার সময়তো কোন অসুখ টসুখ আছে মনে হয়নি। হঠাৎ এমন কি হয়েছিল যে মরেই গেল?
রণেন্দু এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার ভেজা গলায় বলল, তোরা সবাই ওর ওপরটাই শুধু দেখেছিস তাই ভেতরে তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়াটা ধরতে পারিসনি। ডাক্তার সরকারও সেই ভুলটাই করেছেন। অনেকদিনের চেনা জানা বলে মনে করতেন টুকটাক পেটের ব্যামো সর্দিকাশি জ্বরজারি তো ওর হয়েই থাকে। কোনদিন থরোলি চেক আপ করানো দরকার মনে করেননি। যখনি গেছে পেটেন্ট কিন্তু ওষুধ দিয়েই বিনা ফিতে চিকিৎসার দায় সেরেছেন।
এতই যদি জানতিস তো তুই কি করেছিস? রূপেন অভিযুক্ত করে বলল, যতদূর জানি ও ছিল তোর জীবনে প্রধান পরামর্শদাতা, বন্ধু, আবার গার্জেনও। একমাত্র তোর সঙ্গেই শেষঅব্দি ওর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কন্ট্রাকটরি ব্যবসা করে তোর তো টাকাকড়ির অভাব ছিল না কোন।
টাকাকড়ি থাকলেই বুঝি সব হয়? রণেন্দু রুক্ষ গলায় বলল, প্রায় হাফ পেন্টুল বয়স থেকে মেলামেশায় যতটুকু জেনেছি তাতে বুঝেছিলাম, দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটনে ও ছিল অবিচল উদ্বেগহীন। অনেকেই ভুল করে বলে, ওর নাকি কোন দম্ভ ছিল না। নিরহংকারী ছিল। আমি বলব, দারিদ্র্য নিয়ে ওর দারুণ অহংকার ছিল। আর দাম্ভিক ছিল বলেই জীবন মরণকে ভৃত্য বিশেষ ভাবত। নয়ত কী? অসুখে বিছানায় পড়ে আছে শুনেই ছুটে যেতে কত সহজে বলল, এবার আমি চল্লাম। দম্ভ আমারও কম ছিল না। ওর শরীরের খুঁটিনাটি কষ্ট সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে সবজান্তার মত বললাম, কেন বাজে বকছিস? সুখী লোকেরা দুম করে চলে যায়। তুই তো আজন্ম লড়াকু। তুই আরও লড়বি। আমি হলপ করে বলতে পারি, এখনও অনেক বছর বাঁচবি।
তারপর কি করলি? হাতে সময় কম থাকায় রূপেন ব্যস্ত হয়ে উঠল।
আমি ওর চিকিৎসার জন্য সবরকম সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে চাইলাম। শুনে ও মিটমিট করে হাসল। তারপর বলল, প্রয়োজন হলে তোকে নিশ্চয়ই জানাব। তুইতো আমার সবচেয়ে কাছের আপনজন।
রণেন্দুর চোখ ছলছল করে উঠল। ভাবাবেগ আয়ত্তে আনতে একটু সময় নিল। তারপর চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, পরপর পাঁচদিন ওর খোঁজ নিতে গেলাম। বড় ডাক্তার দেখাতে চাইলাম। কলকাতায় নার্সিং হোমে ভর্তি করাব বললাম। শুনে এমন হাসত, যেন ওর কিছুই হয়নি। আমার সবকিছু ইচ্ছা অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়ে বলত, দরকার হলে তুইতো আছিস জানিই। সীমার আনা কোবরেজের ওষুধ খেয়ে ভালইতো আছি। সামনে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা। ওদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছেরে।
সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি ওকে বোঝালাম, তোর এখন কমপ্লিট রেস্ট দরকার। সারাটা জীবন শুধু অন্যের কথা ভেবে ভেবে নিজেকে শেষ করে বসেছিস।

রণেন্দুর বাক্‌রুদ্ধ হয়ে এলো। অস্পষ্ট গলায় বলল, কাল আমাকে শেষ কথা কি বলেছিল জানিস? বলে কিনা তুইতো দেশের কত জায়গায় বেড়াতে যাস। কত সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিস, যাইনি। ভাবছি এবার যাব।
বেশ তো। আমি খুশি মনে বললাম, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ। তারপর সমুদ্র থেকে পাহাড় যে কোন জায়গায় যেতে মন চায় বলিস। আমি নিজে তোকে যত্ন করে নিয়ে যাব। দেখভাল করব।
রণেন্দু শিশুর মতো কেঁদে ফেলল। চাপা রাগ অভিমান ক্ষোভ জানাল, একটা রাত পার হতে দিল না। দাম্ভিক না হলে ওভাবে চলে যায় কখনও?
হিতেন ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, এভাবে ভেঙে পড়লে চলে কখনও?
এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দিয়ে রণেন্দু ফোঁস করে উঠল, আমার বুকের ভেতর যে কেমন করছে তা তুই বুঝবি না। ও ছিল মাথার ওপর বিশাল ঝাঁকড়া গাছের মতো। সেই গাছ-মানুষটাকে হারিয়ে কী যে ক্ষতি হয়ে গেল সে শুধু আমিই জানি।
হিতেনও দুর্বল হয়ে পড়ল। নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি শোনাল, রাজনীতির ঘোলাজলের দরুণ দায়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু ওর মতো সুজন হারিয়ে আমার কষ্টই কী কম হচ্ছে?
হিতেনকে সমর্থন করে সতীন্দ্র বলল, জীবনলালের চোখ দিয়ে পৃথিবীর অনেক কিছু সুন্দর দেখতে পেতাম। ওকে হারানোয় সেই চোখ দু'টো চলে গেল। কষ্ট হচ্ছে আমারও।
জীবেশ ওর সত্য উপলব্ধি ব্যক্ত করল, এখন আমার চেনাজানা আত্মীয় বান্ধব পরিচিত বিস্তর। কিন্তু ওদের মধ্যে সত্যিকার মানুষ ক'জন? সকলের সঙ্গেইতো কমবেশি স্বার্থের সম্পর্ক। একমাত্র জীবনলালই ছিল ব্যতিক্রম। ওকে হারিয়ে মনে হচ্ছে, যেন অমূল্যরতন খোয়ালাম। এমন অবস্থায় কার না দুঃখ হয়? কিন্তু কার কাছে দুঃখ জানাতে যাব।
শোকতাপ দুঃখ কষ্ট জানাবার জায়গা এখনও আছে। রূপেন সবাইকে বোঝাল, এককালে সকলে মিলে গাছের মতো জড়াজড়ি করে বেড়ে উঠেছিলাম। শেষবারের মতো চল না গিয়ে নিমের নিচে ওর মরদেহ ঘিরে আনত দাঁড়াই। যার যা বলার ওকে বলি।
কেউই অমত করল না। জীবনলালের মরদেহ ঘিরে এখন ওরা পাঁচ বন্ধু। নিরুচ্চার কে কি বলল অন্যজন জানল না। রূপেনের কেবলি মনে হচ্ছিল, আমৃত্যু হারতে রাজি ছিল না বোধহয় জীবনলাল। যে যতই বলুক, ওকে হারিয়েছি। আসলে, সবাইকে হারিয়েছে জীবনলাল।

সুসংগঠিত সত্য এখন

আজ পঞ্চম দিন।

দিল হি তো দিয়া। প্যার হো গয়া। কহনা প্যার হ্যায়। আয়েঙ্গা......লে জায়েঙ্গা......শাদি করুঙ্গা—ইত্যাকার গুটিকতক হিন্দি ফিল্মি গান লাউড স্পীকারের উচ্চ উৎকট শব্দে ঘুরে ফিরে বেজেই চলেছে। বার বার। হাজার বার।

রামকৃষ্ণ সুইমিং ক্লাবের পরিচালনায় সর্বজনীন দুর্গাপূজা থেকে সন্তোষীমা-র আরাধনা, কিছুই বাদ যায় না। এখন চলছে বাণীবন্দনা।

সত্যসুন্দর কোলকাতার উপকণ্ঠে এই পাড়ায় নবাগত। তবু জানেন, ক্লাবটির প্রতিষ্ঠাতার নাম রামকৃষ্ণ নয়। সাঁতারপ্রেমী অকৃতদার প্রয়াত অতুলচন্দ্র আদক ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। স্বাস্থ্যই সম্পদ-এ বিশ্বাসী। ওঁর উদ্দেশ্য ছিল, ছেলেমেয়েদেরকে স্বাস্থ্যসচেতন শৃঙ্খলাপরায়ণ শক্ত সমর্থ আদর্শবাদী করে গড়ে তোলা। সেইসঙ্গে ওরা হয়ে উঠবে সংস্কৃতিমনা। অর্থাৎ কিনা অতুলচন্দ্র সত্যিকার মানুষ তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

অতুলচন্দ্র প্রাথমিক পর্বে সাঁতার শেখানো দিয়ে ক্লাব শুরু করেছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে নিজেই শেখাতেন। ফি বছর ঘটা করে গঙ্গাবক্ষে সাঁতার প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে মণিমেলা ব্যায়ামাগার স্কাউটিং বকসিং কুস্তি ইত্যাদি বিভাগ খুলেছিলেন। সীমিত সামর্থ্যের লাইব্রেরীও চালু করেছিলেন একটা।

তাহলে, রামকৃষ্ণ কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্মরণে? সত্যসুন্দরের অনুমান, অতুলচন্দ্র সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণ, ঋষি অরবিন্দ আর বীরেশ্বর বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। কেবলমাত্র এই তিন মহাপুরুষের বাঁধানো ছবিই সত্যসুন্দর ক্লাব লাইব্রেরীর দেয়ালে দেখেছেন।

তো প্রয়াত অতুলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সেই রামকৃষ্ণ সুইমিং ক্লাব এখন নতুন প্রজন্মের দখলে। অবশ্যই কালের তালে তাল মিলিয়ে চরিত্র বদলেছে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়।

সত্যসুন্দরের ধারণা, এখনকার সদস্যরা অধিকাংশই সাঁতার জানেনা। ওদের দেহের গঠন ও মুখশ্রী দেখে মালুম হয়, কেউই তেমন স্বাস্থ্যসচেতন নয়। ওদের যা কিছু খেলাধূলা তা তাস আর ক্যারামেই সীমাবদ্ধ। সর্বোৎকৃষ্ট বিনোদনের জন্য রঙিন টিভি আছে। টিভিটা দু'নম্বরী এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ভীতিপ্রদর্শনলব্ধ। একই কারণে এই এলাকায় টিভি কেবল সম্প্রসারণ ব্যবসায়ী মাগনা লাইন জুড়ে দিয়েছে। যে রাজনৈতিক দাদার হয়ে ভোটের সময় ক্লাবের ছেলেরা উল্টাপাল্টা কাজ করে তার ভরসায় বেআইনি এ্যাঙ্কারে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়। আর দশটা এহেন ক্লাবে ইদানীং যেসব অসামাজিক কাজকর্ম চলে এখানেই বা বাধা কিসে।

সত্যসুন্দর শহর কোলকাতার গলি ঘিঞ্জির প্রায় খণ্ডহার বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন। চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে এখানে ঝিলের ধারে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে হালে ছোট্ট বাড়ি তৈরি করে এসেছেন। এখন বাড়ির বহির্বারান্দা থেকে ক্লাবের চমকদার পূজা-প্যাণ্ডেল সুস্পষ্ট নজরে আসছে। কিন্তু হালফিল ফ্যাসানে সুমুখ প্রবেশদ্বারে পর্দা ঝোলানো থাকায় মণ্ডপের মৃৎ-মূর্তি দেখতে পারছেন না। সেজন্য বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। কেননা, বেসামাল অবস্থায় ক্লাবের ছেলেরা

যখন সাড়া জাগিয়ে নিয়ে আসে তখন দেখেছেন। আদৌ দেবীমূর্তি মনে হয়নি। যেন মদাসলা ফিল্মি নায়িকা গড়েছে মৃৎশিল্পী। যেমনটি হয়ে থাকে আজকাল। বিরূপ সমালোচক সত্যসুন্দরের বক্তব্য, এরকম মূর্তি দেখে দেবী অথবা মাতৃজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা আসে কখনও!
এখন প্যাণ্ডেলের সুমুখে বৃত্তাকালে সাজানো বাহারিপাতার গাছের একাধিক টব। সেই বৃত্তের ভেতর চুল চোয়াল পোশাকে দৃষ্টিকটু ক'জন অচেনা যুবক সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ক্যাসেট-গানের তাল বেতালে অশালীন যৌন আবেদনমূলক ঢঙে নাচনকোদন করছে। শ্রুতিকটু কর্কশ শিস দিচ্ছে।
ওরা কারা?
তোমরা কারা? এই প্রশ্নটাই সত্যসুন্দর প্রথম সাক্ষাৎকালে জিগ্যেস করেছিলেন।
ওরা দলবদ্ধ হয়ে খোলামাঠের জলসার জন্য চাঁদা নিতে এসেছিল।
পাড়ার ছেলে। প্রথমজন বলল, বিপদে আপদে আমরাইতো আপনার বল ভরসা।
খুউব ভাল। বিলে আড়াই হাজার টাকা অংক লেখা দেখে অবাক সত্যসুন্দর বললেন, তাই বলে এ্যা-ও-তো!
প্রথমবার, তাই এ্যাডমিশান ফি-টা ধরায় একটু বেশি মনে হচ্ছে। দ্বিতীয়জন আরও যুক্তি জুড়ল, জমি কিনলেন। খুবসুরত বাড়ি বানালেন। ট্যাক্‌সো নেইনি। আমাদের লোকের কাছ থেকে মাল মেটিরিয়ালস্ নিতে বাধ্য করিনি। কোনওরকম বাগড়া দেইনি।
আমরা ওসব ধান্দাবাজিতে নেই। তৃতীয়জন অভয়বাণী শোনাল, আমাদের এলাকা বিলকুল পিসফুল।
আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী। প্রথমজন ফের বলল, আশা করি আপনিও?
সুতরাং, এখন এত টাকা রেডি না থাকলে কবে আসব বলুন। দ্বিতীয়জন মস্তানি ঢঙে বলল, আমরা চুপচাপ ভদ্রলোকের মতো চলে যাব। নৈলে—
নৈলে কি? প্রচ্ছন্ন হুমকিতে প্ররোচিত হয়ে স্বভাব-প্রতিবাদী সত্যসুন্দর চোয়াল শক্ত করলেন।
এমন বোকা প্রশ্ন করলেন মাইরি। প্রথমজন খোলস ছেড়ে বেআব্রু হল, যেন প্রমোটার মস্তান তোলাবাজ আর কিডন্যাপারদের কোলকাতার নয়, চাঁদ থেকে এসেছেন আপনি।
তোমরা এখন এসো। বিরক্ত ক্ষুব্ধ সত্যসুন্দর বললেন, জরুরি কাজে এক্ষুণি আমাকে একবার কোলকাতায় যেতে হবে।
তা যান। তৃতীয়জন পরোয়ানা পেশ করল, সামনের হপ্তায় যে কোনও একদিন আসব। সেদিন যেন আবার চেকফেক ঠ্যাকাবেন না। নো কিস্তি। নো ডিউ। পুরোটাই ক্যাশ চাই।
ক্যাশই দেব। সত্যসুন্দর স্বর নরম করলেন, কিন্তু আমার সামর্থ্যটা আশাকরি তোমরা বিবেচনা করবে। আমার তো কোনও পেনশন টেনশন নেই। যা পেয়েছি তার অনেকটাই জমি বাড়িতে খরচ হয়ে গেছে। এখনও মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি। স্ত্রী বারোমেসে রোগী। পোস্ট অফিসের টাকার সুদে সংসার চালানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যাহোক কিছু একটা চাকরির চেষ্টায় আছি। সেজন্যই এখন কোলকাতায় যাব।
ঠিক আছে, ঠিক আছে। প্রথমজন কিছুটা ছাড় দিয়ে বলল, অত ফিরিস্তি শুনিয়ে লাভ নেই। পাক্কা দু'হাজার দেবেন। আরও কমাতে চাইলে ওই আড়াই নিয়েই ছাড়ব। ও কে।

সে যাত্রায় সত্যসুন্দরের কোলকাতায় যাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সুতরাং পাঁচশ টাকার বেশি চাঁদা দেয়া সম্ভব ছিল না। সেই নিয়ে বাকবিতণ্ডা তিক্ততার চূড়ান্ত। সাতপাঁচ অশুভ আশঙ্কায় একহাজার দিতে ক্লাবের ছেলেরা নিয়েছিল বটে কিন্তু বাকিটা চাকরি পাওয়ার পর দিতে হবে বলে গিয়েছিল।

চাকরি পেলেও সত্যসুন্দরের পক্ষে আরও একহাজার টাকা চাঁদা দেওয়ার মতো বেতন ছিল না। মুখের কথায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট। কাজ বলতে বড় বাজারের এক ব্যবসায়ীর দু'নম্বরী হিসাবের খাতায় গোজামিল লেখালেখি। মাসান্তে আড়াই হাজার টাকা প্রাপ্তি। যাতায়াত গাড়িভাড়া টিফিন হাতখরচ বাদ দিলে দু'হাজার টাকা সংসারখরচে জমা পড়ে। একহাজার টাকা চাঁদা দিলে থাকে কি!

সত্যসুন্দর বাবা বাছা সম্বোধনে যথেষ্ট বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ওরা তবু নাছোড় অবুঝ। বাধ্য হয়ে সত্যসুন্দর একদিন বললেন, আমাকে মেরে ফেললেও পারব না। প্লীজ আমাকে রেহাই দাও। নয়তো বাধ্য হয়ে বাড়িটা বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যাব।

ব্যস্, সত্যসুন্দরের শেষোক্ত কথার সূত্রে সম্ভবত ক্লাবের ছেলেদেরকে কোনও জমিবাড়ি কেনাবেজার কারবারি প্ররোচিত করে থাকবে। নৈলে প্রতিদিন গভীর রাতে জানলার কাচে ঢিল পড়া শুরু হল কেন! একের পর এক কাচ ভাঙছে আর সেখানে সত্যসুন্দর পিসবোর্ড জুড়ছেন। সামর্থ্য কোথায় যে নতুন করে কাচ লাগাবেন। তাছাড়া, নতুন করে লাগালেও তো ফের ভাঙবে। উদ্বেগ আশঙ্কা আতঙ্ক অস্থিরতায় সত্যসুন্দরের ঘুম উবে গেল।

বেণু ব্যানার্জি পাড়া উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান। সদালাপী যথার্থ সজ্জন ব্যক্তি। পথেঘাটে সকলের সঙ্গে যেচে কথা বলেন। সেভাবেই সত্যসুন্দরের সঙ্গে পরিচয়।

কেমন আছেন সত্যবাবু? একদিন বাজারে দেখা হতে বেণু অমায়িক হাসিমুখে জিগ্যেস করলেন, বাড়ির সবাই কুশলে তো? আপনার স্ত্রী এখন কেমন আছেন?

ভাল না। সুত্যসুন্দর বিমর্যমুখে জানালেন, কিডনিতে স্টোন ধরা পড়েছে। হোমিওপ্যাথিতে কাজ হচ্ছে না। অপারেশন ছাড়া গতি নেই।

করিয়ে নিন। কিডনি কিংবা গলব্লাডারে স্টোন তো আজকাল আকছার হচ্ছে। অপারেশান জলভাত ব্যাপার। ভয়ের কিছু নেই।

সেতো বুঝলাম। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলাম, কমপক্ষে তিরিশ হাজার টাকার ব্যাপার। অত টাকা কোথায় পাব!

আপনাদের এই এক দোষ। নিশ্চয়ই নার্সিং হোমে খোঁজ নিয়েছেন। আরে মশাই, হাসপাতালে ভর্তি করে দিন। একই যন্ত্রপাতি। চিকিৎসাও একই হবে।

সেখানেও তো শুনেছি জানাশোনা না থাকলে পাত্তা পাওয়া যায় না। আছে তেমন কোন হাসপাতালে আপনার জানাশোনা?

অবশ্যই আছে। বেণু ভরসা দিয়ে বললেন, যে হাসপাতাল আপনার পছন্দ বলবেন। ব্যবস্থা করে দেব।

যে কোনও হাসপাতাল?

হ্যাঁ হ্যাঁ। সর্বত্র আমাদের সংগঠন আছে। ইউনিট সেক্রেটারিকে বলে দিলেই হয়ে যাবে। কোলকাতায় তো শ্মশানেও আমাদের সংগঠন আছে। অর্থাৎ কিনা আগমন থেকে গমনক্ষেত্র অব্দি আমরা

সর্বত্র জনগণের সঙ্গে আছি। কিন্তু কথা হল, আপনি আমাদের পার্টির সমর্থক তো? পাড়া উন্নয়ন কমিটির সদস্য হয়েছেন?

আজ্ঞে না।

বিশু নন্দীকে পাঠিয়ে দেব। হয়ে যাবেন।

বিশু নন্দী তিনখানা রসিদ কেটে সাকুল্যে তিনশ' পঁচিশ টাকা হাতে গুণে নিয়ে বললেন, মাসে পঁচিশ টাকা করে পাড়া উন্নয়নের চাঁদা দিয়ে দেবেন। আমাদের মিটিংটিটিং-এ যাবেন। জনসংযোগ রাখাটা খুবই জরুরি। এখন আর নিজের মনে একলা চলার দিন নেই। পাঁচ আঙুল সংঘবদ্ধ হলে তবেই তো মুষ্টি-শক্তি। ঠিক কিনা?

বিলক্ষণ। সত্যসুন্দর বেফাঁস বলে বসলেন, সেটাতো আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

কিরকম? বিশু প্রতিক্রিয়াহীন জানতে চাইলেন, এখানে কি আপনার কোনও প্রব্লেম হচ্ছে?

বড্ড আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে আমাকে। সত্যসুন্দর কাচ ভাঙার বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন, আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন কে বা কারা এসব করছে। আমি ভীষণভাবে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।

আমাদের পাড়া উন্নয়ন কমিটির তো নাইট ওয়াচ পার্টি আছে, তা সত্ত্বেও! বিশু নন্দী ঈষৎ ভুরু কুঞ্চিত করে কিছু একটা ভাবলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, রামকৃষ্ণ সুইমিং ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে আপনার রিলেশান কেমন? চাঁদা-টাঁদা দেন ঠিকমতো?

ঠিক ধরেছেন। সত্যসুন্দর চাঁদা-বৃত্তান্ত শুনিয়ে কাতর অনুরোধ জানালেন, দয়া করে আপনারা যদি আমার এই সমস্যার সুরাহা করে দেন তো চির কৃতজ্ঞ থাকব।

নো প্রব্লেম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সদস্যদের যে কোনও সমস্যার সমাধান করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। তবে কি জানেন, সব সমস্যার সমাধান সহজপথে হয় না। সমস্যা আমাদেরও অনেক। এই কেসটা অন্যভাবে ডিল করতে হবে। তাতে আপনারও ভূমিকা থাকবে।

বলুন, কি করতে হবে আমাকে?

আপনি এ পাড়ায় এসেই আমাদের কমিটির সদস্য হলে এমন ঘটনা ঘটত না। সে যাই হোক, ভুল যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমাদের সদস্য হওয়ায় একটা ভুল তো সংশোধন হয়েই গেল। দ্বিতীয় সংশোধনটাও আপনাকে দিয়েই করাতে পারলে ভাল হয়। ওই সব ছেলে ছোকরাদেরকে হাতে রাখা আমাদেরও দরকার হয়। তাই প্রথমেই আমরা কঠোর হতে চাই না। প্ল্যানমতে আপনি ব্যর্থ হলে আমরা তো আছিই। নো প্রব্লেম। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

বললাম তো, আমি প্রস্তুত।

তাহলে আমি ওদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে যা বলবার বলব। তারপর আপনি একদিন নিজে থেকে ওদের ক্লাব-সেক্রেটারি চাকু মণ্ডলকে বাড়িতে একা দেখা করতে বলবেন।

সে আবার কেমন মেজাজের ছেলে? সত্যসুন্দরের চোখ মুখে আতঙ্ক।

আপনি চেনেন। চাঁদা চাইতে আসা দলে ছিল। সব চাইতে লম্বা রোগা ছেলেটিই চাকু। মানুষ হিসেবে ওরা কিন্তু কেউই খারাপ না। সবাই বেকার। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অবক্ষয়ের ফসল। খাতির করে বসাবেন। একটু আপ্যায়ন করবেন। তাহলেই অন্য চাকুকে দেখতে পাবেন।

তা নাহয় করলাম। তারপর?

শ' পাঁচেক টাকা চাকুর হাতে দিয়ে বলবেন, গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের দিন অনাত্মীয় লোকজন খাওয়ানোর সামর্থ্য ছিল না। এটা দিয়ে তোমরা খানাপিনা কোরো। ব্যস দেখবেন, সব প্রব্লেম সলভ্ হয়ে যাবে। আরও এক হাজার টাকা দাবি তো করবেই না, বরং যে কোনও বিপদ আপদে ওরাই প্রথম আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে।

হ্যাঁ। চাঁদা চাইতে এসে একজন বলেছিল বটে, আমরাই তো আপনার বল ভরসা।

তাহলেই বুঝুন। এমন ছেলেগুলিকে আপনি একটু ভালবাসা দেবেন না! আরে মশাই, ভালবাসার বিনিময়ে সব কিছু পাওয়া যায়।

ভালবাসার বদলে বলুন, টাকায়। আজীবন স্পষ্টবাদী নির্ভীক সত্যসুন্দর বললেন, এটাই এখন বাস্তব আমার অভিজ্ঞতা।

টাকাটা তো মাধ্যম মাত্র। বিশু নন্দী বিরূপ প্রতিক্রিয়াহীন স্নিগ্ধ হাসলেন, সাহায্য সহযোগিতা দান উপহার ইত্যাদির মাধ্যমেই তো ভালবাসাটা টের পাওয়া যায়। আপনার একান্ত আপন স্ত্রী কন্যাকে কিছু না দিয়ে শুধু ভালবাসি ভালবাসি বললেই চলে?

আপনার সাথে কথায় পারব না আমি। আলোচনায় ইতি টানতে সত্যসুন্দর জিগ্যেস করলেন, চা খাবেন আর এক কাপ?

নাহ্। উঠে দাঁড়িয়ে বিশু নন্দী বললেন, আমিও তো রিটায়ার্ড পার্সন। আসব আর একদিন। চুটিয়ে গল্প করা যাবে। চায়ের সঙ্গে টা-ও খেয়ে যাব। তখন দেখব, মাধ্যমে আপনি কতটা ভালবাসেন।

তো সেই বিশু নন্দীর পরামর্শমতো নতুন ধারায় জীবনযাপনে সত্যসুন্দর এখন ঝুটঝামেলামুক্ত। নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত। রামকৃষ্ণ সুইমিং ক্লাবের ছেলেদের আচরণও বিলকুল পিসফুল। ওরা এখন সত্যিই প্রধান বল ভরসা। মেয়ের অফিস যাতায়াত পথ নিরাপদ। বেণু ব্যানার্জির সহযোগিতায় স্ত্রীর কিডনির স্টোন অপারেশন সম্পূর্ণ সফল। সত্যসুন্দর নিজে বড়বাজারের চাকরি ছেড়ে রাজনৈতিক দলের হোলটাইমার।

সত্যসুন্দরের এখন তেমন কোনও সমস্যাই নেই। তবু ফুরফুর দক্ষিণা বাতাসে আমের মঞ্জরি আর বাতাবিলেবু ফুলের সুবাসে কিছুতেই যেন আগেকার মতো হৃদয়মন আনন্দ-আন্দোলিত হচ্ছে না। পরিবর্তে, বাণীবন্দনার মণ্ডপ থেকে ভেসে আসা লাউডস্পীকারের উচ্চকিত শব্দে বিরক্ত বিমর্ষ বিষণ্ণ। মস্তিষ্ক বুক আর দৃষ্টিতে চিনচিন প্রবাহ যন্ত্রণা। অনুভূত অবর্ণনীয় কষ্টটা হচ্ছে, বার্দ্ধক্যে এসে অনিবার্য-বাধ্য বদলে যাওয়ার জন্য।

কালের রাজা

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই সারা রাজ্যের গ্রাম গঞ্জ শহরের ঘরবাড়ি কুটিরে বিজয় পতাকা উড়ছে। প্রভূত আলোকসজ্জা বিজয় মিছিল সভা সম্বর্ধনা চলছে। নাচ গান বাজনা বাজির অন্ত নেই কোন। আবিরের ছড়াছড়ি। রঙিন কাগজের মোড়কে সাজানো হয়েছে রাজপথ গলি অফিস কাছারি আর ছোট বড় বাড়ির বাইরের বাতি। ট্রাম বাস ট্রেনে কোন টিকিট কাটার বালাই নেই।

গতকাল থেকে শুরু হয়েছে দুর্বার জনস্রোত। দূর দূরান্ত গ্রাম গঞ্জ থেকে ট্রেনে চেপে মানুষ আসছে কাতারে কাতারে। হৈ হৈ করে রাজধানী-শহরের প্লাটফর্মে নামছে। স্টেশন গম গম করছে। বাস টেম্পো ট্রাক ট্যাক্সি ম্যাটাডোর অটো রিকশাতেই আসছে অনেকে।

আজ সকাল থেকে সারাদিন মিছিলের ঢেউ ময়দানে আছড়ে পড়ছে। অজস্র মানুষ পায়ে হেঁটে আসছে। ওদের অনেকেরই অঙ্গে মলিন খাটো বস্ত্র। কাপড়ের খুঁটে বাঁধা চিড়ামুড়ি।

জমজমাট মিছিল শুরু হয়েছে দুপুর বেলা থেকে। দলীয় পতাকায় সাজানো হরেক যানবাহন। লাউডস্পীকারে সম্মিলিত মানুষের কণ্ঠে গণসঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। ট্যাবলোয় হারমনিয়ম নাল ধামসা মাদলের সমাবেশ দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে ছৌনাচের মুখোশআটা মানুষজন।

সকলেই সুশৃঙ্খল। তবু ট্রাফিক পয়েন্টগুলোয় পুলিশের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া যায় না। দলীয় জার্সিপরা শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকেরা মিলিঝুলি মিছিলের অজ্ঞ মানুষ আর বেহিসেবি যানবাহনকে সামাল দিতে তৎপরতা দেখাচ্ছে।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে অজস্র রঙিন ফানুস উড়ছে। আওয়াজের বাজি ফাটছে। দিনের আলোতেও রকেট হাওয়াই তুবড়ি উড়ছে হরেকরকম। চেনা অচেনায় আবির মাখামাখি চলছে।

দিনটা আজ জনগণের আনন্দময় মুক্তির উৎসবের।

শ্রীদীনপতি সিংহ সর্বসম্মতিক্রমে দলপতি মনোনীত হওয়ার পর নতুন সরকার গঠনের জন্য রাজ্যপালের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আজই আনুষ্ঠানিক শপথবাক্য পাঠ করে নতুন কার্যভার গ্রহণ করবেন।

রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে বহুযুগ আগে। ইংরেজ রাজত্বের দাসত্বমুক্ত স্বাধীনতা এসেছে কম বছর হল না। কিন্তু, স্বাধীনোত্তর এযাবতকাল রাজ্যের মুখ্যশাসক কর্তাব্যক্তিরা মুখ্যত রাজকুল বংশজাত ছিলেন। নয়তো অভিজাত ধনীসম্প্রদায়ভুক্ত। দরিদ্র সাধারণ পরিবারের বিলাসবিহীন সন্তান হিসেবে শ্রী সিংহই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি এই রাজ্যের শাসকশ্রেণীর মুখ্য পদটি গ্রহণ করতে চলেছেন। শ্রীসিংহকে একজন দুর্মুখও হঠাৎ নবাব বলতে পারবে না। দীর্ঘ কয়েকযুগের ত্যাগ তিতিক্ষা আর নিরলস সংগ্রামের মাধ্যমেই তিনি তিলে তিলে প্রভূত শক্তিশালী সর্বজনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠেছেন। যদিচ তিনি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসীদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল একজন, কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতায় মুখ্যপদ লাভ করেছেন। আজ ময়দানে সমবেত জনগণের সামনে খোলা আকাশের নিচে অনাড়ম্বর মঞ্চে দাঁড়িয়ে শপথ বাক্য পাঠ করবেন তিনি।

নির্বাচন-যুদ্ধে শ্রীসিংহের দলের ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতির দফা নিতান্ত কম ছিল না। প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। শোষণ ভ্রষ্টাচার বন্ধকরণ। ধনী গরিবের ব্যবধান কমিয়ে আনা। যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে মর্যাদা ও সমর্থন। পিছিয়ে পড়া অনুন্নত শ্রেণীকে সরকারি সুযোগের অগ্রাধিকার প্রদান। পুলিশরাজের অবসান। সেই সঙ্গে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সেবক মনোভাবাপন্ন মিতব্যয়ী সাধারণ জীবনধারণের দৃষ্টান্ত স্থাপন। দেশের খেটে খাওয়া দীনদরিদ্র জনগণের দুঃখকষ্টের অংশীদার হবেন ওঁরা।

স্বভাবতই জনতা আজ রঙিন আশায় আহ্লাদিত। গান গাইছে, আমরা সবাই রাজা.......। জয়ধ্বনি দিচ্ছে, দীনপতি সিংহ যুগ যুগ জিও। দীনদরিদ্রের নয়নের মণি দীনপতি সিংহ, কোটি কোটি সেলাম। দীনপতি সিংহের আর এক নাম, সংগ্রাম সংগ্রাম.....।

আপনজনদের জটলার মধ্যে দুর্জন সুখানন্দ নিচুস্বরে মন্তব্য করে বসল, এই জীবনে দেখলাম তো অনেক। তাই ডর লাগছে, লংকায় গিয়ে দীনপতিও শেষ পর্যন্ত না রাবণ হয়ে যায়।

আশঙ্কার কারণটা কি হে সুখা? সঙ্গী হারান মণ্ডলের প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ পেল।

সিংহাসনে বসলে বেবাক সিংহকেই তো শিল্পপতিদের কাছে পাল্টি গিয়ে ভেড়া হতে দেখি তাই। তুমি বেটা কুচক্রীদের দালাল। তিরিক্ষি মেজাজ দেখিয়ে কেষ্ট বাউরি বলল, গদিতে বসার আগেই বিরূপ কথাবার্তা শুরু করা উচিত হচ্ছে না। নয়া জামানায় বেফাঁস বলার আগে ভাবনাচিন্তাতো করবা! এই তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিলাম।

রেগেমেগে সুখানন্দ জবাব দেয়ার আগে জামার হাতা গোটাচ্ছিল। বিপদ বুঝে হারান সামাল দিতে বোঝাল, দীনপতি যে আর দশজন নেতার মতন না তা কি জান না! আগাম সাত পাঁচ ভাবনায় কাজিয়া থামাও।

দু'জনেই মুখে কুলুপ আঁটল বটে কিন্তু ভিড়ের ভেতর থেকে অচেনা একজন প্রশ্ন করল, রাজাবাবু কিসে আসবেন কইতে পার? উনিতো গরিবের রাজা। তো হাতিতে নিশ্চয় আসবেন না। ঘোড়ার গাড়িতেও চড়বেন না। তবে কিসে?

এট্টু পরেই দেখতে পাবা। ওদের মধ্যে থেকেই একজন বলল, কিসে আসবেন জানি না বটে। কিন্তু শুনেছি, উনি আগেকার রাজাবাবুদের মতন রাজপ্রাসাদে থাকবেন না। গরিব প্রজাদের ঘাম রক্তের টাকায় সরকারি আকাশ-গাড়িতেও উঠবেন না।

ওদের আলোচনা বেশিদূর গড়ানোর সুযোগ পেল না। কনভয়ের পাইলট কারের সাইরেন শুনে ময়দান ঠাসা আপামর জনতা সচকিত চঞ্চল উদগ্রীব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

লোকপ্রিয় শ্রীদীনপতি সিংহ আসছেন।

চারদিকে ছড়ানো লাউড স্পীকারে আগমন বার্তা ঘোষিত হল। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেল জনতার কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনি আকাশমুখি হল, সংগ্রামের সাথী দীনপতি সিংহ, যুগ যুগ জিও। যুগ যুগ জিও। দীনপতি সিংহের আর এক নাম, সংগ্রাম সংগ্রাম। দীনদরিদ্রের নয়নের মণি দীনপতি সিংহ, কোটি কোটি সেলাম।

দুর্মুখ প্রতিক্রিয়াশীল ধন্দবাজদের চোখমুখে অবাক করা ছাই ছিটিয়ে শ্রীসিংহ এলেন অতি সাধারণ একটি জীপে দাঁড়িয়ে, করজোড়ে। গাড়িতে ড্রাইভার এক পরিচিত নেতা সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবকরাই

সৈনিকের মতো দেহরক্ষী। মাথায় টুপি আর গায় জার্সি পরা বিশেষ ধরনের স্বেচ্ছাসেবকরা শৃঙ্খলা রক্ষা আর নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্যস্ত।
দলীয় কতিপয় নেতাসহ শ্রীসিংহ হসিমুখে নামলেন। পরনে অতি সাধারণ কুর্তা ধুতি। কুর্তার বুক পকেটে কলম। পায়ে টায়ার কাটা চটি। মাথায় তেলবিহীন কাঁচা পাকা চুল এলেমোলো। গালে একগুচ্ছ অযত্ন দাড়ি। চোখে হাইলেন্সের চশমা।
করজোড়ে উত্তরদক্ষিণ পূর্বপশ্চিমের জনতাকে সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানালেন শ্রীসিংহ। তারপর প্রায় দু'শ মিটার দূরত্বের মঞ্চের দিকে টগবগ পায় হেঁটে এগিয়ে চললেন। দু'ধারে লালপাড় সাদা শাড়ি পরা সারিবদ্ধ তরুণীদের কারও হাতে ফুলের পাপড়ি ঠাসা থালা। কারওবা হাতে শঙ্খ।
উল্লসিত জনতা পলাশ জবা গাঁদা গোলাপ ফুল ছুড়ছে। আবির উড়িয়ে দিচ্ছে। শঙ্খধ্বনি শ্লোগান ফুলমালা ফুলের পাপড়ি বর্ষণে শ্রীসিংহ বিব্রত বোধ করলেন। চুল চশমা পোশাকে আবির আর ফুলের পাপড়ি নিয়ে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের তুমুল হাততালি জয়ধ্বনি আর বাজি পটকার শব্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সমবেত জনতার উদ্দেশে কখনও ডান কখনও বাম হাত তুলে নাড়লেন। একসময় গলদঘর্ম ক্লান্তি অনুভব করলেন। বিশাল জনসমুদ্রের দিকে সকৃতজ্ঞ রুদ্ধ কণ্ঠে নির্বাক তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ।
শ্রীসিংহ পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী নন। তবু কেন যে প্রথাগত ক্রিয়াচার অনুসারে মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করছেন তা ব্যাখ্যা করলেন। ব্যয়বহুল বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানরীতি সবটাই বর্জন করতে অপারগ হয়েছেন বলে মার্জনা চাইলেন। সমবেত জনতা উচ্ছ্বসিত করতালি আর হর্ষধ্বনিতে জানিয়ে দিল যে, শ্রীসিংহের নীতিবিরোধী আচরণ অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না।
অতঃপর মন্ত্রগুপ্তি পাঠের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানপর্ব শেষ হল। দু'চার কথায় অভিভাষণ অন্তে শ্রীসিংহ দ্রুত মঞ্চ থেকে নামলেন। দ্রুততর ব্যস্ততায় মুখ্য ভবনের দিকে রওনা হলেন।
মুখ্য ভবনে নিজস্ব সৌখিন বিলাসবহুল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে প্রবেশ করে শ্রীসিংহ কিছুটা স্বস্তি ও আরামবোধ করলেন। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে নির্দ্দিষ্ট আরামপ্রদ গতিচেয়ারে এলিয়ে দিলেন তিনি।
গর্ব খুশিতে ডগবগ শ্রীমতি সিংহ অনেকক্ষণ দক্ষিণের খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে বিশাল জনসমুদ্র দেখছিলেন। রাজপথে সমবেত জনতার দাবিতে সাড়া দিয়ে শ্রীসিংহকে কাছে ডাকলেন।
শ্রীসিংহকে পুনর্বার সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে হল, এ জয় আপনাদের সকলের। আমি যেমন আপনাদের দুঃখ কষ্টের সাথী সমব্যথী ছিলাম তেমনটি থাকব। তবে এই সমাজ ব্যবস্থায় বড় বেশি কিছু আশা করবেন না। আগামী দিনে কেন্দ্রীয় মূল ক্ষমতা আমাদেরকে লড়াই করে কেড়ে নিতে হবে। আজ থেকেই ঘরে ঘরে সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করুন।
জনতার দাবি, শ্রীমতি সিংহকেও কিছু অন্তত বলতে হবে। দাবির মর্যাদা দিতে সকৃতজ্ঞ করজোড়ে তিনি বললেন, আমি গর্বিত ও আনন্দিত। সেই সঙ্গে ওঁর শরীর সম্পর্কে বেশ চিন্তিতও বটে। ওঁর যে মারাত্মক হার্টের অসুখ আছে তা আপনারা সকলেই জানেন। গত তিন মাস ওঁর ওপর দিয়ে যে ধকল ঝড়ঝাপটা গেছে তাতে উঁনি খুবই অসুস্থবোধ করছেন। এবার কিছুদিন ওঁকে একটু বিশ্রামের

সুযোগ দেয়া দরকার। এখনও অনেক কাজ বাকি। সেই কাজ আর দেশের মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য ওঁকে অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। আর সেই বাঁচার জন্য চাই ভাল চিকিৎসা আর বিশ্রাম। আশা করি, আপনারা সেইটুকু সামান্য সুযোগ থেকে ওঁকে বঞ্চিত করবেন না। আপনারা ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খলভাবে এবার ঘরে ফিরে যান।
শ্রীমতি সিংহ দক্ষিণের জানলাটি সপাট বন্ধ করে দিলেন। কক্ষটিতে এখন আর বাইরের কোন কোলাহল চিৎকার শব্দই আসছে না।

আজ চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উৎসবের দিন। এই দিনটিতে শ্রীদীনপতি সিংহ ময়দানে খোলা আকাশের নিচে সমবেত জনতার সামনে মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে ফি বছর এই দিনটিতে মহাসমারোহে পূর্তি উৎসব পালন করা হয়।
এবার অনুষ্ঠানটির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে অন্যান্যবারের চাইতে অনেক আগে। কোটি লোকের সমাবেশ হবে ধরে নিয়ে বিরাট উচ্চতাবিশিষ্ট সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য মঞ্চ গড়া হয়েছে। তাবুর আস্তানা আলোর রোশনাই মাইকব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত। ঢাকা মঞ্চের মাথার ওপর বৈদ্যুতিন পাখা চলছে। আলোকচিত্রের প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার স্টল খোলা হয়েছে। দূরের গ্রাম গঞ্জ থেকে যে বিশাল ভক্ত জনতা আসবে ওদের আহার নিদ্রার ব্যবস্থাও হয়েছে মোটামুটি। বরফ-ঠাণ্ডা জলের ছাউনি গড়া হয়েছে কয়েকটা।
শ্রীসিংহ ইদানীং প্রকাশ্য খোলা মঞ্চের সভায় খুব একটা উপস্থিত থাকেন না। চিকিৎসকের নির্দেশমতে শারীরিক পরিশ্রম যতটা পারেন কম করেন। ব্যবহৃত বুলেটপ্রুফ গাড়িটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। নিজ আবাসে দ্বিতলে ওঠার জন্য আধুনিক লিফটযন্ত্র বসানো হয়েছিল বটে কিন্তু সেখানে থাকেন না। এখন মুখ্যভবনের নিকটেই সরকারি বিলাসবহুল আবাসটিতে বসবাস করছেন। ফি বছর বিশ্রামের জন্য গ্রীষ্মে শৈলশিখরে আর শীতে সমুদ্র উপকূলে নির্জন বাংলোয় কিছুদিন কাটিয়ে আসেন। আধুনিক সমাজব্যবস্থা চিকিৎসা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন অথবা অনাবাসী ব্যবসায়ীদের স্বদেশমুখি করার জন্য মাঝেমধ্যেই বিদেশ সফরে গিয়ে থাকেন।
শ্রীসিংহ এখন নির্বাচিত ওষুধ সুখাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন। বিমান হেলিকপ্টার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মাঝে মাঝে বেতার দূরদর্শন আর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্ব সমাজ সচেতনতা সম্পর্কে বাণী বিতরণে সবিশেষ উৎসাহী। দেশের আপামর জনসাধারণকে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাতে ভুল করেন না।
গত চার বছর শ্রীসিংহের রাজ্যশাসন দেখে জনগণ আর আগের মতো উচ্ছ্বসিত উল্লসিত নয়। বরং বেশ কিছুটা হতাশ বলা যেতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, নতুন সরকারের নিকট প্রত্যাশা ছিল অনেক। ভেবেছিল, শ্রীসিংহের শাসনকালে দীনদরিদ্ররা সর্বাধিক উপকৃত হবে। কৃষক শ্রমিকরা উপযুক্ত সরকারি আর্থিক সুযোগ পাবে। ঘরে ঘরে বেকার সংখ্যা কমবে। শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হবে। চুরি ডাকাতি খুন ধর্ষণের বিচার হবে। সরকারি দপ্তরগুলিতে কাজের স্পৃহা বাড়বে। সর্বস্তরে দুর্নীতি শোষণ অবহেলা অত্যাচার কমবে। পরিবর্তে, সর্বত্র যথাযথ সহৃদয়

ব্যবহার পাওয়া যাবে। চুল্লু সাট্টা জুয়ার অবাধ গতি রোধ হবে। ঘোড়দৌড় নাইট ক্লাব নগ্ন-নৃত্য থাকবে না। সিনেমা নাটক সাহিত্যপত্রে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করা হবে। ভেজালদার জোতদার মজুতদার কালোয়াররা অপরাধ করে পার পাবে না। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ক্ষমতা খর্ব করা হবে। সর্বোপরি শান্তি ও আইনরক্ষক পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী কর্মচারী ও দলপ্রতিনিধিদের আচার আচরণের মধ্যে জনসেবার চিত্র ফুটে উঠবে। মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকমের আশা প্রত্যাশা স্বপ্ন।

এখন পর্যন্ত এরকম আশা পূর্ণ হওয়া দূরের কথা বরং পুরাতন সামাজিক ব্যাধিগুলি অনেক বেড়েছে। কিন্তু হুঁশিয়ারি অন্যত্র। শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরূপ কোন মন্তব্য করা মুশকিল। সেরকম কোন আচরণ করলে শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে বলে ফতোয়া জারি করা হয়েছে। সাধারণের ক্ষেত্রে রোজদ্রোহিতার দায়ে রাজদণ্ড অনিবার্য।

তাই আজ সকাল থেকে গ্রামগঞ্জ ও দূরের শহরের কাতারে কাতারে মানুষ আসার বিরাম নেই। ট্রাক লাক্সারি-বাস ট্রেনে মানুষ আসছে তো আসছেই। পায়ে হাঁটা মানুষ-মিছিলেরও অভাব নেই। পতাকা ফেস্টুন ফানুসে ছয়লাপ। ময়দানটি ক্রমশই যেন ঠাসা গিজ গিজ মানুষের কলকোলাহলে উৎসব-মেলার রূপ নিচ্ছে। আদিবাসী সাঁওতালরা যথারীতি ওদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গানবাজনা করছে। মাইকে গণসঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে।

এবার সুখানন্দদের মতো অনেকেই আসেনি। নতুন মুখই বেশি। অনেকেই নগরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে চলে যাচ্ছে। দলবদ্ধভাবে মন্দিরে পূজার্চনা সেরে ফিরছে অনেকে। অনেকের চোখে এখানকার যানবাহন দোকানপাট বাড়িগুলি বিস্ময়কর ঠেকছে।

গ্রীষ্মের পিচগলা দুপুরে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এ্যাম্বুলেন্স আগেভাগেই হাজির থাকায় ওদেরকে হাসপাতালে পাঠাতে অসুবিধা হয়নি। দমকল আর সেবাসমিতির জল-গাড়ি প্রস্তুত আছে। এবার মঞ্চের পাশে ত্রিপলের ছাউনিতে সরবত ব্যবস্থাও করা হয়েছে। চা কফি আইসক্রিমের স্টলও বসেছে।

দুপুর গড়িয়ে যেতে পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। আমন্ত্রিত বিদেশী অতিথিদের নিয়ে ছোট মাপের নেতারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্বদেশী নামী দামি গুণীজনদের উপস্থিতির সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। ওঁদেরকে ঘিরে সাংবাদিক আলোকচিত্রী নিরাপত্তাবাহিনী আর স্বেচ্ছাসেবকরা খুবই তৎপর।

শ্রীদীনপতি সিংহ এসে পৌঁছালেই সভা শুরু হবে। ঘর্মক্লান্ত জনতা প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠছে। নির্দ্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে সেই কখন! নয়নের মণি আসছেন না কেন?

গাছের ছায়ায় জটলার মধ্য থেকে একজন ক্ষোভ প্রকাশ করল, অনেক পাইল্‌টে গ্যাছেন দীনপতিবাবু। একদুম রাজাদের মতন হালচাল হইছে। কে বলবে রাজাদের সঙ্গি কুনো তফাত্‌ আছে!

হবে না কেন? সঙ্গীটি মন্তব্য জুড়ল, গণতন্ত্র কুথা দেখতিছ! বেনামে রাজতন্ত্রই তো বহাল আছে। এগুনে মনখুশ নবাব রাজারা গলার মুক্তো হার ছুড়ি দিতেন। এ্যাখুনকার রাজাবাবুরা লাইসিন্‌ পারমিট নোকরি দেন্‌।

বটেই তো। ঠোঁটকাটা শিক্ষিত এক নব্যযুবক বলল, রাজা বাদশা ইংরেজ জমিদারদের মতো এখনকার নেতা মন্ত্রী জনপ্রতিনিধিরাও জনসেবার নামে শোষণ নিপীড়ন করে নিজেরা সুখভোগে থাকেন। ক্ষমতায় বসা বাবুদের খুশি করতে পারলে ভাগ্য খুলে যায়। আর ওঁরা কোন কারণে নারাজ তো দণ্ডভোগান্তির একশেষ।

তোবা তোবা। বিড়িতে সুখটান দিয়ে এক বুড়ো সায় দিল, তেনারা ফুর্তিবাজ ভোগ বিলাসী ছিলেন। এনারাও কেউ যোগী ত্যাগী মহাপুরুষ না। পাঁচ পেটের সংসার-চিন্তায় শরীর গতরের হাল দেখছো বাবারা? আর এনারা নাকি সারা দেশের মানুষের জন্যি অষ্টপ্রহর চিন্তা করেন! বলি, তাহলি অমন হুমদো জেল্লাঅলা গতর হয় কেমনে? ক'বছরেই দীনুবাবুর চেহারাটা কেমন চেকনাই হয়েছে বলতো।

যেন নতুন যৌবন পেয়েছে সত্তর বছরের লোকটি। যুবকটি সাহস পেয়ে ফের লাগাম ছুট্ হল, দুধে ভাতে সুখে থাকলে অমন চকমকে নাদুস-নুদুস হয়েই থাকে। আমিও হতুম।

মুখ্যুলোক বেশি কি আর কইব? আর একটা বিড়ি ধরিয়ে বুড়ো লোকটা বলল, জায়গিরদারদের ইতিহাস তো তোমরা নিশ্চয় পড়েছো। এম এল এ পঞ্চায়েতবাবুরা কম যায় কীসে? থানা অঞ্চল মহল্লা মহল্লায় কত যে ক্ষুদি ক্ষুদি জায়গিরদার! দু'দিন অন্তর তেনাদের চাঁদার ট্যাক্সো দাও। না দিলি গরিবের ওপর জুলুম অত্যেচারের কী কোন অন্ত আছে!

দাও কেনে? এতক্ষণ ধরে অপ্রিয় আলোচনায় বিরক্ত একজন বলল, দিয়ে দিয়ে লালস বাড়িয়ে এখন খেদ কথা শুনিয়ে লাভ কী?

না দিয়ে উপায় আছে? এতক্ষণের নিচু স্বর তুঙ্গে তুলে বুড়ো মেজাজ দেখাল, রাজরোষে পড়লে তুমি বাঁচাতে এস্‌বে? না দিলে মিটিনে না এস্‌লে ধোলাই হবে না বটে। কিন্তু ভাঙচুর হবে! ঘরদোর জ্বলবে। পুকুরের মাছ মরবে। ধোপা নাপিত বন্ধ। ক্ষেতির ফসল কেটে নেবে। পুলিশবাবুরা চোখ ঘুরিয়ে থাকবেন। যদিবা হল্লা হল তো দীনুবাবু জনরোষ বলেই খালাস। ব্যস্ জানে মারলেও হালের পার্টি-লেঠেলদের সাত খুন মাফ।

শুধু কি তাই? পূর্বোক্ত যুবকটির কণ্ঠ দুঃসাহসী হয়ে উঠল, রাজনজরে ধরলে কোনকালেই যেমন নারীর নিষ্কৃতি ছিল না, এখনও তাই আছে। পূর্বে রাজা জমিদারদের খয়েরখাঁ ছিল, এখন কি নেই? বাঁশের চেয়ে কঞ্চির দাপট চিরকালই বেশি। এখনও ওপরঅলাদের ইজ্জতের লড়াইয়ে উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

আলোচনা সমালোচনা বিদ্রূপ তিক্ত মন্তব্যের আসরটা বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। অনেকেই ভয়ডরে আভাসে ক্ষান্ত দিতে বলছিল।

শ্রীদীনপতি সিংহ এলেন। একাধিক পুলিশ রক্ষীর পাহারায় কনভয়ের শব্দ ছড়িয়ে একটি বিদেশী চমকদার গাড়ি থেকে নামলেন। গাড়িটার দাম বোধহয় হাতির সমতুল্য। ভেতরে ইচ্ছানুযায়ী তাপঠাণ্ডা ব্যবহার করা যায়। বোতাম টিপলে বসার সীট পালঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। তখন আয়েশ করে সটান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া চলে। বেতার টেলিফোন টেলিভিশন ব্যবস্থাও আছে। জানলার কাচগুলি বুলেটপ্রুফ।

রাজদর্শনের চেয়ে গাড়িটি জনতার কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। সমবেত সকলে মুগ্ধ পুলকিত বিস্ময়াভিভূত।
উদ্বেলিত জনতার সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, দীনপতি সিংহ, যুগ যুগ জিও। দীনদরিদ্রের চিরসাথী দীনপতি সিংহ, যুগ যুগ জিও। তোমার আমার নয়নের মণি দীনপতি সিংহ, আমরা তোমার সঙ্গে আছি। প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত, রুখছি রুখবো। রুখছি রুখবো।
শ্রীসিংহে চুলে কলপ চোখে গগলস্ পরনে টেরিকটের কুর্তা পায়জামা। বিছানো দামি জেল্লাদার কার্পেটের ওপর দিয়ে কানপুরি নাগরাই জুতা পায় মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দু'ধারে সারিবদ্ধ সুন্দরী তরুণীরা হুলুধ্বনি শঙ্খশব্দ ফুলবর্ষণ করল।
কার্পেটের ওপর পড়ে থাকা ফুলের ওপর দিয়ে যুবকের মতো দ্রুত মঞ্চে উঠলেন শ্রীসিংহ। সুসজ্জিত গদি চেয়ারে বসে পরক্ষণেই মাউথপিস স্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়ালেন। ঝিলিক-ঝিলিক ফটো উঠল অজস্র। দূরদর্শনের ক্যামেরা কাছে এগিয়ে এলো।
যেমন সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে থাকেন তেমনি পুরাতন বক্তব্য রাখলেন শ্রীসিংহ। সারাংশ হল, ওরা মন্দ আমরা ভাল। ওরা ধনী আর সমাজবিরোধীদের দল। আমাদের দল শ্রমিক কৃষক গরিব আর খেটেখাওয়া মানুষের। ওরা যা বহু বছরেও করতে পারেনি আমরা এই ক'বছরে তার চেয়েও অনেক ভাল কাজ করেছি। সীমিত ক্ষমতা অল্প সময় আর এই শাসন ব্যবস্থায় এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু, আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। ওরা এবং কিছু বাজারি সংবাদপত্র আমাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। এই রাজ্যের সচেতন সুসংগঠিত সংগ্রামী মানুষকে সহজে এভাবে বিভ্রান্ত করা যাবে না। আমাদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে তা কলিজা দিয়ে রুখতে হবে। আগামী দিনে আরও কঠিন লড়াইয়ের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। দীনদরিদ্র খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের পাশে আমি ছিলাম আছি থাকব। ইত্যাদি ইত্যাদি।
মানুষে মানুষে ময়দান টইটম্বুর। তিলধারণের জায়গা নেই আর। অধিকাংশই দূর দূরান্ত গ্রামগঞ্জ থেকে আসা কৃষক ক্ষেতমজুর শ্রমিক বেকার। সকলেই চাঁদিফাটা রোদ্দুরে ঘর্মাক্ত পিপাসায় আর্ত। সারাদিন প্রায় অর্দ্ধভুক্ত থাকায় ক্লান্তিতে ঢুলুঢুলু।
শ্রীসিংহের মাথার ওপর বিদ্যুৎ-পাখা ঘুরছে। এক গেলাস সুগন্ধী শীতল পানীয় গলায় ঢেলে উত্তপ্ত ভাষণ শুরু করেছিলেন তিনি। অন্তে এক কাপ উষ্ণ কফি পান করলেন।
সূর্য ডুবে বিকেল নামল। ময়দান-জুড়ে ছড়ানো বিদ্যুৎ-আলোগুলি জ্বলে উঠল।
এরপর একাধিক ছোটবড় মাপের নেতা বক্তব্য রাখবেন। সমাপ্তি পর্বে দেখা যাবে খবরের কাগজ জ্বালানো লক্ষ লক্ষ মশাল।
শ্রীসিংহ ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখলেন। বণিকসভায় যাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। তারপর চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির অনুষ্ঠানে যেতে হবে। সেখান থেকে শহর উপকণ্ঠে পাঁচতারা হোটেল উদ্বোধন করতে যাবেন। সবশেষের সূচি, বিদেশি রাষ্ট্রদূতের আবাসে নৈশভোজে অংশগ্রহণ।
ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শ্রীসিংহ। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে সভামঞ্চ ছাড়লেন।
আজ শ্রীসিংহের ব্যাপক কর্মসূচি অনুযায়ী শহরের রাজপথ আগাম মোটামুটি সংস্কার করা হয়েছে।

যাত্রাপথের দু'ধারের ফুটপাত হকার ভিখিরিমুক্ত। নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থায় অন্য পথগুলিতে জ্যামজমাট। সারা শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ দুর্বিযহ হয়ে উঠেছে।

প্রথম দু'টি অনুষ্ঠানে উপস্থিতির পর শ্রীসিংহ নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়ায় ক্ষুব্ধ হলেন।

এখন বিলাসী গাড়িটা পত্‌পত্‌ পতাকা উড়িয়ে হরিণীর বেগে ছুটছে। সাইরেনের শব্দ শুনে যানবাহন পথচারীরা সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। শহর উপকণ্ঠে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটা শিথিল। হঠাৎই নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে প্রটোকল ভেঙে বাঁয়ে বাঁক-নেয়া সহজ সোজা পথ ধরার আদেশ দিলেন শ্রীসিংহ। কনভয় এগিযে চলল নির্দেশমতো।

এই পথটায় পথ-আলোর ব্যবস্থা নেই। ছোটখাটো গর্তে দু'দিন আগেকার আচমকা বৃষ্টির জল জমে আছে ইতস্তত। কনভয়ের চাকায় পিষ্ট হয়ে সেই জল কৌতূহলী পথচারীদের পোশাকে দাগ ফেলে চলল।

শুকনো হরিতকির মতো চেহারার বুড়িটার ছানিপড়া চোখ। সবকিছু ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারে না। কানে শুনতে পায়না ভালমতো। অন্ধকারে কুপির টিমটিম আলোয় রাস্তার ধারে উবু হয়ে বসে সে রাতের রান্নায় ব্যস্ত। কোন শব্দ দৃশ্যের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু, তিন ইটের উনানের উপর বসানো খোলা মেটে হাঁড়িটাতে যে রাস্তার কাদাজল ছিটকে এসে পড়ল তা বেশ টের পেল।

ভুখা পেটে ভিক্ষে করা সারাদিনের সংগ্রহটা যে হাঁড়িতে এখন পরমান্ন। এভাবে মুখের গ্রাস অপবিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অসহায় নির্বিষ চোখ ফেরাল বুড়িটা। দূরে বিলীয়মান গাড়ির ধূসর লাল বাতি দেখতে পেল। অস্পষ্ট বিড়বিড় গাল পাড়ল, কোন নবাব ব্যাটা র‍্যা! চোকের মাতা খেইচো? মরণ হয় না!

কালের চিত্রনাট্য

সময় সকাল। দৃশ্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি সাধারণ একটি ঘর। সত্তর উর্দ্ধ বয়সের নানা রোগাক্রান্ত সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্যটির বিছানা আসবাবপত্র যেমনটি হয়ে থাকে তেমনটি সাজানো। বৃদ্ধটি সাতসকালে হাতমুখ ধুয়ে চুপচাপ বসে আছেন। বিপত্নীক হওয়ার পর পুত্রবধূ সকালের ওষুধের সঙ্গে চা বিস্কুট দিয়ে যেত। এখনদায়িত্বটা নাতবউ-এর ওপর বর্তেছে। কাজেই আজকাল চা পেতে বেশ বেলা হয়ে যায়। তাতে অবশ্য সকালের খবরের কাগজও সঙ্গে পাওয়া যায়।
বৃদ্ধটির নাকের ডগায় এখন চশমা। দু'হা. ধরা সংবাদপত্রের প্রথম পাতা। আজকের শিরোনামে সংবাদ, কুড়ি বছর পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ। বৃদ্ধটি কৌতূহলে পরবর্তী সংবাদে চোখ রাখলেন। ক্লোজআপে মুদ্রিত অক্ষর ফুটে উঠল।
দেরিতে হলেও রাজ্যে এই প্রথম একজন বিধায়ককে খুনের আসামি সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ দেয়া হল। সঙ্গে আরও পাঁচজনকে একই দণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে। কোর্টের নির্দেশ এই ছয়জনকেই এক মাসের মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু উল্লেখ্য, অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজন ইতিমধ্যেই বার্ধক্যজনিত রোগে মারা গেছেন।
বৃদ্ধটির স্বগত প্রশ্ন, কত বয়স হবে এখন বিধায়ক ব্রজগোপালের?
উত্তর, হোক না স্কুলজীবনের সহপাঠী—ফেল তো করেছে বেশ কয়েকবার। অনুমান করলেন, কমপক্ষে পঁচাত্তর তো হবেই। বিড়বিড় করে হিসেব করলেন, ঘটনাটা ঘটেছিল বিশ বছর আগে। অর্থাৎ কিনা ওর বয়স ছিল তখন পঞ্চান্ন। আট বারের বিধায়ক। পঁচাত্তরের মধ্যে চল্লিশ বছর তো দারুণ রমরমা। তার আগেও পেশিবলে মোটামুটি ভালোই ছিল। বিশেষ করে রাজনীতি যখন একমাত্র বৃত্তি।
এবার ফ্ল্যাশব্যাকে অন্য দৃশ্য।
গোবর নিকনো ঝকমক উঠানের চারদিকের ভিটের গ্রাম্য ঘর বাড়ি। গ্রাম্য প্রকৃতি। ধানের গোলা। উঠানে স্তূপীকৃত কেটে আনা নতুন ধান। বিশাল উন্মত্ত জনতা। বাড়িটাকে ঘিরে উত্তেজক শ্লোগান দিচ্ছে।
ব্রজগোপাল এলো। এসেই সমবেত লোকজনকে ধমকালো, ননীমাধবকে এখনো খুঁজে বার করিসনি! যেন এই নির্দেশটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল পার্টির লোকজনেরা। রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। সমূহ বিপদ বুঝে এতক্ষণ ভয়ে লুকিয়ে থাকা ঘরের বউ মেয়ে ছেলেমেয়েরা কিলবিল প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো।
পরের দৃশ্য সেইরকম—যেমনটি হয়ে থাকে। ভাঙচুর লুটপাট। স্ত্রীপুরুষ কিশোর কিশোরীকে নির্দয়ভাবে মারধর জখম। মেয়েদেরকে বেইজ্জতি ইত্যাদি ইত্যাদি।
কিন্তু কোথায় ননীমাধব? বিরোধী রাজনৈতিক পার্টির প্রধান শত্রুকে যে খুঁজে বার করতেই হবে। নইলে আগামী নির্বাচনে ব্রজগোপালের জেতা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে।
অনেক খোঁজাখুঁজির পর খড়ের গাদায় লুকিয়ে থাকা ননীমাধবকে টেনে বের করে আনা হল। ননীমাধবের বুড়িমা কোথা থেকে ছুটে এসে ব্রজগোপালের পা জড়িয়ে ধরল। হাউমাউ কেঁদে ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইল।

ব্রজগোপাল সেই অবস্থাতেই সাঙ্গোপাঙ্গোদের ধমকালো, তোরা এত দেরি করছিস কেন?
ব্যস, শুরু হয়ে গেল লাঠি-পেটাই। বল্লম দিয়ে খোঁচানো। সবশেষে জল্লাদের হাতিয়ার দিয়ে শিরচ্ছেদ। ননীমাধবের রক্ত ছিটিয়ে দেয়া হল যত্রতত্র।
পরের দৃশ্যে গ্রাম্য হাট। সময় দুপুর।
প্রকাশ্য দিবালোকে হাটের মধ্যে ননীমাধবের কাটা মুণ্ডু নিয়ে ফুটবল খেলার মতো লাথালাথি। পৈশাচিক উচ্ছ্বাস। ঘৃণ্য মাতলামো।
অসময়ে শুনশান হয়ে গেল জমজমাট হাট।
এবারকার দৃশ্যে বৃদ্ধটির সারা শরীর ঘর্মাক্ত। চোখের কোণে আনন্দাশ্রু। নির্বাক। পাথরের মতো স্থির।
সকালের জলখাবার নিয়ে এসে নাতবউ অবাক। জিগ্যেস করল, দাদু তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? কোনো কষ্ট হচ্ছে?
ন্নাহ্। সম্বিৎ ফিরে আসতে বৃদ্ধটি বললেন, ভাবতে ভালো লাগছে যে, এতদিনে ব্রজ পাপের সাজা পেতে যাচ্ছে। আবার ভাবতে খারাপও লাগছে, এ্যাদ্দিন পরে কেন!
তুমি কি বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নাতবউ জানতে চাইল, ব্রজ কে?
আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। লেখাপড়ায় ভালো ছিল না। ভীষণ ডানপিটে স্বভাবের ছিল। সেই ব্রজই এখানকার এম এল এ। ওর সাজা হয়েছে। কাগজে বেরিয়েছে। পরে পড়ে দেখিস।
ব্রজগোপাল মাইতির কথা বলছো? ওর সাজা হয়ে থাকলে তো ভালোই হয়েছে। ভীষণ বাজে মানুষ। ওর কুকর্মের কথা কে না জানে।
তবুও তো রেকর্ড ভোটে জেতে। আটবার।
বুথ দখল করে ওর মতো আরও অনেকেই জেতে। শুনেছি, বিশ বছর আগে একটা খুন করেছিল তোমার ব্রজবাবু। তো এ্যাদ্দিন পরে সাজা কেন?
তের বছর ধরে নিম্ন আদালতে মামলা চলেছিল। তারপর ছয় জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। ব্রজসহ বাকি তেরজন নির্দোষী হিসেবে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ যে ক্ষমতায় থাকা দলের নেতা খুন। 'জনরোষ' বলে বিরোধী দলের এম এল এ কে ছাড়তে দেবে কেন। ব্যস্ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সরকার হাইকোর্টে আপিল মামলা করেছিল। সেই মামলার রায় বেরিয়েছে। সবটা পড়া হয়নি এখনো।
তুমি তাহলে পড়, আমি যাই। অনেক কাজ আছে।
বৃদ্ধটি আবার খবরের কাগজে চোখ রাখলেন।
ক্লোজ আপে আবার মুদ্রিত অক্ষর।
নিম্ন আদালত যে পূর্বে ঠিক বিচার না করে বিধায়ককে বেকসুর খালাস দিয়েছিল তারও সমালোচনা করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। কেননা, ব্রজগোপাল মাইতি নিজের হাতে খুন না করলেও ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে নেতৃত্বে ছিলেন। ননীমাধবকে খুন করতে উস্কানি দিয়েছিলেন। কাজেই খুনের দায়ে সমান দোষের বিধায়কের প্রতি নিম্ন আদালতের বিচার সঠিক ছিল না।

এবারকার দৃশ্যে বিধায়ক ব্রজগোপাল মাইতিকে ঘিরে মিডিয়ার ভিড়। একজনের প্রশ্ন, হাইকোর্টের দণ্ডাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় স্পিকার বলেছেন, আপনার নাকি বিধানসভার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে?
উত্তর—উঁনি এবং ওঁর পার্টি তো তাই চাইছে। গোটা ব্যাপারটাই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। চক্রান্ত করে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। যাতে আমি নবমবার নির্বাচিত না হতে পারি।
দ্বিতীয়জনের প্রশ্ন, ওদের সাফল্যটাকে আপনি কেমনভাবে নিচ্ছেন?
স্মিত হেসে উত্তর—আমি তো সুপ্রিম কোর্টে যাব। আমার স্থির বিশ্বাস, সুপ্রিম কোর্টের রায় আমার অনুকূলেই থাকবে।
তৃতীয় জনের প্রশ্ন, আপনাদের পার্টি তো খুবই ছোট। তাছাড়া আপনারা সরকারি ক্ষমতাতেও নেই। সুপ্রিম কোর্টে লড়ার জন্য এত টাকা কোথায় পাবেন?
চটজলদি জবাব, ওদের মতো লোক দেখানো রাজপথে বালতি করে টাকা সংগ্রহের নাটক করতে হবে না। যে বিপুল সংখ্যক জনসমর্থন আমি পেয়ে থাকি তারাই দেবে।
চতুর্থজনের প্রশ্ন, সুপ্রিম কোর্টের রায় যদি আপনার অনুকূলে না যায়, ভেবেছেন কিছু?
'যদি' নিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। নো মোর ক্রোশ্চেন। আজ আমাদের জরুরি মিটিং আছে।
স্থান ত্যাগের আগে বিধায়ক ব্রজগোপাল মাইতি বিলকুল টেনশনফ্রি বললেন, ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি লাগাতার নির্ভয়ে কথা বলা মানুষ। গরিবের সুখ দুঃখের সাথী বলেই ওরা আমাকে ভালবাসে। বারবার নির্বাচিত করে। ওরাই আমার সুপ্রিম কোর্ট। কাজেই আইন আর বিচার ব্যবস্থা যে রায়ই দিক না কেন, জনতার রায় তো আমার পক্ষে আছে।
এক মাস পরে পরবর্তী দৃশ্যে সেই বৃদ্ধ গুরুতর অসুস্থ। স্থানীয় ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন, আমার মনে হয় কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ভালো।
এখানকার হাসপাতালে হবে না? বৃদ্ধের পুত্র জিগ্যেস করল।
সবই তো জানেন। ডাক্তার বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, নামেই হাসপাতাল। থেকেও কিছুই নেই।
আমি কোনো হাসপাতালেই যাব না ডাক্তারবাবু। বৃদ্ধটি বললেন, হাসপাতালে গেলেও আমি বাঁচব না জানি। তার চাইতে নিজের ভিটেয় আপনার চিকিৎসায় থেকে মরাই ভালো।
তা হয় না জেঠু। ডাক্তার বোঝাতে চেষ্টা করলেন, আপনার তো বিশেষ কোনো রোগ নয় যে, আমি চিকিৎসা করব। নানারকম রোগের উপসর্গ দেখছি। পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার। সেসবের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা একমাত্র ভালো নার্সিংহোম আর কলকাতার হাসপাতালেই আছে। ভেবে দেখুন।
ডাক্তার চলে যাওয়ার পর বৃদ্ধটি পুত্রকে বলল, দেখ বাবা তোর সামর্থ্য তো আমি জানি। বয়স তো কম হল না আমার। এখন তো 'দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে'র সময়। কেন এই বুড়োটাকে টানা হ্যাঁচড়া করে কষ্ট দিবি। ফালতু একগাদা টাকা খরচে তোরও কষ্ট কম হবে না। একবার ভেবে দেখ।

ভেবে দেখেছি। জন্মদাতা বলে কথা। তুমি আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও বাবা। তা না হলেই বরং আমি কষ্ট পাব।
স্থান সদরের রেলস্টেশন।
স্টেশন চত্বরে দলীয় পতাকা ফেস্টুন নিয়ে অপেক্ষমান বিশাল জনতা। এখান থেকেই শুরু হবে ভি আই পি-র পদযাত্রা। যাত্রাপথে নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ বিভাগ থেকে বিশেষ বিশেষ সড়ক সঙ্গমস্থলে 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লাগিয়ে যানবাহন ভিন্নপথে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। স্টেশনে উপস্থিত বিশাল পুলিশ বাহিনী। সাদা পোশাকের পুলিশও আছে।
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তিনি এলেন। নিজেকে খুনী মানতে নারাজ দণ্ডিত আসামি ব্রজগোপাল মাইতি আজ আদালতে আত্মসমর্পণ করতে যাবেন। বিন্দুমাত্র অনুতাপ, গ্লানি লজ্জা সংকোচ অনুশোচনা মালুম হচ্ছে না। বরং ভাবটা এমন যেন নিরুচ্চার, বর বীর বল উন্নত শির....।
দলীয় কর্মী সমর্থকরা বীরের সম্বর্ধনা দিতেই ব্যস্ত। গলায় পরাচ্ছে মালা। হাতে দিচ্ছে ফুলের তোড়া। অনেকেই পুষ্প বৃষ্টি করছে। উবু হয়ে প্রণাম করার জন্য হুড়োহুড়ি। গা গরম করা শ্লোগানে জমজমাট।
অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পর শুরু হল পদযাত্রা। অভূতপূর্ব বিশাল মিছিলের সম্মুখে সস্ত্রীক বিধায়ক ব্রজগোপাল। ভাবাবেগবিহীন। যুদ্ধজয়ের চোখ মুখ বুক। হাতে দলীয় পতাকা নয়তো যেন বিজয় নিশান।
পথের দুপাশে উৎসুক জনতার ভিড়।
একজনের প্রশ্ন, আজকের মিছিলটা কিসের?
এক পথচারী বলল, রিটায়ার্ড রেসের ঘোড়া যাচ্ছে তাই।
ঠিক বুঝলাম না।
বুঝে কাজ নেই।
অন্যত্র একজনের কটাক্ষ, এদের জেলখাটা মানে তো ভি আই পি আরাম আর সুখভোগ।
অপর একজনের মন্তব্য, বিশ বছর পর শাস্তির আদেশ! মানুষটার বয়স কত এখন?
এই বয়সে তো ঘুম খাওয়া পায়খানা ঠিকঠাক হয় না। ছোটবড় ব্যামো লেগেই থাকে। ভালোই হল জেলখানায় মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টটা ভালোই হবে। এমনিতেই বা বাঁচতেন আর কদ্দিন?
যানজটে আটকে পড়া অটো রিকশায় একজন বিরক্তিতে বলল, আজব আমাদের কলকাতা। খুনী আত্মসমর্পণ করতে যাবেন তো পাবলিককে কেন ভোগান্তি সইতে হবে? পুলিশ প্রশাসনও হয়েছে তেমন।
পাশে বসা এক যাত্রী জবাব দিল, যত দোষ নন্দ ঘোষ। পুলিশ প্রশাসনের দোষ ধরার আগে জানা দরকার যে, আজকের এই আত্মসমর্পণকারী এখনো একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। আইনত সম্ভ্রম সমীহ অনিবার্য প্রাপ্য। প্রশাসনকে ওর নিরাপত্তার দিকটাও তো দেখতে হবে।
বুঝলাম, পুলিশ প্রশাসন সেজন্য সুষ্ঠভাবে মসৃণ নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে ওঁর পদযাত্রা পরিচালিত করতে দারুণ তৎপর—তাই তো?
অবশ্যই। এটা ওদের ডিউটির মধ্যেই পড়ে।
এই ডিউটির ঝামেলাটা অনায়াসেই এড়ানো যেত।
সেটা কেমন করে?

পদযাত্রার পারমিশন না দিলেই হতো। তাহলে যানজটে দূরের ওই অ্যাম্বুলেন্সটাকেও আটকে থাকতে হতো না।
পরের দৃশ্যে যানজটে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে ম্যাসিভ স্ট্রোকে শায়িত সর্বপ্রথম দৃশ্যের সেই বৃদ্ধ। বিধায়ক ব্রজগোপাল মাইতির স্কুল জীবনের সহপাঠী। এই বয়সে দু'জনের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের গন্তব্যস্থলও ভিন্নতর।
শায়িত বৃদ্ধের সঙ্গী সাকুল্যে চারজন। পুত্র নাতি আর শুভাকাঙ্ক্ষী দু'জন প্রতিবেশী। স্থানীয় ডাক্তার বলেছেন, অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষায় থাকা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। প্রতিবেশী দু'জনের প্রচেষ্টাতেই মিউনিসিপ্যালিটির দুর্লভ অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া সম্ভব হয়েছে।
সেই অতি জরুরি হাসপাতাল যাত্রাটা এখন যানজটে স্তব্ধ হয়ে আছে। বৃদ্ধ এখন পর্যন্ত সংজ্ঞা হারাননি। তাই ধৈর্য হারিয়ে মুখ খুললেন, কলকাতায় তো রোজই কিছু না কিছুর জন্য হাঁটো। পথযাত্রা নয়তো মিছিল। আজকেরটা কিসের?
দাদু, তুমি একটাও কথা বলবে না। হাত পাখায় বাতাস করতে ব্যস্ত নাতি বলল, ডাক্তারের মানা আছে।
মরার আগে অন্তত মনের সুখে দু'টো কথা বলতে বাধা দিস না দাদুভাই। বৃদ্ধটি অস্পষ্ট উচ্চারণ করলেন।
এমন অলক্ষুণে কথা কেন বলছো বাবা। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে পুত্র বলল, দেখে নিও তুমি ভালো হয়ে বাড়ি ফিরবে।
আমি নিজেই যে আর ফিরতে চাই না। এবার আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। বেকার তোরা টাকা খরচ করতে চাইছিস।
একদম চুপ। নাতি বৃদ্ধের ঠোঁটে আঙুল রাখল।
বৃদ্ধ তবু বিড় বিড় করে চলেন, কেন আর বাঁচতে চাইব? কত সুন্দর এক পৃথিবীতে জন্মেছিলাম। এখন চারদিকে শুধুই কুশ্রী কুৎসিত কু আর কু। সুন্দর হৃদয় মনের মানুষের সংখ্যা কমছে তো কমছেই। সেজন্য শরীরের চাইতে মনের কষ্টটাই যে বেশি। অসহ্য লাগে।
এরপর পতাকা রঙিন প্লাকার্ড ফেস্টুন শোভিত শ্লোগান মুখরিত আনন্দ আড়ম্বরময় বিশাল পদযাত্রার বিভিন্ন অংশের আকর্ষণীয় কিছু কিছু দৃশ্য। তারপর জজকোর্টের অনতিদূরে রাস্তার মোড়ে চলমান ক্যামেরা স্থির হয়।
দৃশ্যে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ। ম্যাটাডোর ভ্যানের ওপর দাঁড়িয়ে বিধায়ক ব্রজগোপাল মাইতি। হাতে কর্ডলেস মাইক্রোফোন। সমবেত দলীয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণরত। গর্বিত উচ্ছ্বসিত আনন্দিত কণ্ঠে বলে চলেছেন,......আপনারা সবাই জানেন যে, আমাকে চক্রান্ত করে ছক কষেই খুনের কেসে এতবছর পর ফাঁসানো হয়েছে। কারা ফাঁসিয়েছে? যাদের দলের অনেকেই আর্থিক কেলেঙ্কারি দুর্নীতি খুনজখমে জড়িত। দেশ বিরোধীর আশ্রয়দাতা হয়েও রিগিং করে রেকর্ড ভোটে জেতেন। আপনারা জানেন, আমি চিরকাল গরিবের পক্ষে। যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলনে। ওরাও এককালে আমার মতোই ছিল। কিন্তু এতকাল ক্ষমতায়

থেকে আজ? আজ ওরা গরিবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধনীর সঙ্গে। গ্রাম ছেড়ে শহর উন্নয়নে ব্যস্ত। সেজন্য লগ্নি খুঁজতে হামেশা বিদেশে ছুটছে। কুখ্যাত দাগি পুঁজিপতিদের জামাই আদরে ধরে আনতে এতটুকু লজ্জা বোধ করছে না। বলছে, ওদের লগ্নির টাকায় গরিবের চাষজমিতে উপনগরী হবে। আমার প্রশ্ন, জৌলুসদার আধুনিক উপনগরীতে কারা বাস করবে? উৎখাত ভিটেছাড়া গ্রামের গরিবরা নিশ্চয়ই নয়। বলা হচ্ছে, চাষজমিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে। আমার প্রশ্ন, আধুনিক প্রযুক্তির সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে ক'জন সাধারণ শিক্ষিত বেকারের চাকরি হবে? মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য শপিং মল হেলথ সিটি স্কুল কলেজ ইত্যাদির পরিবর্তে দরকার উৎপাদনমুখি কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে তোলা। তাতো হচ্ছে না। চলছে, গরিবের চাষজমি নিয়ে শিল্পায়নের নামে ধাপ্পাবাজি আর ধাপ্পাবাজি। এ সবের বিরুদ্ধে বলেই আমি ওদের নজরে অপরাধী। খুনী। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামি।

কিন্তু শুনে খুশি হবেন যে, আপনাদের দেয়া এক একটি টাকার চাঁদায় আমি ইতিমধ্যেই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছি। সেখানে আবেদন নামঞ্জুর হলে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করা যাবে। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনাদের কাছে ফিরে আসতে খুব বেশিদিন সময় লাগবে না।

এরপর বিপুল করতালির মধ্যে আবেগআপ্লুত ব্রজগোপাল শেষ কথা শোনালেন, জেলের মধ্যে যে ক'দিনই থাকি না কেন আমার হৃদয়মন কিন্তু পড়ে থাকবে গ্রামের গাছপালা মাটি আর আপনাদের সঙ্গে।

এবারকার দৃশ্যে জজকোর্টের চত্বর। ব্যাপক সশস্ত্র পুলিশি ব্যবস্থা। সঙ্গে আত্মরক্ষার ঢাল টিয়ার গ্যাস জলকামান। ওদের মুখোমুখি মিছিলে আগত মানুষজনের ভিড়।

নিরুদ্বিগ্ন ব্রজগোপাল হাসিমুখে দলীয় কয়েকজন কর্মীকে নিয়েপুলিশ এসকর্টে আদালতে ঢুকলেন। অতিরিক্ত জেলাজজের এজলাসে আত্মসমর্পণের কিছু আইনি কাজকর্ম সারলেন। তারপর কোর্টের চত্বরে সমবেত সকলের অগোচরে পিছন দরজা দিয়ে পুলিশের একটি গাড়িতে উঠে জেলের অভ্যন্তরে গেলেন।

সর্বশেষ খবরটা কোর্টচত্বরে নীরব জমায়েতে এসে পৌঁছাতে শুরু হয়ে গেল 'রাজবন্দী'র নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মুহুর্মুহু স্লোগান। তারপর একসময় নীরব শোকার্ত শান্তিপূর্ণ প্রস্থান।

শেষ দৃশ্যে হাসপাতাল চত্বর। একটি অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। ভেতরে সেই বৃদ্ধের মৃতদেহ নিয়ে শোকাহত সঙ্গীরা। হাজারো হয়রানির আশঙ্কায় আতঙ্কে বিচলিত নির্বাক কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কালবেলা

বেশ কিছুদিন যাবত এমনটি ঘটছে।
কিরণময় রাত্রে লেখাপড়ার টেবিলে কলম খুললেই লোডশেডিং শুরু হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভ্যাপসা গরম। মশার দংশন। তবু, কেরোসিন বাতিতে আগ্রহ উৎসাহ থাকে না। বরং করপুটে থুতনি রেখে চুপচাপ বসে থাকতে ভালোবাসেন। সে সময় বেশ একটা ঘুম ঘুম ভাব আসে। হালকা পাতলা ঘুমনোও হয়ে যায়। একচিলতে স্বপ্নও দেখে ফেলেন।
কিরণময় আজ এই মুহূর্তে স্বপ্ন দেখছেন কিনা ঠিক বুঝতে পারছেন না। সুমুখে এখন যেন জ্যোৎস্না রাতে শীতের কুয়াশা। অস্পষ্ট সমবেত কয়েকজন এদিকেই তাকিয়ে আছে। ওদের হাতে কোনো ফেস্টুন প্লাকার্ড নেই। শ্লোগানও দিচ্ছে না।
ভিড়ের ভেতর থেকে চল্লিশ-উর্দ্ধ একজন এগিয়ে এলো। কিরণময়ের মুখোমুখি দাঁড়াল। জ্বলন্ত চাহনি। চোয়াল শক্ত। কিন্তু নির্বাক।
কিছু বলবেন? ভূতটুতে অবিশ্বাসী নির্ভীক কিরণময় স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন।
বলব বলেই তো এসেছি। সে তার পিছনে সমবেত অস্পষ্ট মানুযগুলির দিকে হাত প্রসারিত করে বলল, ওরাও কিছু না কিছু বলতে এসেছে।
আপনি ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই তো। কিরণময় ফের একবার বললেন, নিজের পরিচয়টা কিন্তু এখনও জানাচ্ছেন না। আপনাকে তো আমি চিনিই না।
চিনবেন কেমন করে? সে বিদ্রূপ করে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, পুজো সংখ্যায় লেখার জন্য বড্ড বেহিসেবি অর্ডার নিয়ে ফেলেছেন যে। ঠিকঠাক স্নান আহার ঘুমই হচ্ছে না, তো খবরের কাগজ পড়বেন কখন!
খবরের কাগজ পড়লে কি হতো?
আমার পরিচয় জানতে চাইতে হতো না। সে যথেষ্ট গর্বিত কণ্ঠে বলল, গত একমাস ধরে মিডিয়াই তো আমাকে দেশ বিদেশের কোটি কোটি মানুযের কাছে পরিচিত করেছে। ক'জন পাঠক পাঠিকা আপনার লেখা পড়ে? আমার পরিচিতি আপনার চাইতে ঢের ঢের বেশি।
মানলাম। কিরণময়ের নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি, লেখা নিয়ে ব্যস্ত না থাকলেও আজকাল খবরের কাগজ পড়ায় আমি তেমন কিছু উৎসাহ বোধ করি না।
কেন, তা জানতে পারি কি?
খবর খুব একটা খুঁজে পাই না যে। ওদের ভাষায়, 'স্টোরি কভার'-এ সংবাদের পরিবর্তে আমাদের ভাব ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই গল্প হয়ে যায়।
অর্থাৎ কিনা, ওদের জন্য আপনাদের বাজার মার খেতে বসেছে। তাই—
কক্ষণো না। আত্মসম্মানে খোঁচা খেয়ে আহত কিরণময় প্রতিবাদ জানালেন, সাহিত্য হল লেখকের কষ্টের ফসল। ভাবনার সফল সৃষ্টি। তাতে থাকে সমাজে কি হচ্ছে হতে পারে। সেই সঙ্গে কি হওয়া উচিত অনুচিত সে সম্পর্কে চেতনা—
থাক থাক। সে থামিয়ে দিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল, কতটুকু কি লিখছেন আপনারা এখন? সাধারণ মানুযের সঙ্গে তো প্রতিষ্ঠিত আপনাদের মেলামেশাই নেই। অজ গাঁয়ে গেছেন কোনোদিন?

ডাক বাংলো সার্কিট হাউস ট্যুরিস্ট লজ অথবা খামার বাগানবাড়িতে বিলাসী আতিথ্যগ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন আপনারা। তবু তো সাংবাদিকরা অনেক কিছুই দেখেন লেখেন। হতে পারে তাতে কিছুটা সাহিত্যের রঙ থাকে।

আপনি কি তাহলে সাংবাদিক? অচেনা আগন্তুকের কথায় কিরণময় কৌতূহলী প্রশ্ন করলেন।

ন্নাহ। সে নিরুত্তেজ জবাব দিল, আমার পরিচয়টা আপনাকে অবশ্যই জানাব। তবে, সবশেষে। তার আগে আপনি রাজি হলে আমার সঙ্গীরা ওদের পরিচয় জানিয়ে কিছু বলতে চায়।

বেশ তো, ওদেরকে আসতে বলুন। কিরণময় সরল সম্মতি জানিয়ে বললেন, তবে একটা অনুরোধ। একজন করে আসুক।

এক এক করেই আসবে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আপনার সঙ্গে দু'চার কথা বলেই নিজেদেরকে ধন্য মনে করে ফিরে যাবে। ভাববে, সাক্ষাত ফলপ্রসূ হবে। যেমনটি হয়ে থাকে আর কি।

অযথা সময় নষ্ট করবেন না। ডাকতে শুরু করুন।

আগন্তুকের ইশারায় প্রথম সামনে এসে দাঁড়াল তিরিশ-ঊর্দ্ধ এক রমণী। বিবাহিতা। সুশ্রী সুগঠনা। পোশাক প্রসাধনে রুচিসম্পন্না। দেখলে যথেষ্ট শিক্ষিতা মনে হয়।

বারো বছর আগে শিবতলায় প্রকাশ্যে দিবালোকে একজন নিরীহ সমাজসেবিকার ওপর সমাজবিরোধীরা বলাৎকার করেছিল, মনে পড়ে কি? রমণীটি দ্বিধাহীন বলল, আমি সেদিনের সেই ধর্ষিতা। আপনাকে সবিনয়ে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

কি প্রশ্ন? কিরণময় ঈষৎ বিব্রত বললেন, বলুন।

আপনারা তো বড়াই করে বলে থাকেন, তরবারির চাইতে কলম নাকি অধিক শক্তিশালী! তো তথাকথিত মরুদ্যানে যে খুন ধর্ষণ শ্লীলতাহানি ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে চলেছে আপনারা তা দেখছেন না? রাজনৈতিক মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের পাশবিক অমানবিক অত্যাচারের জঙ্গল-রাজের বিরুদ্ধে আপনার কলম কি কাজ করছে?

নো মোর। রমণীটির উত্তেজনায় অপ্রস্তুত আগন্তুক বলল, এবার অন্যকে আসতে সুযোগ দিন।

যাচ্ছি। রমণীটি মুখ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, বিখ্যাত লেখক! কি লেখেন? ধনীর পুত্রকন্যার সঙ্গে গরিবের পুত্রকন্যার প্রেমকথা। নয়তো, এর পেটে ওর বাচ্চা। তার পেটে আর একজনের সন্তান। কে যে কার বাপ মা সন্তান, হিসেব রাখা দায়।

ওহ্, প্লীজ। আপনি এবার যান।

রমণীটি চলে যেতে আগন্তুক কিরণময়ের কাছে মার্জনা চাইল, কথা দিচ্ছি আর কেউ এতটা সময় নেবে না।

আগন্তুকের ডাকে গেরুয়াবসনধারী দ্বিতীয় ব্যক্তি কাছে এলো। পরিচয় জানাল, আমি সেই সুজন সেতুর ওপর জীবন্ত পুড়িয়ে মারা সন্ন্যাসীদের অন্যতম একজন। ওরা বলেছিল, এখনও বলে থাকে 'জনরোষ'। আমার প্রশ্ন, আপনি কি বলেন? সুসংগঠিত দলের সম্মিলিত আক্রমণে খুন হওয়া আইনসিদ্ধ!

প্রশ্নহীন পরিচয় জানাল গ্রাম্য এক চাষী, ছোট অঙ্গন গ্রামে অভিশপ্ত বাড়ির ভেতর মৃতদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমার মৃতদেহ পরিবারের লোকের কাছে যায়নি। এমন তো কতই হচ্ছে।

প্রশ্ন করল না, পরের ক্ষেতমজুরটিও। জানাল, সেও পার্টিবাজির শিকার। শীতের সকালে দিন মজুরের কাজের খোঁজে অন্য গাঁয়ে কয়েকজনের সঙ্গে গিয়েছিল। সকলেই সন্দেহবশে খুন হয়েছিল। এরপর এলো পুলিশের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদী গুম হওয়া কালো পালোয়ান। জাল টাকার ছাপাখানা আর অস্ত্র তৈরির কারখানা আবিষ্কার করে খুন হওয়া কিশোর যুবকেরা। প্রমোটারের দ্বারা রাতের অন্ধকারে পোড়ানো বাজার বস্তিতে দগ্ধ-মৃতদের ক'জন। ভুল চিকিৎসা অবহেলা আর ভেজাল ওষুধে মৃতদের ক'জন। পুলিশ-লকআপে প্রহারে মৃত একজন। চা বাগান আর ভোমরাতোলে অনাহারে মৃত দুই আদিবাসী।
এরা সকলেই পরিচয় জানিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও কিরণময়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল না। বিরক্তি প্রকাশ করলেন, আরও কতজন?
হকার থেকে শুরু করে শিক্ষক অধ্যাপক চিকিৎসক বিচারক ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর অন্তত একজন করে প্রতিনিধি তো আছেন। আগন্তুক চোয়াল শক্ত করে শ্লেষাত্মক জবাব দিল, আপনারা নাকি সমাজ নিয়ে খুবই ভাবনাচিন্তা করেন? তো এরা কি সমাজের বাইরের কেউ? ওরা সকলেই কিন্তু লাঞ্ছিত নিপীড়িত বঞ্চিত অত্যাচারিত। এবং সততা প্রতিবাদিতা প্রতিরোধ প্রচেষ্টার জন্য অন্যায়ভাবে নিহত। সরকার নির্বাচন স্বার্থে অপরাধীদের আড়াল করেছে।
তো আমার কাছে কি উদ্দেশ্যে?
ওরা জানতে চায়, গত পঁচিশ বছরে আপনি যে অগুনতি গল্প উপন্যাস লিখেছেন, তাতে ওদের স্থান নেই কেন?
সে প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। উত্তেজনায় মেজাজ তুঙ্গে তুলে কিরণময় বললেন, কে আপনি? আমার ওপর অন্যায়ভাবে মানসিক জুলুম করে চলেছেন সেই কখন থেকে। আমি আর কারও সঙ্গে দেখা করব না।
ওকে ওকে। আগন্তুক অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বিনীত বলল, জানি সমবেত সঙ্গীর সংখ্যার শেষ নেই। কিন্তু বলতে পারেন, কেন আপনি শুধু আমাদের জুলুমবাজিই দেখছেন? নামেই গণতন্ত্র আর পরিচ্ছন্ন প্রশাসন।
এখানে এসব বলে কি লাভ! কিরণময় রীতিমতো ঘর্মাক্ত। কণ্ঠস্বর কাঁপছে, আমি রাজনীতির মানুষ না।
মানুষ তো? চোখ কান ইন্দ্রিয়গুলিতো আছে। সারা দেশ জুড়ে দুর্বলের ওপর যে জুলুমবাজি চলছে, দেখতে শুনতে পান না? জুলুমবাজি রিগিং জালিয়াতিতে ক্ষমতায় থেকে বলা হচ্ছে, জনগণ আবার আমাদের ক্ষমতায় চেয়েছে। 'জনাদেশ'। এসব দেখেও তো বেশ শান্তই থাকতে দেখি। আমাদের বেলায় মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন।
আমি কি করতে পারি এদের জন্য? কিরণময় স্বর নরম করলেন।
কলম ধরতে পারতেন। আগন্তুক দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে বলল, এখন আর আপনার দ্বারা তা সম্ভব নয় বুঝি। কেননা, নকল ডিগ্রিতে উচ্চপদে বসার মতো মেকি সমর্থক সেজে আপনিও বেশ কয়েকটি পুরস্কার হাতিয়ে ফেলেছেন যে। তাছাড়া বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিশেষ অতিথি থাকছেন অনেক অনুষ্ঠানে। দায়বদ্ধতা বলতে যা কিছু এখন পার্টির কাছে।
প্লীজ আমাকে এবার রেহাই দেবেন? বিমর্ষ চোখ মুখে কিরণময় অনুরোধ জানালেন, একা আপনি থাকুন। ওদেরকে অন্তত চলে যেতে বলুন।

নির্দেশমতো সমবেত সকলে অদৃশ্য হওয়ার পর আগন্তুক জিগ্যেস করল, আমাকে থাকতে বললেন কেন?
নিজের পরিচয়টা সবার শেষে জানাবেন বলেছিলেন, তাই।
ধনে নিন, আমার নাম লালটু বিল্টু শিলটু ইত্যাদি কোনো একটা। আগন্তুক উদাস বিষণ্ণ হল, তিরিশ বছর আগেকার কথা। বিশ বছর বয়সের যৌবনে স্বপ্ন থাকাই তো স্বাভাবিক। আমারও ছিল।
স্বপ্নটা ছিল কি রকম? কিরণময় কৌতূহলে নড়ে চড়ে বসলেন।
গরিব শ্রমিক কৃষকের আন্দোলনের দ্বারা বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে দেওয়ার স্বপ্ন। ওই ভাবধারার রাজনৈতিক দলের শ্লোগান পোস্টার ভাষণে দারুণভাবে উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ফলশ্রুতি, মিটিং মিছিল জঙ্গী আন্দোলনে একনিষ্ঠ সামিল হয়ে পড়েছিলাম।
তারপর?
বিস্তর কষ্ট নির্যাতন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। অনেক সময় আত্মগোপন পর্যন্ত করে থাকতে হয়েছে। সংসার সম্পর্কে উদাসীন থাকার জন্য গঞ্জনাও কম শুনতে হয়নি। আমি আমার পিতৃ পরিচয় জানি না। স্বামী পরিত্যক্তা অভাবী মা-র চোখে হয়ে পড়েছিলাম, দায়দায়িত্ব কর্তব্য বোধহীন অপদার্থ পুত্র।
আপনাদের দল শাসন ক্ষমতায় আসার পর? কিরণময় এবার পাল্টা তির্যক প্রশ্ন জুড়লেন, আপনার স্বপ্ন কোথায় গিয়ে দাঁড়াল?
দেখলাম, সমাজকে বদলে দেয়ার বদলে দলের নীতি আর নেতারাই বদলে যেতে থাকল। হৃদয়হীনতা দুরারোগ্য ব্যাধি হয়ে দাঁড়াল। মানুষে মানুষে বিভাজনের যেন অন্ত নেই কোনো।
হতাশায় পার্টি করা ছেড়ে দিলেন তখন?
ঢোকা সহজ। বেরিয়ে আসা মুশকিল। তা ছাড়া, বাঁচতে গেলে রুজি রোজগার দরকার তো। বেকারত্বের সেযে কি জ্বালা। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য আমার মতো হাজার হাজার কর্মী কি পেল জানেন?
কি?
মস্তানি তোল্লাবাজি ডাকাতি। অটো রিকশা। ট্রেনে হকারি। রাস্তার ধারে বে-আইনি দোকানদারি ইত্যাদি কিছু একটা।
আপনি?
পতাকার জোরে আর দশজনের মতো আমিও কলকাতার ফুটপাতের ব্যবসায়ী হয়ে গেলাম।
ফুটপাতের ব্যবসা তো বেশ জমজমাট আজকাল। অনেক জায়গায় পাকাপোক্ত ঘর। ঝলমল বিদ্যুৎ-আলো। সানমাইকার শোকেস। ফ্রিজ ফোন গ্যাস সিলিন্ডার কি নেই!
হ্যাঁ কাপড়ের দোকানদারিতে আমিও বেশ ভালোই ছিলাম। পার্টির কাজে নিহত এক-বন্ধুর স্ত্রী সন্তানের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। ছেলেটিকে ভালো স্কুলে ভর্তিও করেছিলাম। বিবাহিত না হলেও স্বামী-স্ত্রীর মতো সুখী জীবনও কাটাচ্ছিলাম আমরা। তারপর—। আগন্তুকের বাক রুদ্ধ হয়ে গেল। দু'চোখের কোণে চিকচিক জল।
তারপর কি হলো? কিরণময় চঞ্চল আগ্রহে জানতে চাইলেন।

সূর্যোদয়ের অভিযান। বুলডোজার। কবে? প্রতিষ্ঠিত পঁচিশটি বছর পর। যখন আমার বয়স পঞ্চাশ বছর। তাই আমি বিদ্রোহী হয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম, পুরনো ফুটপাত ফেরত চাইছো ভালো কথা। ফিরিয়ে দিতে পারবে কি পার্টির কাজে নিবেদিত বিগত যৌবনকাল? এই বয়সে যাব কোথায়? উচ্ছেদের আগে বিকল্প ব্যবস্থা চাই।
পেয়েছিলেন কি?
কেমন করে পাব। পুলিশ আর পার্টির অত্যাচারে একসময় দেখলাম, দাবি আদায়ের আন্দোলনে আমার পাশে প্রায় কেউই নেই। এমনকি অবৈধ স্ত্রীও আমাকে ত্যাগ করে অন্যমুখি। সে এক দারুণ দুঃসময়।
সে সময়ের বৃত্তান্ত না বললেও চলবে। কিরণময় থামিয়ে দিয়ে বললেন, পার্টির বিরুদ্ধে গেলে দুঃখ কষ্ট অপবাদ নাজেহাল নির্যাতন জুটবে সেটাই তো স্বাভাবিক। আপনি বরং অল্প কথায় বলুন, কি কারণে হঠাৎ বিশ্বময় পরিচিত হলেন।
এক কথায় বলা যায়, ফাঁসিতে আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশে।
ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড তো অনেকেরই হয়ে থাকে। কিরণময় অবিশ্বাসী দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি অপরাধ করেছিলেন আপনি—ঐতিহাসিক আন্দোলন টান্দোলন কিছু?
না। বলাৎকারী খুনী হিসেবে। আপনি তো পণ্ডিত ব্যক্তি। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?
প্রশ্নটা কি?
দেশময় খুন হত্যা ধর্ষণ বলাৎকার তো নিত্যকার ঘটনা। ক'জনের আর ফাঁসি বা কারাদণ্ড হচ্ছে। আমার প্রশ্নটা হল, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংযোগ কি বলাৎকার নয়? আমার বেলাতেও তেমনটি ঘটেছিল। তবে অবৈধ স্ত্রীর সঙ্গে। আর খুনী? খুন আমিও হতে পারতাম।
ঠিক বুঝলাম না। খোলসা করে বলুন।
সেদিন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না। হঠাৎ-অচ্ছুৎ আমার যৌন আচরণের শেষে অবসন্ন শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল অন্য এক পুরুষের ছুরির আঘাতে। নতুন নাগরকে ডেকে আনলেও আমার অবৈধ স্ত্রী কিন্তু এমনটি চায়নি। বরং আমাকে বাঁচাতে গিয়েই সে খুন হয়েছে। ব্যস্, আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল!
তারপর? কিরণময় ধৈর্য হারিয়ে বললেন, আমার হাতে সময় খুবই কম। বিদ্যুৎ এসে গেলেই লেখা শুরু করতে হবে। তখন আপনাকে সময় দিতে পারব না। পরিচিতির আসল কারণটা বলুন।
আসলে আইন আদালতে নির্দোষী প্রমাণ করতে গেলে তো অর্থ দরকার হয়। আমার সেই সামর্থ্য না থাকায় আইনজীবী পরামর্শ দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাতে।
আবেদন করলেন?
সুযোগ পেলাম কোথায়? দলের কানে যেতেই রাজনীতি শুরু হয়ে গেল। ফাঁসির স্বপক্ষে প্রচারে নেমে পড়ল বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ স্বয়ং ফাঁসুড়ে মায় মন্ত্রীপত্নীও। ব্যস্, বাজার ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিডিয়া। আমিও দেখলাম, এইতো মওকা।
কিসের মওকা?
প্রচারে পরিচিত হয়ে মরার। ভাবলাম, প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাঁচতে হয়তো পারি, কিন্তু কেন হেলাফেলায় বাঁচতে যাব। জন্মলগ্নের সেই সুন্দর পৃথিবী পরিবেশ পঞ্চাশ বছরে কত কুৎসিত হয়ে গেছে। মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার বড়ই অভাব। ওরা সুযোগ পেলেই হয়তো সমাজবিরোধী আখ্যা

দিয়ে আমাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করবে। তার চাইতে—সাড়া জাগিয়ে বিখ্যাতদের মতো চলে যাওয়াই ভালো।
ইয়েস, এবার মনে পড়ছে। কিরণময় কিছু আবিষ্কার করার মতো উচ্ছ্বাসে বললেন, আপনার প্রসঙ্গেই সম্ভবত আমার স্ত্রী একদিন মিডিয়ার বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করছিল।
কি বলছিলেন তিনি?
বলছিল, মিডিয়া নাকি আপনার সম্পর্কে খবর প্রচারে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছে। ফাঁসি হওয়ার আগে প্রতিদিন আপনি কি বলছেন, করছেন, ভাবছেন, সেসব নিয়ে বিরক্তিকর স্টোরি কভার করছিল।
শুধু কি তাই? আমি কেমনভাবে সময় কাটাচ্ছি কি খাচ্ছি কখন ঘুমোচ্ছি ইত্যাদি খবরও ওরা ছাপছিল।
আমার স্ত্রী আরও বলছিল, আপনি কখন কতটা বিষণ্ণ ক্ষুব্ধ বিরক্ত শান্ত গম্ভীর হাসিখুশি—সেসবও নাকি কনডেমড্ সেলের ভেতরে বসানো ক্লোজড সার্কিট টিভির মাধ্যমে নজরে ধরে মিডিয়ার দ্বারা প্রচার করা হচ্ছিল।
এতটুকু মিথ্যে বলেননি তিনি। আগেই বলেছেন, খবরের কাগজ পড়ার সময় পান না। তাই কিছুই জানেন না আপনি। কয়েকটি পত্রিকায় আমার জীবনীও ছাপা হয়েছে। আপনার স্ত্রীর নজরে পড়লে আপনিও জানতেন নিশ্চয়ই।
তাই! কিরণময় বিস্ময় প্রকাশ করলেন।
ভাগ্য আর কাকে বলে। সাধে কি আর রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চাইনি। কদ্দিন বা বাঁচতাম আর। এই মৃত্যু যথেষ্ট গর্বের। রীতিমতো স্মরণীয় করবে আমাকে। পড়লে দেখতেন, ফাঁসির পরের দিনের প্রায় প্রতিটি খবরের কাগজে আমিই ছিলাম হেড লাইন। প্রথম পাতা জুড়ে শুধুই আমার খবর।
আগন্তুক একাধিক খবরের কাগজের বাণ্ডিল্ কিরণময়ের টেবিলে শব্দ করে রাখল। বিস্মিত কিরণময় বিরক্তি প্রকাশ করলেন, এসব কি করছেন?
পড়ে দেখবেন। আগন্তুক গর্বিত কণ্ঠে বুক চিতিয়ে বলল, আপনার বেশি কষ্ট করতে হবে না। আমার দাগ দেয়া লাইনগুলি পড়লেই যথেষ্ট। দেখবেন, আমার চরণ দু'খানির দুর্লভ ফটোও ছেপেছে একটি পত্রিকা।
কিরণময় এখন লালকালিতে রেখাটানা লাইনগুলিতে দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছেন। দ্রুত। অতি দ্রুত।
রাত তিনটে বিশ মিনিটে স্নানান্তে নতুন বস্ত্র পরে সেলে প্রবেশ করলেন।
তারপর গীতা পাঠ। চা পান। গান শ্রবণ।
সেপাইদের সামনে বসে ধূপ জ্বেলে মন্ত্রপাঠ। প্রার্থনা।
জেল গেটের বাইরে প্রায় পাঁচশ গজ দূরে পুলিশের ব্যারিকেড। পুলিশ র‍্যাফের ছড়াছড়ি।
স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে কম্যান্ডো।
উৎসাহী মানুষের ভিড়।
মিডিয়ার ক্যামেরা প্রস্তুত।
সাংবাদিকরা হাজির।

ভোর চারটে থেকে শ্মশানের গেট বন্ধ করে থানার অফিসার প্রতীক্ষারত। অন্য কারও মৃতদেহ সৎকার বন্ধ।
চারটে দশ মিনিটে সেলের সামনে এলেন জেল-চিকিৎসক, জেলার, আই জি (কারা) জেল সুপার, জি আই জি (প্রিজন)।
জেল সুপার ওর মাথায় হাত রাখলেন।
জেলারের সহানুভূতির হাত ওর পিঠে।
ফাঁসির মঞ্চে বিষণ্ণ ফাঁসুড়ে বললেন, সরকারি নির্দেশে এই কাজ করতে হচ্ছে।
ঠিক সাড়ে চারটায় হাত থেকে লাল রুমাল ফেললেন জেল-সুপার।
সুপারের দিকে তাকিয়ে পেশাদার ফাঁসুড়ে লিভার টানলেন।
দেহ ঝুলে পড়ল।
পাঁচটায় চিকিৎসকের পরীক্ষা।
সাড়ে পাঁচটায় ময়না তদন্তের টেবিলে। সওয়া ছ'টায় তদন্ত শেষ।
'হিন্দু সৎকার সমিতির' শববাহী গাড়িতে শ্মশানযাত্রা। সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহ মুখ। কিছু গাদাফুল ছড়ানো। দু'পাশে রজনীগন্ধা ফুলের তোড়া। বুকের ওপর সাদা মালা। শুধুমাত্র চরণ দু'খানি দেখা যাচ্ছে।
দশ গাড়ির কনভয়ের মাঝখানে শববাহী গাড়িটি শ্মশানমুখি। সুমুখে মোটর সাইকেলের পাইলট। শ্মশানের সামনে পুলিশ র‍্যাফ হেলমেট বাহিনী।
কৌতূহলী মানুষের ভিড়।
আশেপাশের ছাদে উৎসুক মানুষের চোখ।
রাস্তা আর গেট আগলে দু'কম্পানি র‍্যাফ।
মিডিয়ার ভিড়।
রাস্তায় যান চলাচল জট-প্রভাবিত।
শ্মশানের ভেতর প্রস্তুতি প্রতীক্ষা তৎপরতা তুঙ্গে।
পুলিশি তত্ত্বাবধানে শ্মশান-ডোমদের সাহায্যে বৈদ্যুতিন চুল্লিতে মৃতদেহ প্রবেশ।
ডোমেরাই জলে ভাসায় ভস্মাবশেষ।
তৎপরতায় ফিরে যায় কনভয়।
নাগরিক কমিটি শোক মিছিল বের করেছে।
........মোমবাতি জ্বালিয়ে আত্মার শান্তি কামনা করেছে।
যেই স্কুলে পড়ত সেটি বন্ধ ছিল।

লোডশেডিং উধাও। বিদ্যুৎ—আলোয় কিরণময় এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। এতক্ষণ দেখা সব কিছুই আশ্চর্যরকম অদৃশ্য। তবু, চোখের সামনে মৃতদেহের শুধুমাত্র চরণ দু'খানি যেন সুস্পষ্ট।
কাহিনীকার কিরণময়ের মাথায় এখন অন্য ভাবনা। আগন্তুক নাকি ওর জন্মদাতা পিতার পরিচয় জানতো না। ধর্ষণজাত সন্তান হলেও হতে পারে। ফাঁসির স্বপক্ষে যুক্তিবাদী কেউ একজন অপরাধী ?— অসম্ভব কিছু না।

স্বয়ং আগন্তুক

ছিপছিপে লম্বা রোগা ছেলেটির গায়ের রং কালো। ডাগর ডাগর চোখ দু'টো নিষ্প্রভ হলেও গভীরতা আছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। মাথায় একরাশ রুখুসুখু বেতেলে আগোছালো চুল। পরনে মলিন সার্ট ট্রাউজার। পায়ে ছেঁড়াতাপ্পি স্লিপার।

এরকম চেহারার ছেলেতো কতই দেখা যায়। তবু এই ছেলেটিকেই বিশেষ করে স্মরণে আছে একালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক সজল বসুর। ঘরোয়া এক সাহিত্যালোচনা সভায় একগুচ্ছের কবিতা নিয়ে এসেছিল ছেলেটি। অনেক অনুরোধে উত্যক্ত উদ্যোক্তারা একটি মাত্র কবিতা পাঠের অনুমতি দিয়েছিলেন। কবিতাটি মনে ধরায় সভাপতি সজল বসু দ্বিতীয় কবিতা পাঠের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই সুযোগে তিনটি কবিতা পড়েছিল ছেলেটি। তিনটি কবিতাই যথার্থ ভাল।

ক'দিন হল আবছা আলোর ভোরে লেকে মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে ছেলেটির মুখোমুখি হন সজল বসু। চোখাচোখি হলে ছেলেটি স্মিত হাসে। কিছুই বলে না। তবে মনে হয়, কিছু বোধহয় বলতে চায়। কেন যেন অস্বস্তি বোধ করেন সজল বসু। আজ ভোরেও এমনটি হয়েছে।

সকালের চা খেয়ে লেখার টেবিলে বসতে যাবেন এমন সময় ডোরবেল বেজে ওঠে। রবিবারের সাত সকালে কে এলো আবার? পুজো সংখ্যায় পাঁচখানা উপন্যাস তেরটি গল্প দু'টি রম্যরচনা আর একটি কিশোর এ্যাডভেঞ্চার লিখতে হবে এবার। লিটন ম্যাগাজিনে টুকটাক কিছু সংখ্যক দু'পাতা তো আছেই। মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন সজল বসু।

দরজা খুলে দেখেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ছেলেটি। বিব্রত বোধ করলেন।

বিশেষ প্রয়োজনে আপনার একটু সময় নষ্ট করতে এসেছি। চোখের প্রশ্নে সপ্রতিভ জবাব দিল ছেলেটি।

আহাম্মক আর কাকে বলে। মনে মনে ভাবলেন সজল বসু, লেকে যখন দেখা হল তখনই তো বলতে পারত। এরা কেন যে বোঝে না সময় অপচয় কতবড় গর্হিত কাজ।

সৌজন্য খাতিরে ভেতরে আসতে দিলেন সজল বসু। ছেলেটি দ্বিধাহীন ভেতরে ঢুকে লেখার টেবিলের একমাত্র চেয়ারটায় বসল। বিরক্ত সজল বসু বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টুল টেনে সেটিতে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি মনে করে? এদিকেই কোথাও থাক বুঝি?

থাকি চেতলায়? আপনার কাছেই এসেছি। প্রয়োজন আছে। ব্যাপারটা খুবই জরুরি।

তাহলে সঙ্কোচ কেন?

প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি আমাকে সময় দিচ্ছেন। ব্যস্ত লেখকরাতো ঘরে থেকেও জানিয়ে দেন, তিনি নেই। নয়তো ঘুম থেকে ওঠেননি।

সজল বসু ভাবলেন, 'তিনিও তো ব্যতিক্রম নন। তাহলে কেন আজ নিজেই দরজাটা খুলতে গেলেন! আচ্ছা বিপদে পড়া গেল।

ধন্যবাদের কিছু নেই। আমিও তো সামাজিক মানুষ। কিন্তু আমার হাতে সময় খুব কম। তুমি বরং প্রয়োজনটা তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

আমার কিছু একটা করা দরকার। ছেলেটি সংক্ষেপে জানাল, আমার বাবা নেই। বিধবা মা আছেন। টাকার অভাবে গ্র্যাজুয়েট হয়ে আর পড়াশুনো করতে পারিনি। ঠাকুরদা-আমলের বাড়ি ভাগ বাটোয়ারায় দু'ঘরের ভাড়া আর বিধবা মা-ই সম্বল এখন।
আমার কাছে চাকরি আশা করছো কি?
না না। আজকাল পলিটিক্যাল পার্টির লিডারকে টপকে চাকরি পাওয়া যায় না তা আমি জানি।
টিউশানি টানি কিছু?
সেতো স্কুল টিচার নাহলে মেলে না।
তাহলে আমার কাছে কিরকম সাহায্য চাইছো তুমি?
বড় পত্রপত্রিকায় আপনার জানাশোনা আছে তাই—
তাই কি?
আমার কবিতা কেন ছাপা হচ্ছে না জানতে চাই।
ওঁদের জিজ্ঞেস করে দেখেছো? কি বলেন ওঁরা?
ডাকে পাঠালে নাকি পৌঁছায় না। হাতে দিলে তিন মাস পরে খবর নিতে বলেন। তিন মাস পরে গেলে দেখা হয়নি জানায়! একই কথা শুনে শুনে পূজা এসে গেলে পূজা সংখ্যা নিয়ে ব্যস্ততা দেখায়। বছর কেটে যায়। লেখাটা যে পছন্দসই নয় তা কিন্তু কখনই শোনায় না। ভাল লেখা না-ছাপাটাতো অপরাধ। ঠিক কিনা?
তোমার কবিতাগুলি যে ভাল সেতো তোমার ধারণা। ওঁদের বিচারে তা না হতে পারে।
এমন অনেক কবিতা ছাপা হচ্ছে যা থেকে আমার ধারণাটা অস্বাভাবিক কিছু না।
দেশে কবির সংখ্যা কত তা জান? বছরে ক'টি কবিতা আর ওঁরা ছাপাতে পারেন?
বছরে একটি দু'টি কবিতা অন্তত ছাপা উচিত।
একথা ওঁদেরকে বলেছো কখনও?
না। ছাপবেন না তাতো বলেন না কখনও। অনেকে কবিতা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে পড়ে ফিরিয়েও তো দেন না। অথচ—
সজল বসু সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিলেন। এবার বাজেটের পর সংখ্যায় কমিয়ে এনেছেন। কিন্তু নামী দামি ব্রাণ্ডটাই ব্যবহার করেন।
বিনা অনুমোদনে টেবিলে রাখা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ছেলেটি বলল, আপনার একটা নিলাম। সকাল থেকে একটাও ধরাইনি।
তুমি কি রেগুলার স্মোকার? বিস্ময়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন সজল বসু।
হ্যাঁ। কড়া টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ছেলেটি।
দিনে ক'কাপ চা খাও?
হিসেব রেখে দেখিনি কখনও।
ড্রিংকস্-এ অভ্যস্ত?
কেউ অফার করলে ওন্‌লি বীয়র। চিল্ড বীয়রটাই পছন্দ বেশি।
অন্য কোন নেশাটেশা—ড্রাগ?

না। নেশা বলতে একটাই, সেটা কবিতা লেখা। কষ্টের ফসল কবিতা। সেই ফসল থেকে কিছু আর্ন করতে চাই। নামী পত্রিকায় দু'তিনশ পর্যন্ত দেয় শুনেছি।
তাতো তো পেট চলবে না। আজকের দিনে শুধুমাত্র লেখা নির্ভর পেট চলে না।
আপনার তো বেশ চলছে। ঘরদোর বেশ ভালই সাজিয়েছেন দেখছি। অভাবে আছেন বলেতো মনে হয় না। তাহলে আমার বেলায় কেন চলবে না?
সেটা এ বয়সে তুমি বুঝবে না। তোমার দ্বিগুণেরও বেশি বয়স আমার। আগে চাকরি করতাম। ছেড়ে দিয়ে টি ভি সিরিয়াল করছি। সিনেমার চিত্রনাট্য লিখছি। সারা বছর তো আছেই। শুধু পূজা সংখ্যায় কত লিখি তা জান? বই ছেপে বেরুচ্ছে। সেগুলি বিক্রিও হচ্ছে ভাল।
সুযোগ পেয়েছেন তাই। সুযোগ পেলে আমিও পারতাম।
বিশ্বাস রাখ। প্রত্যয়ী হও। মনে হচ্ছে তুমি ফ্রাসটেশনে ভুগছো।
সেটাই তো স্বাভাবিক। লেখা ছাপা নাহলে উৎসাহ আসবে কোত্থেকে? এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভাঙচুর চাই। কড়া হাতে কলম ধরতে হবে।
তুমি কি বামপন্থী?
ছিলাম, এখন আর নেই। ওঁদের পত্রিকাগুলিও একই চরিত্রের হয়ে যাচ্ছে যে।
বদলে যেতে শুরু করেছো তাহলে? সন্তাপী হয়ে ওঠেন সজল বসু। খেদ-কথা শোনান, বিখ্যাত এক মহাপুরুষের উক্তি মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, বড় নেতা হওয়া বড়ই কঠিন। নিজস্ব ন্যায়নীতি আদর্শ বিসর্জন দিতে হয়।
আমিতো নেতা হতে চাই না।
ওই হল আর কি। তুমিও বদলে গিয়ে আমার মতো চরিত্রের হয়ে যাবে তবেই না খ্যাতি প্রতিষ্ঠা আসবে।
সেটা কিরকম ভাবে? আর একটি সিগারেট নেয় ছেলেটি। ধোঁয়া উড়িয়ে জানতে চায়, কোন পথে এগুতে বলছেন আমাকে?
পথ কি একটা? আমারটা আমারই আবিষ্কার—টপ সিক্রেট। একটা মানুষ আমি, মগজও একটাই। আমারও চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন। স্নান আহার নিদ্রাও আছে। সংসার ধর্ম পালন করছি। সমাজ স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছি। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। বেড়াতেও যাই মাঝে মধ্যে। তবু সময় করে এত লেখা সাপ্লাই দিচ্ছি কেমন করে! এই গূঢ় রহস্যটাই তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।
ছেলেটি বোবা বিস্ময়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। সজল বসুকে বিমর্ষ বিপন্ন লাগছে দেখতে। আত্মগ্লানি ফুটে উঠেছে মুখের আদলে।
ছেলেটিকে কি এক কাপ চা বা কফি অফার করা দরকার? হঠাৎই মনে হয় সজল বসুর। কিন্তু সংসার সম্পর্কে স্বামীর চরম ঔদাসীন্য যে সীমার যন্ত্রণা। নিষ্কর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই কোন। রবিবার দিনটায় সীমার বেশ ছুটির মেজাজ। সেই মেজাজটা বিগড়ে দিতে সাহস পেলেন না।

সকালে এলাম অন্তত এককাপ চা খাওয়ান আমাকে। চমকে দিয়ে ছেলেটিই বেফাঁস বলে বসল, একজন লেখকের প্রতি লেখকের ব্যবহার তো আশা করতে পারি আপনার কাছ থেকে?
নিশ্চয়ই। লজ্জিত হয়ে স্বীকার করলেন সজল বসু। যদিও তিনি জানেন যে, বুদ্ধিজীবীরা প্রকাশ্যে যতই সমকালীনদের গুণের প্রশংসায় সোচ্চার হন না কেন আসলে ঈর্ষাকাতর। হিংসায় জ্বলেন। গোপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে তৎপর থাকেন।
চায়ের সঙ্গে মাখন টোস্টও দিয়ে গেলেন সীমা।
কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ছেলেটি আবার একটি সিগারেট তুলে নিল। কিন্তু আগুন ধরাল না। উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় চাইল, আজ তাহলে চলি। ফের আসব একদিন।
সজল বসুর বলতে ইচ্ছে হল, না। তুমি আর কোনদিনও এসো না। কিন্তু বলতে পারলেন না। অনিচ্ছায় নীরব সম্মতি জানালেন। দরজা বন্ধ করে ঘুরে তাকাতে দেখেন, সীমা দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ তাহলে পর্দার আড়াল থেকে সবই ওঁর কানে গেছে। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, অনেক আগেই ওকে চলে যেতে বলা উচিত ছিল।
উচিত যদি ছিল তো বললে না কেন? তিরস্কারের ঢঙে সীমা বললেন, এ বেলায় বুঝি তোমার লেখায় কোন ক্ষতি হয় না? সংসারের কোন কাজের কথা বললেই যত অজুহাত। অন্তত ফের আসতে বারণ তো করতে পারতে। কি বদখত্ বিশ্রী চেহারা ছেলেটার। চাউনিটাও ভাল না। সাত সকালেই মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে গেল।
হাজার কথার গজরানিতে স্বামীকে প্ররোচিত করতে চাইলেন সীমা। সজল বসু নিরর্থক তর্ক বিতর্ক এড়াতে মুখে রা কাড়লেন না। পড়ার টেবিলে নিরুত্তাপ নির্বাক বসে রইলেন। তিনি জানেন সীমাকে কোনমতেই বোঝানো সম্ভব না যে, আগন্তুক ছেলেটিতো তিরিশ বছর আগেকার সজল বসু স্বয়ং। নিজেকে কি কখনও তাড়িয়ে ফিরিয়ে দেয়া যায়! না কি, মানা করা যায় ফের কোনদিন আসতে।

অগতানুগতিক

দুপুরের ভাত-ঘুম এড়াতে অবিনাশ আজ আর বিছানার ধারে কাছে গেল না। সাধনার হাত থেকে পাঁচরকম মশলা আর সুগন্ধী জর্দা দিয়ে তৈরি করা পান নিল। তারপর চিবোতে চিবোতে ড্রইং রুমে ঢুকল। টিভির সুইস অন করে সোফায় গা এলিয়ে বসল। মৌজি মেজাজে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া উড়িয়ে আয়েশি আলস্যে ভাবল, ব্রজমোহনটা একটা আস্ত পাগল। এই ঠা ঠা রোদ্দুর মাথায় নিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়ার মানে হয় কোনও ? তাও কিনা হাওড়ার এই কোনা থেকে মধ্য কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে।

পাক্কা পঁচিশ বছর পর আচমকা অবাক করে সেদিন ব্রজমোহন ফোন করেছিল। কিছুতেই জানাল না ফোন নম্বরটা সে কোথা থেকে পেল। ওর আমন্ত্রণ প্রস্তাব পেয়ে অবিনাশ বলেছে, আমাকে বাদ দে। তারপর বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কফি হাউস হল আঁতেল আর যৌবন ঝলমলেদের ইজ্জতদার জায়গা। ওর আর এই বয়সে এখন সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত সংস্কৃতি নিয়ে কচকচানি ভাল লাগে না। রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও ফালতু মনে হয়। তাছাড়া, সে এখন সকাল-সন্ধ্যা পৈত্রিক লেদ মেশিন আর লোহালক্কড়ের কারবার নিয়ে দারুণ ব্যস্ত থাকে। দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ঘুমের সুযোগ পায়। রাতে নিজ আবাসে একা একটু আধটু পানটান করে। বছরে অন্তত একবার কিছুদিনের জন্য স্ত্রী ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভারত ভ্রমণে যায়। এখন সম্পূর্ণ অন্য জীবন।

আমাদের সকলেরই এখন কমবেশি অন্যরকম জীবন। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ব্রজমোহন বলেছে, শৈবাল বিতিন বিজয়ও তোর ঢঙে কথা বলে এড়াতে চেয়েছিল। শেষ অব্দি আমাকে নিরাশ করেনি। পুরনো দিনের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে জেনে সবাই রাজি হয়েছে। তাছাড়া, ব্যক্তিগত বিশেষ একটা প্রয়োজনে তোর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া জরুরি।

প্রয়োজনটা কি ধরনের ? অবিনাশ জানতে চেয়েছে।

এখন বলব না। ব্রজমোহন রহস্যময় হেসে বলেছে, এলে তবেই জানতে পারবি। কথা দে আসবি। প্লীজ আপত্তি করসি না।

বলতে গেলে রহস্যময় ব্যাপারটা জানার কৌতূহলেই অবিনাশ আর আপত্তি করেনি। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জেনে নিয়ে রিসিভারটা রেখে দিয়েছে।

অবিনাশ হাতে একটু বেশি সময় ধরে নিয়েই বের হল। প্রথমে বাসে বেনারস রোড ধরে সালকিয়া চৌরাস্তা মোড়ে নামল। সেখান থেকে রিকশায় বাঁধাঘাট। এবার ফেরিতে নদী পেরিয়ে অহিরীটোলা ঘাট। তারপর অটো রিকশায় চেপে শোভাবাজার পাতাল রেল স্টেশন। মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনে নেমে পাতাল থেকে ওপরে উঠল। সবশেষে ট্যাক্সিতে চড়ে কফি হাউসের সুমুখে পৌঁছল। এটাকেই কম সময় ও কষ্টের সহজ সিধা পথ মনে করলেও অনভ্যাসে অনেক হ্যাপা মনে হল। ব্রজমোহনের ওপর বেশ কিছুটা বিরক্তও হল।

যেন বহুযুগ পরে কফি হাউসে! তবু অবিনাশের মনে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। আগেকার মতোই দোতলার হলঘরের দরজা পেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাম দিক থেকে চালু করা সন্ধানী দৃষ্টি

পর্যায়ক্রমে ঘুরে এসে ডান দিকের সর্বশেষ টেবিলে এসে স্থির হল। বয়সের তুলনায় চুল বেশি পাকলেও শৈবালকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। অনেকের মধ্যে একমাত্র শৈবালই দরজামুখি বসেছে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর শৈবাল হাত তুলল। অনেকদিনের অনভ্যাসে বিকৃত হিস হিস শব্দ তুলে ইশারায় অবিনাশকে কাছে ডাকল।
বিতিন, বিজয়, রথীন, চিন্ময়, শৈবাল, অবিনাশ সকলেই হাজির এখন। কিন্তু, আহ্বায়ক ব্রজমোহন কোথায়! বিস্ময়টা সকলেরই। সেই সঙ্গে প্রশ্নতেও একাত্ম, এতকাল পরে বিচ্ছিন্ন বন্ধুদের ডেকে এনে এভাবে একত্রিত করার কারণটা কী হতে পারে?
আজ তো পয়লা এপ্রিল নয়। বিজয় এক সময় বলল।
তবে কি আমাদের সঙ্গে ব্রজ মজা করল? বিতিন প্রশ্ন জুড়ল।
কাউকে ঠকানোর ছেলে নয় ব্রজমোহন। গভীর বিশ্বাসে চিন্ময় বলল, ও চিরদিনই আমাদের সকলের চাইতে আলাদা প্রকৃতির। দারুণ ডায়নামিক। যে কোনও প্রচেষ্টায় সিরিয়াস।
ওকে ছেলে বলছিস! ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে বিতিন বলল, আমরা সবাই এখন লোকটা। তোকে অবশ্য বুড়ো লোকটা বলা উচিত। শরীর চেহারার এমন হাল হয়েছে কেন রে? সুগার না গ্যাসট্রিক?
দু'টোই। চিন্ময় দ্বিধাহীন বলল, এই বয়সে সুগার প্রেসার গ্যাস অম্বল কফ কাশি ইত্যাদি কিছু একটা থাকাটাই স্বাভাবিক। তুই আসার আগে রথীন বলছিল, ওর নাকি একবার মাইল্ড স্ট্রোক হয়ে গেছে। শৈবাল অম্বল-যন্ত্রণায় কাহিল হওয়ার বৃত্তান্ত শোনাল। বিজয় ইদানীং বারো মাস সাইনাস কফ কাশিতে কষ্ট পাচ্ছে। আর অবিনাশ যা মুটিয়েছে দেখছি, নির্ঘাৎ হাইপ্রেসার আছে।
শুধু কি প্রেসার? অবিনাশ সরল স্বীকারোক্তি করল, লিভার কিডনি থাইরয়েড— কিসের প্রব্লেম নেই? বিতিন বুকে হাত রেখে বলতে পারবে, ওর কোনও রকম রোগভোগ নেই?
আমি কি তাই বলেছি নাকি! বিতিন নিরুদ্বেগ হাসিমুখে বলল, কর্তা গিন্নি আমার দু'জনেই বেতো রোগী। চিন্ময় ঠিকই বলেছে, এই বয়সে এসব কিছু না কিছু কমবেশি সকলেরই থাকে।
ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। চিন্ময় আবার ব্রজমোহনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল, আমি নিশ্চিত ওর ওসব কিছুই নেই। তোরা ওকে কে কবে লাস্ট দেখেছিস জানি না। ওর সঙ্গে অল্প বয়সী কোনও মেয়ে থাকবেই থাকবে। হালে বইমেলাতেও আমার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছে। চেহারাটা এখনও সেই ইউনিভার্সিটি লাইফের মতো মেদহীন উজ্জ্বল স্মার্ট হ্যান্ডসামই আছে। হি স্টিল লুকস ইয়াং। অনেক দিন পর কাছে পেয়ে হ্যালো হিরো বলে এগিয়ে গেলাম। কি কাণ্ড করল জানিস?
কি করল? বিতিন ফুট কাটল, তোকে দাদু না কাকু বলল?
আহ্, বিতিন হচ্ছেটা কী? শৈবাল আগের মতোই নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বলল, তুই বল চিন্ময় তারপর কি হল?
এবার সঙ্গে ছিল বছর তিরিশের একটি গ্ল্যামারাস গার্ল। চিন্ময় ওর বিস্ময়ের ঘটনাটা শোনাল, এই প্রথম ওর সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার গানের স্কুলের ছাত্রী মেঘা। আর এ হল, আমার কলেজ লাইফের বন্ধু চিন্ময়। ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। এককালে ভাল সাহিত্যটাহিত্য করত। এখন চাকরি আর ঘরসংসারী ছাড়া আর কিছু করে না।

কেন করেন না? মেঘা আমাকে প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ওদের সঙ্গে কফি কর্ণারে বসার আমন্ত্রণ জানাল। আমি লজ্জা সঙ্কোচে কেমন যেন কুঁকড়ে গেলাম। জরুরি কাজে যাওয়ার মিথ্যা ব্যস্ততা দেখিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচলাম।
একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বছর দেড়েক আগে ব্রজমোহন একবার আমার পত্রিকা অফিসেও আচমকা এসেছিল। চিন্ময়ের শোনানো ঘটনাসূত্রে রথীন জানাল, একখানা গানের ক্যাসেট এগিয়ে দিল। গায়কের নাম ব্রজ শী। নিজে থেকেই বলল, সেকেলে নামটা শুনতে ভীষণ খারাপ লাগে বলে মোহনটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। তুই তো এককালে ভালই গাইতিস। আজকাল গানের ওপর তোর লেখাটেখা পড়ি। রিভিউ করে দিলে খুশি হব। দিয়েছিলামও। মোটামুটি ভালই গেয়েছে কিন্তু। রিভিউ পড়ে একদিন একাই এসেছিল। ধন্যবাদ জানাল। তারপর রবীন্দ্রসদনে এক সঙ্গীত সন্ধ্যার আমন্ত্রণপত্র দিয়ে বলেছিল, এই প্রথম আমার গানের স্কুলের পাবলিক অনুষ্ঠান হতে চলেছে। পাবলিসিটি তো দরকার। পারলে যাস। আমি অবশ্য যেতে পারিনি।
হ্যাঁ, ওই ইস্যুতে আমার অফিসে ও একদিন একটি সুশ্রী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। শৈবাল সেই দিনটির প্রসঙ্গে জানাল, প্রথমে বেশ কিছুটা গৌরচন্দ্রিকা করল। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যে ছবি আঁকা বন্ধ করে দিয়েছি সে জন্য মৃদু গালমন্দ শুনলাম। তারপর অবশ্য দীর্ঘকাল পর হঠাৎ যোগাযোগের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম। আমাকেও রবীন্দ্রসদনে ওদের সঙ্গীতানুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র দিয়ে বলল, আমাদের তো তেমন সামর্থ্য নেই। তোর তো বিস্তর জানাশোনা। দেখনা, যদি কোনও দৈনিক পত্রিকায় অনুষ্ঠানটির বিজ্ঞাপনের জন্যে কোনও স্পনসরের ব্যবস্থা করে দিতে পারিস।
সুশ্রী মেয়েটিকে দেখে নিশ্চয়ই গলে গেলি? বিতিন ওর স্বাভাবিক ঢঙে বলল, ব্যবস্থা করে দিলি? এখানে আমরা সবাই জানি, মেয়েদের প্রতি সবচাইতে দুর্বলতা বেশি কার। শৈবাল প্রতি আক্রমণে বলল, আমার জায়গায় তুই থাকলে নির্ঘাৎ চেষ্টা করে দেখতিস। না পারলে মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমানোর আশায় নিজেই টাকা ঢালতিস। মেয়েদের অনুরোধে স্যুভেনিয়রের বিজ্ঞাপন আর ফাংশনের টিকিট বিক্রির টাকাটা যে কার সেতো আমাদের কারও অজানা ছিল না।
ওসব পুরনো কথা ছাড় তো। চিন্ময় জানতে চাইল, তুই কি করলি সেটা বল।
আমি সোজাসুজি বলে দিলাম, ভুল জায়গায় এসেছিস। কোনওরকম সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তারপর ওদের অনুষ্ঠানের কার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, নানা কাজে এত বেশি ব্যস্ত থাকি যে সময় দিতে পারব না। অযথা নষ্ট হবে। তার চাইতে ভাল, অন্য কাউকে দিস।
এতটা দুর্ব্যবহার না করলেই পারতিস। চিন্ময় ফের ব্রজমোহনের গুণকীর্তন করল, আমরা সবাই কিন্তু সাধারণ আর দশজনের মতো গতানুগতিক জীবনে একাকার হয়ে গেছি। নিজেদের সবকিছু স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছি। ব্রজমোহন একমাত্র ব্যতিক্রম। ওর চেষ্টা উদ্যম আছে। ও থেমে যায়নি। তোরা হয়তো জানিস না যে, এখন যে মেগা গোয়েন্দা সিরিয়ালটা চলছে সেটির চিত্রনাট্যকার মোহন শী আমাদের এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রজমোহন।
চিন্ময়ের মুখ থেকে সংবাদটা শোনার পর দীর্ঘক্ষণ কেউই কোনও কথা বলল না। কেননা, রবিবার

ছুটির দিনে উল্লেখিত সুপার হিট সিরিয়ালটি উপস্থিত সকলেই দেখে থাকে। সেই সুবাদে সাতাশি শতাংশ দর্শকদের অন্যতম এক একজন।
একসময় শীতল নীরবতা ভঙ্গ করে স্বয়ং ব্রজমোহন এসে উপস্থিত হল। নির্বাক সকলে অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে ভাবল, চিন্ময় তো বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত কিছু বলেনি। এ যেন এক ঝাঁক বৃদ্ধদের আড্ডায় বয়সে বিস্তর ফারাক-এর এক যুবক এসে হাজির হয়েছে। এই স্বাস্থ্য রঙ উজ্জ্বলতা আর হাস্যময় প্রফুল্লতা তো এখন হিসেবমতে ব্রজমোহনের ছেলের পাওয়ার কথা।
দেরিতে আসার জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ব্রজমোহন ওর জন্য সংরক্ষিত চেয়ারে বসে বলল, তোদের সবাইকে যেজন্য ডেকে আনা তার প্রাথমিক কাজটা চুকিয়ে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।
কি সেই কাজ? সবার মনে একই প্রশ্ন, কিন্তু কেউই জিজ্ঞাসা করল না।
চিন্ময় শৈবাল রথীনের সঙ্গে এর আগেও তোর দেখা হয়েছে শুনলাম। অবিনাশ প্রথম মুখ খুলল, আমাকে চিনতে পারছিস কি?
তুই তো অবিনাশ। ব্রজমোহন একঝলক হাসি ছড়িয়ে মন্তব্য করল, বাব্বা কী যে মুটিয়েছিস। অ্যালকোহলিক ফ্যাট ভাল নয়। ডায়েট কন্ট্রোল কর, নইলে মরবি। ড্রিংক তো আমিও করি। সুগার না হওয়ার জন্য প্রায় রোজ উচ্ছে অথবা করলা সেদ্ধ খাই।
আর বাতে না ধরার জন্যে? বিতিন মুখ ফসকে জিগ্যেস করে বসল।
আমি তো তোর চিরশত্রুরে বিতিন। ব্রজমোহন ঠাট্টাচ্ছলে বলল, আমার পরামর্শ কি তোর বিশ্বাস হবে? তবু বলছি, রোজ একটি এক কোয়া রসুন চিবিয়ে খাস। নিউমার্কেটে পাবি। গতর খাটাবি। পারলে যোগব্যায়াম করবি। আমি এসব করি।
আর কি কি করিস? চিন্ময় উৎসাহে জিগ্যেস করল।
রোজ দু'একটা কাঁচা লঙ্কা খাই। পেঁপে সিদ্ধ চাই-ই-ই চাই। কিছুটা দুধ পান করি। দিনে মোট কত লিটার জল খাই তার হিসেব নেই। আর যা করি তাহল, অনেকের মতো অকারণে ফালতু চিন্তা না করে সদা আনন্দে থাকার চেষ্টা করি।
ওসব স্বাস্থ্য-কথা এখন বরং বন্ধ হোক। সাইনাসের যন্ত্রণাটা চাগাড় দিয়ে ওঠায় বিজয় ধৈর্য হারাল, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এই এত সিগারেটের ধোঁয়া আর সাফোকেশন থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার।
তুই নিশ্চয়ই বিজয়? ব্রজমোহন নিশ্চিত হওয়ার কারণ দর্শালো, এখনও সেই পুরনো রোগ নিয়ে ঘর করছিস।
এভাবে সবাইকে ডেকে আনার কারণটা বল তো আগে। বিতিন ব্যস্ততা দেখাল, তুই কতটা সংসারী জানি না। আমার হাজার রকমের ঝুটঝামেলা। বউকে ঘরোয়া কাজে সাহায্য করতে হয়। ছেলেমেয়েকে পড়াই।
যেহেতু ব্যবসায়ী, সময়ের মূল্য সবচাইতে আমার কাছে বেশি। বিতিনকে সমর্থন করে অবিনাশ বলল, তাছাড়া সেদিন ফোনে আমার না আসতে চাওয়ার কারণগুলিও বলেছি। তবু তোর অনুরোধে এসেছি মানে এই নয় যে, এই বুড়ো বয়সে কফি হাউসে ফালতু বেহিসেবি সময় খরচ করতে উৎসাহী।

তোর ডাক পেয়েই বুঝেছি, ধান্দা কিছু একটা আছেই। শৈবাল তির্যক ঢঙে বলল, আগাম জানিয়ে রাখছি আমার ভাই ক্ষমতা খুবই সীমিত। সেবার তোকে রাউন্ড দ্য ক্লক আমার ব্যস্ততার কথা জানিয়েছিলামও। কাজেই সময় নষ্ট না করে তোর প্রয়োজনটা বলতো শুনি।
ওদের ওপর রাগ করিস না যেন। সকলের বাচনভঙ্গিতে বিরক্ত রথীন বলল, আমাকে ভুল বুঝিস না। আমাকে ফের একবার অফিসে যেতে হবে। জরুরি কাজ আছে।
থ্যাঙ্ক ইউ, ঠিক বলেছিস। নিরুত্তাপ ব্রজমোহন সপ্রতিভ বলল, কাজের কথা সবার আগে হওয়া দরকার। তারপর চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে সুকৌতুকে হাসল, তুই কিছু বললি না যে! তোর বুঝি ব্যস্ততা নেই?
আমার না থাকলেও বাকি সকলের তো আছে। চিন্ময় অতিরিক্ত ভাবাবেগ-গম্ভীর বলল, অনেককাল পরে পুরনো বন্ধুরা একসঙ্গে হলাম। অথচ আশ্চর্য, কেউ কারও সম্পর্কে কিছুই জানলাম না। দেখলাম, জানতে কেউই উৎসাহী আগ্রহীও না। সুতরাং তোর প্রয়োজনটা বল। তারপর বিচ্ছিন্ন ব্যস্ত সবাই আবার আগেকার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে যাই।
তুই দেখছি আগেকার মতোই ইমোশনাল সেন্টিমেন্টাল আছিস। ব্রজমোহন ঈষৎ মনোরম হাসল। তারপর সবার দিকে তর্জনী ঘুরিয়ে বলল, তোদের সকলের আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা আর প্রেরণা পাওয়ার আশাতেই ডেকেছি। কেননা, একমাত্র আমি ছাড়া পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু তোরা সবাই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। এতকাল ধরে আমি রাউন্ডের খেলা খেলেছি। তারপর কোয়ার্টার, সেমি ফাইনাল জিতেছি। এবার ফাইনালে লড়াই মানে জীবনমরণ সমস্যা।
ফের সেই ভ্যানতারা করে সময় নষ্ট! কব্জি ঘড়িতে সময় দেখে বিতিন বলল, কাটছাঁট করে শর্টে মোদ্দা কথাটা ঝুলি থেকে বের করতো।
ইয়েস, সংক্ষেপেই বলছি। ব্রজমোহন প্রতিক্রিয়াহীন বলল, এবার আমি একটি টিভি সিরিয়াল করতে চাইছি। মোহন শী নামে গোয়েন্দা সিরিয়ালের চিত্রনাট্য লেখার সময় আইডিয়াটা আমার মগজে এসেছিল। বিস্তর ভাবনাচিন্তার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, দস্যু মোহন অবলম্বনে সিরিয়ালটা আমি করবই। লেখকের উত্তরাধিকার ও প্রকাশকের খোঁজ খবর নিলাম। মৌখিক আশ্বাস পেয়ে চিত্রনাট্য লেখা প্রায় কমপ্লিট। আজই প্রকাশকের সঙ্গে লিখিত চুক্তিপর্ব চুকিয়ে এলাম। সঙ্গীতকার চিত্রনাট্যকার পরিচালক হব স্বয়ং আমি। ব্রজ শী ওরফে মোহন শী'র এবারকার নতুন নাম হবে কুমার রত্ন।
অতি উত্তম। বিতিন ঠাট্টাচ্ছলে জিগ্যেস করল, তা কুমার রত্নজি তুমি তোমার কাচের টুকরো বন্ধুদের কাছ থেকে কিরকম সাহায্য প্রত্যাশা করছ?
এবার একজন প্রযোজকের প্রয়োজন। ব্রজমোহন সবাইকে ডেকে আনার উদ্দেশ্যটা খোলসা করে বলল, তেমন কারও সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। নয়তো তোরা সম্মিলিতভাবে টাকাটা আমাকে ধার হিসেবে দিতে পারিস। সুদ অবশ্যই দেব। আবার কো-অপারেটিভ সিসটেমে সবাই প্রযোজনা করতে পারিস। সেক্ষেত্রে লাভের অংশ সবারই প্রাপ্য হবে।
সে তো অনেক টাকার ব্যাপার স্যাপার। বিজয় চোখ কপালে তুলে বলল, আমাকে মাইনাস করে রাখ।

এটা কিন্তু সিনেমা প্রোডাকশনের মতো বিশাল ব্যাপার কিছু না। বিজয়ের চোখ মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে ব্রজমোহন বলল, সিরিয়ালটা নির্বাচিত বা অনুমোদনের জন্য প্রথম ক্ষেপে চারটি পাইলট জমা দেয়া দরকার হয়। তাতে তিন সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো খরচ। ব্যস, নির্বাচিত হলে আর পায় কে! এবার সবাই মিলে স্পনসর যোগাড় করতে পারলেই কেল্লা ফতে। সিনেমার মতো দর্শক খাবে কি খাবে না—সেসব টেনশন রিস্ক নেই।

কিন্তু এই সাড়ে তিন লাখ টাকার রিস্ক তো আছে। টাকা যোগান দিতে অনীহা প্রকাশ করে বিতিন বলল, সারা জীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয় এই বয়সে কে তোকে দিয়ে সাহায্য করতে যাবে? এখন আর ছাড়াছাড়ি নেই, গুটিয়ে এনে জড়ো করার সময়। আই অ্যাম ভেরি সরি!

আমি বড়জোর স্পনসরের জন্য চেষ্টা চালাতে পারি। রথীন নরম সুরে বলল, হালে ধারদেনা করে বাড়ি করেছি। একমাত্র সন্তান ছেলেটা মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে বেকার বসে আছে। অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস?

আমার নাভিশ্বাস অবস্থাটা শোন তাহলে। শৈবাল নিজের কষ্টকথা শোনাল, পাঁচ সন্তানের গর্ভধারিণী বৃদ্ধা পঙ্গু মা এখন একা আমার ঘাড়ে। তিন তিনটি মেয়ে এখনও ছাত্রী। ওদের বিয়ে দেব কেমন করে সে চিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় না। সাধে কি আর চাকরির পরেও বাড়তি রোজগারের নানা ধান্দায় ব্যস্ত থাকি।

আর আমার কথা শুনবি? চিন্ময় বিষণ্ণ বলল, দেখতেই তালপুকুর ঘটি ডোবে না। উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ পাওয়া সম্পত্তি নয়তো যেন খণ্ডহার। তাতেও একটিও ভাড়াটে পালায় না। মামলা মোকদ্দমায় জেরবার। এদিকে লেট ম্যারেজ লেট ইস্যু। ছেলেটা নাবালক। বউটার হাজারো ব্যামো। এতরকম সমস্যা জর্জরিত বলেই আজ কিছুটা সময় আড্ডা দিয়ে আনন্দ পেতে চেয়েছিলাম।

অনেক হয়েছে, এবার থাম তো। অবিনাশ রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, প্রিয় পরিচিত আপনজনদের মুখে সব সময় দুঃখ কষ্ট হতাশার কথা শুনতে আর ভাল্লাগে না। সে জন্যেই একা থাকতে ভালবাসি। আরে ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে সংসারধর্ম করব অথচ দুঃখ কষ্ট রোগ ভোগ শোক সমস্যা থাকবে না তা কখনও হয় নাকি? ব্রজমোহনের বুঝি কোনও সমস্যাই নেই? আছে। সমস্যা সবারই কমবেশি আছে, থাকবেও। তবু তো ব্রজমোহন আমাদের মতো হারিয়ে ফুরিয়ে শেষ হয়ে না গিয়ে নানান বিষয়ে লড়ছে। প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে যাওয়ার পর অবিনাশ বিরতিতে কিছুটা গম্ভীর হয়ে আশার আলো দেখাল, আমি কোনও স্পনসর ধরতে পারব না। দেড় দু লাখ টাকা পর্যন্ত কনট্রিবিউট করতে পারব। বাট রিকয়ার নো ইন্টারেস্ট। কিন্তু বাকিটার কি হবে?

অবিনাশ ব্রজমোহনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল। ব্রজমোহন একে একে বিতিন বিজয় রথীন চিন্ময় আর শৈবালের দিকে তাকাল। নিরুৎসাহী ওরা সকলেই নির্বাক দৃষ্টি আনত করল।

দেন আই কাণ্ট ওয়েস্ট টাইম এনি মোর। সহসা চঞ্চল উচ্ছল দীপ্ত ব্রজমোহন উঠে দাঁড়াল। উজ্জ্বল একরাশ হাসি ছড়িয়ে অবিনাশের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, এ লট অব থ্যাঙ্কস ফর ইওর ইনসপিরেশন। বাকি টাকার ব্যবস্থা যে করেই হোক আমি করব। ফোনে তোকে জানাব। আমাদের ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছিস ব্রজ? চিন্ময় অপরাধীর মতো জিগ্যেস করল।

কক্ষণো না। ব্রজমোহন কোনওরকম প্রতিক্রিয়াহীন সাবলীল বলল, আই নিড কাইন্ড হেলপ অ্যান্ড

ভ্যালুয়েবল সাজেশান। একা অবিনাশ ছাড়া বাকি সবাই তোদের অক্ষমতা জানিয়েছিস। তাই বলে আমাকে হতাশ হয়ে থমকে দাঁড়ালে চলবে?

আশা করি আমার অক্ষমতাটা যে সত্যি তা বিশ্বাস করবি। চিন্ময় আর্দ্র গলায় বলল, আই অ্যাম ওয়ান অব ইওর রিয়্যাল অ্যাডমায়ারার্স।

আমি বিশ্বাস করি। চিন্ময়ের কাঁধে হাত রেখে ব্রজমোহন নির্ভেজাল হাসল, আমাকে যে তুই একটু বেশিরকম ভালবাসিস তাও বুঝি।

তাহলে যেন ভুল বুঝে দুঃখ পাস না। ব্রজমোহনের হাত দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে চিন্ময় বলল, আই অ্যাম অলসো ইওর ওয়েল উইশার।

আমিও আমিও আমিও। একমাত্র অবিনাশ ছাড়া বাকি সব বন্ধুরা বোবা নীরবতা ভঙ্গ করে সোচ্চার হল।

দুঃখ পাওয়া বা ভুল বোঝাবুঝির তো কোনও কারণ দেখছি না। ব্রজমোহন সপ্রতিভ জবাব দিল, এখানে যে যা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা জানাল—কিছুই অবিশ্বাস্য নয়। আমিও ওই বৃত্তেরই একজন। আর দুঃখ? আমি ওই বৃত্তবাসী অধিকাংশ স্বামী বা বাবার মতো একজন নয় বলে স্ত্রী সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া বিস্তর বিরূপ মন্তব্য আচরণেও বিন্দুমাত্র দুঃখ পাই না। তা নাহলে কি এগিয়ে যাওয়া যায় কখনও?

তাহলে কথা দে ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি? চিন্ময় যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করল।

অবশ্যই। ব্রজমোহন দ্বিধাহীন জানাল, কাউকে কোনওদিন প্রয়োজন হলে তবেই। তোরা ডাকলেও আসব।

অর্থাৎ কিনা আমরা শুধুমাত্র তোর স্বার্থ প্রয়োজনের বন্ধু? বিতিন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

অবশ্যই না। দুর্বোধ্য হাসি ছড়িয়ে ব্রজমোহন বলল, আমার সম্পর্কে তোরা যে যাই ভাবিস না কেন, বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক কারণে আমি যতটা সম্ভব চল্লিশ ঊর্ধ্বদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কেন জানিস?

কেন? তা কেউই জানতে চাইল না। সবাইকে আশ্চর্যরকম রহস্যকৌতূহলের ধাঁধায় ফেলে ব্রজমোহন নিরুত্তাপ বিদায় নিল। কারণটা কি হতে পারে? উত্তরটা যে যার দৃষ্টিভঙ্গী মানসিকতায় নিজের মনের মতো করে সাতপাঁচ ভাবতে শুরু করল। একমাত্র অবিনাশ সঠিক বুঝতে পারল, প্রায় সমবয়সী হয়েও ব্রজমোহন কোন জিয়নকাঠির সংস্পর্শে থেকে এখনও আলস্য নৈরাশ্যমুক্ত প্রাণময় সজীব প্রফুল্ল। কেনইবা নির্ভীক একাগ্রচিত্তের উদ্যমী আত্মপ্রত্যয়ী ঋদ্ধিকামী অন্যতম একজন।

বাংলা সাহিত্যের
সবচাইতে উর্বর ক্ষেত্র
ছোটগল্পের জগতে
হালফিল আলোচনায়
অন্যতম যোগ্য ব্যক্তিত্ব
প্রভাস ভদ্র।
প্রভাসের লেখায়
বিষয়বস্তু ও ভাষার দ্বৈতাচার,
গল্প ও কবিতার
সার্থক সহবাসের নমুনা
অনেকের কাছেই শ্লাঘার বিষয়।
জীবন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে
তাঁর সমান নৈপুণ্য।
অসাধারণ তাঁর
জীবনের সত্য উপলব্ধি।
নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপনে
তিনি দক্ষ, অকুণ্ঠ, নির্ভীক।
তাঁর সহজাত পর্যবেক্ষণ শক্তি
সরাসরি নাড়িয়ে দেয়,
মূল বক্তব্য
এবং পাঠক পাঠিকাদেরকে
একই সঙ্গে।
প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকা
ও বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত
এমনই চল্লিশটি
সুনির্বাচিত গল্পের
সমৃদ্ধতর সংকলন এটি।
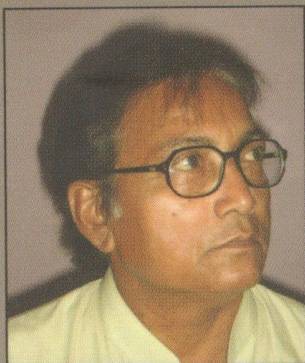
জন্ম ১৯৪৩-এ,
অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে।
কৈশোরে কিছুদিন উত্তরবঙ্গের
চা বাগানে কাটানোর পর
পাকাপাকি কলকাতার
উপকণ্ঠে বসবাস।
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে
বাংলায় স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
থেকে বাংলায় এম. এ।
ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত
ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে
নির্বাচিত প্রতিনিধি।
কবিতা লেখা দিয়ে শুরু।
'কুঁড়ি', 'কাকলি', 'আজকাল পরশু'
দেয়াল পত্রিকা সম্পাদনার পর
'প্রত্যয়' লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ ও
সম্পাদনা।
১৯৬২-তে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ পত্রিকার
সম্পাদক। বহু পত্রপত্রিকা
ও গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন। হস্তশিল্প ও
মৃৎশিল্পে পারদর্শী।
প্রতিমা গড়তেন একসময়।
প্রিয় নেশা, ভ্রমণ। প্রিয় পছন্দ, প্রকৃতি।
গান আর ছাদবাগান নিয়ে
সময় কাটাতে ভালোবাসেন।
দারুণ অপছন্দ, হৃদয়হীনতা।